রবীন মাষ্টার

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্‌-এ, ডি-এল্‌

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট্‌,
কলিকাতা।

প্রকাশক—

শ্রীগোপাল দাস মজুমদার,

ডি, এম, লাইব্রেরী,

৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

আষাঢ় ১৩৫৪

সাড়ে তিন টাকা

—মুদ্রাকর—

শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়

টেম্পল প্রেস

২, ন্যায়রত্ন লেন, কলিকাতা

রবীন মাষ্টার

১

ছেলে বেলায় বাপ-মা তাকে ডাকতো 'খোকা' ব'লে, বড় হ'লে সবাই তাকে ব'লতো 'রবি ঠাকুর'; কিন্তু আজ দশখানা গ্রামের ছেলে-বুড়ো সবাই তাকে জানে 'রবীন মাষ্টার'। আর জানে যে, সে বদ্ধ পাগল।

তিরিশ বৎসর আগে সে বি-এ ফেল ক'রে এসে গাঁয়ে ব'সেছিল, কেন না তার প'ড়বার আর সঙ্গতি ছিল না। কিন্তু লোকটা তখন ছিল ভারী উৎসাহী আর বিলক্ষণ জোগাড়ে। কতকগুলি ছেলে সংগ্রহ ক'রে নিয়ে সে ক'রলে একটা মাইনার ইস্কুল—নিজে হ'ল তার হেড-মাষ্টার। লোকে ব'ললে, এ-পাড়াগাঁয় কি ইস্কুল চ'লবে? মাত্র তিন মাইল দূরে যেখানে একটা এণ্ট্রান্স ইস্কুল র'য়েছে! কিন্তু রবীন মাষ্টার দম্‌বার ছেলে নয়। দশটি ছেলে নিয়ে ইস্কুল বসালে, দেখতে দেখতে হ'য়ে গেল সেখানে একশো ছেলে।

গাঁয়ের জমীদার ভুবনবাবু দু'খানা ঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন, আর গোটা পঁচিশেক টাকা দিয়েছিলেন। তাই সম্বল ক'রে রবীন মাষ্টার নিজের

খাটুনী আর উৎসাহের জোরে রীতিমত একটা জমজমাট ইস্কুল ক'রে ফেললে।

তারপর সে ক'রলে বিয়ে। বিয়ে সে আগে করে নি, কেন না বউ এনে খাওয়াবার সঙ্গতি তার ছিল না। নইলে মন তার চেয়েছিল অনেক আগেই তার জীবনসঙ্গিনী, স্বধু বুক ভেঙ্গে ফেলে সে চেপে রেখেছিল তার সে বাসনা। ইস্কুল যদিও হ'ল, তবু তা' থেকে রবীন মাষ্টারের মাইনে আদায় হ'তে, লাগলো অনেক দিন। যখন তিরিশ টাকা মাইনে সত্যি সত্যি হাতে আসতে লাগলো, তখন সে ভাবলে, এখন বিয়ে করা যায়।

তারপর তার ঝোঁক চাপলো, ইস্কুলটাকে হাই স্কুল ক'রতে হবে। ভুবনবাবুর কাছে অনেকদিন দরবার ক'রে উঠলো দু'খানা টিনের ঘর—পত্তন হ'ল 'ভুবনমোহন হাই স্কুলে'র।

সেই বারে যোগে-যাগে রবীন মাষ্টার বি-এ-টা আবার দিলে। নইলে চলে না। হাই স্কুলের হেড মাষ্টার, নিদেন বি-এ না হ'লে দেখায় না ভাল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে ফেল হ'ল ইংরাজীতে। ঐ ইংরাজীটা সে কিছুতেই তেমন রপ্ত ক'রতে পারলে না।

সে কি হাঙ্গামা! ছেলে জুটিয়ে আনা, টাকা ভিক্ষে করা, বই জোগাড় করা, ইনস্পেক্টরের দরবার করা—সব ক'রলে রবীন মাষ্টার একা।

বছর দুই বাদে যখন ইস্কুলটা বেশ চ'লতে লাগলো, তখন ইনস্পেক্টর এক লম্বা ফর্দ্দ দিলেন। ব'ললেন, একটা কমিটি ক'রতে হবে, গ্রাজুয়েট হেড মাষ্টার চাই, মাষ্টার বাড়াতে হবে, বই কিনতে হবে—এমনি সব কত কি!

রবীন মাষ্টার খেটে খুটে সব জোগাড় ক'রলে—হল কমিটি।

নতুন মাষ্টারের জন্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'ল—অনেক দরখাস্ত এলো—এম-এ, বি-এ কত! কমিটি থেকে বাছাই ক'রতে অসুবিধা হ'ল। তাঁরা পাঠিয়ে দিলেন সব দরখাস্ত ইনস্পেক্টরের কাছে। ইনস্পেক্টর বাছাই ক'রে ফেরত দিলেন।

একজন এম-এ-কে তিনি ক'রলেন হেড মাষ্টার, একজন হালের বি-এ হ'লেন সেকেণ্ড মাষ্টার। রবীন মাষ্টারকে থার্ড মাষ্টার হ'যে থাকতে হুকুম হ'ল। মাইনে—সেই তিরিশ টাকা।

ইস্কুলটা ভারী জমে গেল। একে ত' সেই সময় এই অঞ্চলের লোকদের মধ্যে ছেলেদেরকে পণ্ডিত ক'রবার জন্যে হঠাৎ ঝোঁক লেগে গিয়েছিল। তার উপর 'ভুবনমোহন ইস্কুলে'র নাম প'ড়ে গিয়েছিল ভারী। গাধা পিটে ঘোড়া ক'রবার খ্যাতি হয়েছিল এ ইস্কুলের। আর রবীন মাষ্টারেরই সেই খ্যাতি ষোল আনা পাওনা। সে এমন যত্ন ক'রে আর এমন উপায়ে ছেলেদের পড়াত যে, অতি বড় বোকা ছেলেও ত'রে যেত।

প্রথম যে বারে ইস্কুল থেকে ছেলে পাঠান হল'—তখনও রবীন ছিল হেড মাষ্টার। সেই বারেই একটা ছেলে পেলে কুড়ি টাকার একটা সরকারী জলপানী। আর যায় কোথায়? চার দিক থেকে ছেলে ভেঙ্গে আসতে লাগলো।

রবীন মাষ্টার যতদিন স্কুল চালাচ্ছিল, ততদিন সে ছেলেদেরকে ইস্কুলে যা পড়াত, তার উপর বাড়ী নিয়ে তাদেরকে পড়াত, আবার মাঠে-ঘাটে তাদের নিয়ে ঘুরে বেড়াত—কি গুষ্টির মাথা ক'রতো [illegible]দের নিয়ে সেই জানে। নিয়ম-কানুনের ধার সে বড় ধারতো না। কোন্ ক্লাসে কোন্ ঘণ্টায় কতখানি কি পড়ান হবে, তার সম্বন্ধে নিয়ম লেখা থাকতো বটে, কিন্তু সে লেখাই থাকতো! রবীন মাষ্টার

যখন যে ক্লাশে খুশী ঢুকে যেতো। একটা ছেলেকে হয় তো অঙ্কের ঘণ্টায় জিওগ্রাফী পড়াত, আর একটাকে বাঙ্গালার ঘণ্টায় পাঠিয়ে দিত অন্য মাষ্টারের কাছে ইংরাজী প'ড়তে। এমনি এলোমেলো তার ব্যবস্থা ছিল। মাষ্টারেরা তার এসব ব্যবস্থা বুঝতে পারতো না, তারা হাসতো আর আপনা-আপনির মধ্যে বলাবলি ক'রতো বদ্ধ পাগল রবীন মাষ্টার !

নতুন হেড মাষ্টার এলেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এলো গভর্ণমেণ্টের সাহায্য—মোটা টাকা—আর এলো ছাঁকাটা আট-ঘাট বাঁধা আইন-কানুন।

হেড মাষ্টার সেই আইনের খাতা খুলে সব মাষ্টারদের বুঝিয়ে দিলেন যে, সব আইন মেনে চলতে হবে।

রবীন মাষ্টারের আস্পর্দ্ধার সীমা নেই। এম-এ পাশ, পাঁচ বছরের এক্সপিরিয়েন্সের হেড মাষ্টারকে সে অম্লান বদনে বলল "দেখুন ওতে অসুবিধা আছে। ওই শচে' ঘোষ, ওকে রোজ একঘণ্টা ইংরাজী আর একঘণ্টা ইংরাজী গ্রামার পড়ান মিথ্যে, কেন না যেটা ক্লাশে পড়ান হবে তার চেয়ে ঢের বেশী ওর জানা আছে। অথচ অঙ্কে সে কাঁচা, তাকে সেই সময় অঙ্কের ক্লশে বসিয়ে দিলে ঢের ভাল হবে। আর সুরেন ভট চাজ্জি, ওকে সংস্কৃত ক্লাশে বসিয়ে রাখা মিথ্যে—ও মুগ্ধবোধ রঘুবংশ শেষ ক'রে ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়েছে ! আবার সত্য মিত্তির—"

বি-এ ফেল থার্ড মাষ্টারের এ স্পর্দ্ধায় হেড মাষ্টার মহাবিরক্ত হ'য়ে ব'ললেন—"না ম'শায় না। অমন এলোমেলো ক'রে ছেলে শেখান চলে না। ইস্কুলের discipline তাতে থাকে না। ঠিক এমনি সব ক'রতে হবে।"

মুখ চুণ ক'রে রবীন মাষ্টার ব'ললে "হোক।"

বছর খানেক বাদে সেকেণ্ড মাষ্টার হেড মাষ্টারকে গিয়ে ব'ললেন "মশায়, এখানকার মাইনে তো যা'—ভেবেছিলাম প্রাইভেট পড়িয়ে কিছু পাবো ; কিন্তু ঐ রবীন মাষ্টারের জ্বালায় আর কিছু হবার জো নেই। ও সব ছেলেকে ওর বাড়ীতে নিয়ে পড়াচ্ছে, অমনি—তা লোকে প্রাইভেট মাষ্টার রাখবে কেন ?"

কথাটা শুনে হেড মাষ্টার একদিন রবীন মাষ্টারের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত। দেখলেন সেখানে এক পাল ছেলে। কেউ ব'সে ঝুড়ি তৈরী করছে, কেউ বাঁশ চিরে দিচ্ছে, আর কয়েকজন চাটাই বানাচ্ছে। খুব ছোট কয়েকটা ছেলে কাগজ কেটে নানা রকম প্যাটার্ণ ক'রছে।

রবীন মাষ্টারের বাহির বাড়ীতে একখানা বড় খ'ড়ো ঘর, আর তার সামনে উঠান—ও-ধারে দু'টো গরু বাঁধা আছে। উঠানে ছেলেরা এই সব ক'রছে। গরুর কাছে একদল ছেলে দাঁড়িয়ে গরু দেখছে কয়েকজন গরু-বাছুরের ছবি আঁকছে।

ঘরের ভিতর পাঁচটা ছেলে ব'সে প'ড়ছে। রবীন মাষ্টার দেয়ালে টাঙ্গান একটা ম্যাপের কাছে দাঁড়িয়ে ম্যাপ দেখিয়ে দেখিয়ে কি সব গল্প ক'রছে আর খুব হাসাহাসি ক'রছে ছেলেদের সঙ্গে।

হেড মাষ্টারকে দেখে রবীন মাষ্টার ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে তাড়াতাড়ি তাঁর একমাত্র চেয়ারখানা ঝেড়ে ব'সতে দিলেন। হেড মাষ্টার মুখ ভার ক'রে উঠানের ছেলেদের দেখিয়ে বললেন—"এরা সব এ কি ক'রছে ?"

বিনীতভাবে রবীন মাষ্টার ব'ললে, "একটু Manual training আর Nature study করাচ্ছি ওদের।"

তখন বি-টি মাষ্টারের যুগ নয়, এ সব জিনিষ হেড মাষ্টারবাবুর জানা ছিল না। তিনি গম্ভীরভাবে ব'ললেন, "ওদের মাথাটি খাচ্ছেন।

এই সব খেলা-ধূলায় যদি মাষ্টারের কাছেও ওরা উৎসাহ পায়, তবে কি আর ওরা বই নিয়ে ব'সবে ?"

রবীন মাষ্টার মৃদুস্বরে ব'ললেন, পেষ্টালট্‌সি ও ফ্রেবেলের কথা। তাদের নাম হেড মাষ্টারের জানা ছিল না। তিনি ব'ললেন, "রেখে দিন ওসব বিলিতি থিওরী। এদেশে ছেলেদের কাণ ধ'রে বই না পড়ালে ওদের শেখাই হবে না। এ সব বন্ধ করুন—এতে এদের সবার মাথা খাওয়া যাবে। আর এদের আপনি পড়াচ্ছেন ? কি পড়াচ্ছেন ? জিওগ্রাফী তো আপনার পড়াবার কথা নয়—আপনি পড়াবেন হিষ্টরী। সুরেন বাবুকে ডিঙ্গিয়ে যদি আপনি জিওগ্রাফী পড়াতে যান তবে discipline-এর কি হবে ?"

বিনীত ভাবে রবীন মাষ্টার ব'ললে, "আজ্ঞে এখন জিওগ্রাফী নয়, হিষ্টরীই ওদের পড়াচ্ছিলাম। ম্যাপ দেখে হিষ্টরী প'ড়লে অনেক জিনিষ বেশ পাকা হ'য়ে যায়। ভারতের general history-টা বেশ সুন্দর বোঝান যায় ম্যাপের সাহায্যে !"

ম্যাপ দেখিয়ে হিষ্টরী পড়ান ! এমন সৃষ্টি-ছাড়া কথা কেউ কখনও শুনেছে ? হেড মাষ্টার ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে উঠে ম্যাপটা উল্টে দেখে ব'ললেন, "এ তো দেখছি ইস্কুলের ম্যাপ !"

রবীন মাষ্টার ব'ললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি রোজ নিয়ে আসি আবার রোজ নিয়ে যাই।"

"কি সর্ব্বনাশ ! ইস্কুলের property আপনি এমনি বাড়ী নিয়ে আসেন ?"

"বরাবরই তো তাই ক'রছি—এতে দোষ কি ?"

"আপনি বরাবর যা ক'রেছেন সে তো দেখতেই পাচ্ছি। ইস্কুল-টাকে ক'রে তুলেছিলেন আপনার ঘরোয়া সম্পত্তি। কিন্তু এসব চ'লবে না। ওহে ছোকরারা তোমরা, বাড়ী যাও সব।"

এইবার রবীন মাষ্টার তেতে উঠলো, সে বললে, "কখনও না। বরং আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, আমার বাড়ী আমার দুর্গ— এখানে আপনি যদি আসেন সে আমার অনুমতি সাপেক্ষ।"

ম্যাপখানা আগেই জড়িয়ে ফেলেছিল রবীন মাষ্টার। সে ম্যাপখানা এবং ইস্কুলের দু'খানা বই হেড মাষ্টারের হাতে দিয়ে সে ব'ললে, "এই নিয়ে যান আপনার ইস্কুলের সম্পত্তি। আর বাড়ীতে আমার কাজে হাত দেবেন না।"

এই শান্ত, নিরীহ লোকটির এতটা স্পর্দ্ধা দেখে হেড মাষ্টার অবাক্ হ'যে গেলেন। কি ব'লবেন ঠিক ক'রতে না পেরে ম্যাপখানা আর বই দু'খানা বগলে ক'রে তিনি রাগে কাঁপতে কাঁপতে হন্ হন্ ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

এর পর হেড মাষ্টার আদা-জল খেয়ে লাগলেন রবীন মাষ্টারের পেছনে। গাঁয়ে একটা হৈ চৈ লেগে গেল।

ভুবনবাবু ছিলেন ইস্কুল কমিটির প্রেসিডেন্ট। হেড মাষ্টার তাঁর কাছে গিয়ে ব'ললেন, "রবীন মাষ্টারকে না ছাড়ালে ইস্কুলের ডিসিপ্লিন থাকবে না।"

ভুবনবাবু যদিও এই দিগ্‌গজ এম-এ-টিকে যথেষ্ট সমীহ ক'রতেন, তবু একথা শুনে তিনি ব'ললেন, "রবীনকে তাড়াবে? তারি এ ইস্কুল! তাকে তাড়াবার তুমি আমি কে হে?"

সতীশ চৌধুরী কমিটির আর একজন সভ্য। তাঁর কাছে গিয়ে হেড মাষ্টার মৌখিক সহানুভূতি পেলেন, কিন্তু তিনি বুদ্ধিমানের মত ব'ললেন, "ওকে তাড়ালে যদি ও আর একটা ইস্কুল খুলে ব'সে আপনার ইস্কুলে ছেলে থাকবে না একটিও।"

নিরুপায় হ'য়ে হেড মাষ্টার তাঁর মুরুব্বী ইনস্পেক্টরকে ধ'রলেন।

তিনি ব'ললেন, "না হে না, ও থাক। বেচারা এত কষ্ট করে ইস্কুলটা ক'রেছে।"

কাজেই রবীন মাষ্টারকে তাড়ানো গেল না। কিন্তু নির্য্যাতন হ'ল তার বিষম।

রাগের ঝোঁকে একটা বেতমিজি ক'রে ফেলেছিল রবীন মাষ্টার, কিন্তু ঝগড়া করা তার স্বভাব নয়। তাই হেড মাষ্টারবাবুর সব অত্যাচার সে নীরবে সহ্য ক'রলে। বাড়ীতে ছেলে পড়ান সে ছেড়ে দিলে, সবই ছেড়ে দিলে, শুধু ইস্কুলের ছক্-কাটা রুটিন দেখে নিয়ম বেঁধে পড়াতে লাগলো—হিষ্টরী আর হাইজীন।

সেই থেকে রবীন মাষ্টার বদলে গেল।

আগে গ্রামে যা কিছু হ'ত তার ভিতর সে-ই মাথা পেতে দিত সবার আগে। এখন সে কোনও কিছুতেই যায় না। চুপ-চাপ ইস্কুলের কাজ করে, আর ঘরে বসে কি যে করে সারাদিন, কেউ খবর রাখে না। তার অসাধারণ কাজের মধ্যে আছে শুধু বছরে দু'বার ক'লকাতা যাওয়া। পূজোর ছুটি আর গরমের ছুটিতে ক'লকাতা তার যাওয়াই চাই।

ক'লকাতায় তাকে দেখা যায় শুধু পুরানো বইয়ের দোকানে, আর ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী কিম্বা অন্য কোনও লাইব্রেরিতে। পুরোনো বইয়ের দোকানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে সে বই নিয়ে পড়ে, আর নেহাৎ দায় প'ড়লে এক আধখানা কেনে।

বই কিনে নিয়ে সে বাড়ীতে আসে চোরের মতন। চুপি চুপি বাড়ীতে ঢুকে সে কোনও মতে বইয়ের পোঁটলা তার বাইরের ঘরে এক কোণায় লুকিয়ে রেখে তার ক্যাম্বিশের ব্যাগ নিয়ে বাড়ীর ভিতর যায়। এতটা লুকোচুরীর হেতুটা খোলসা ক'রে বলা দরকার।

২

রবীন মাষ্টার বিয়ে ক'রেছিল একটু বেশী বয়সে। তার স্ত্রী ছিল তখন ছোট।

কিছু দিন তার বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে কাটলো। নিস্তারিণী বয়সে ছোট হ'লেও কাজ-কর্ম্মে খুব পটু। সংসার সে খুব গুছিয়ে ক'রতে জানে। বারো বছরের মেয়ে সে, সংসারের সব কাজ-কর্ম্ম একা ক'রতে পারে। রবীন কিন্তু দেয় না তাকে সব ক'রতে। এতদিন সে আর তার মা ছিল—মাকে বসিয়ে রেখে নিজে খেটে-খুটে কাজ করাই তার ছিল অভ্যাস। এখনও সে স্ত্রীর সঙ্গে হাতে হাতে সব কাজ ক'রে দেয়, মনের আনন্দে।

এতে কিন্তু নিস্তারিণীর ক্রমে একটা বদভ্যাস দাঁড়িয়ে গেল। স্বামীর কাছে কাজ পাওয়াটা তার অভ্যাস হ'য়ে গেল। এবং সতেরো বছর না পার হ'তেই সে স্বামীকে রীতিমত কাজের হুকুম ক'রতে লাগলো।

এতে হ'ল এই যে, রবীন মাষ্টার আগে যেটা ক'রতো মনের আনন্দে, সেই কাজ হ'য়ে গেল তার একটা দারুণ বোঝা! বিশেষ, এখন তার ইস্কুলের কাজ বেড়ে গেছে; আর তার একটা বই পড়বার বাতিক দাঁড়িয়ে গেছে। কাজেই তার অবসর বড় কম। তাই স্ত্রীর ফরমায়েস তাকে ক্রমে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুললো। আর দেখা গেল যে, সে নির্ব্বিবাদে সব ফরমায়েস খাটে ব'লেই ফরমায়েসের বহর দিনে দিনে বিষম বেড়ে চ'ললো।

এই সময়ে রবীন মাষ্টার বাড়ীতে ছেলেদের পড়াতে আরম্ভ

ক'রলে। সকালে—সন্ধ্যায় সব সময়েই তার কাছে একদল না একদল ছেলে আসেই।

এতে একটা সুবিধা হ'ল এই যে, ছেলেরা অনেক সময় ফরমায়েস খাটতে লাগলো। দশের লাঠি একের বোঝা! কাজেই ছেলেদের কারও খাটুনি গায় লাগে না, তারা মনের আনন্দে নিস্তারিণীর হুকুম তামিল করে। রবীন মাষ্টারের হাড়টায় এতে একটু বাতাস লাগলো।

কিন্তু কাজও বেড়ে গেল।

সতেরো বছর পার না হ'তেই নিস্তারিণী তিনটি পুত্র-কন্যা প্রসব ক'রলেন। প্রত্যেকটির সঙ্গে সঙ্গে এলো লম্বা কাজের ফর্দ্দ। আরও অনেক জটিলতার সৃষ্টি হ'ল।

ছেলে হবার পর তাদের মানুষ করা নিয়ে একটা সংগ্রাম ঘনীভূত হ'য়ে উঠলো। নিস্তারিণীর ছেলে মানুষ করবার পদ্ধতি খুব সহজ এবং সংক্ষিপ্ত। সময়ে অসময়ে তাদেরকে খাবার দিয়ে বসিয়ে রাখা এবং অবসর সময়ে তাদের পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করা এর অতিরিক্ত কোনও কিছু প্রয়োজন সে অনুভব ক'রতো না।

ইস্কুল থেকে রবীন গোড়ায়ই শিক্ষা-পদ্ধতির কয়েকখানা বই আনিয়েছিল। সেই বই প'ড়ে সে আনিয়ে ছিল ফ্রেবেল ও পেষ্টালট্‌সির নিজের বই! তারপর সে প'ড়তে আরম্ভ ক'রেছিল সাইকলজির বই। ইতিহাস পড়ায় ব'লে সে প'ড়তে লাগলো রাজ্যের ইতিহাসের বই। তারপর তার বই পড়বার বাতিক বেড়ে বেড়ে সোসিয়োলজি আর ইকনমিক্‌সে এসে জমে গেল। ছেলে হবার সম্ভাবনা হ'তেই সে নিজের পয়সা খরচ ক'রে আনালে শিশুপালন ও শিক্ষার দু'খানা বই!

সেই সব বই প'ড়ে প'ড়ে সে তার ছেলেদের মানুষ ক'রবে স্থির ক'রলে। বলা বাহুল্য, সে পদ্ধতির সঙ্গে সময়ে অসময়ে মুড়ীর কাঠা সামনে দিয়ে বসিয়ে রাখা বা চপেটাঘাত করা একেবারেই খাপ খায় না।

এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে লাগলো বচসা। নিস্তারিণী স্পষ্ট ক'রে বলে দিলে, "অত শত আমি পারবোনা—আমার ছেলে রাখা পছন্দ না হয়, নিজে কর সব—পোহাও এদের হাঙ্গামা, দু'দিন দেখি।"

কাজেই রবীন মাষ্টারকে নিজেই ছেলেদের ভার নিতে হ'ল। নিস্তারিণী ক'রলে সম্পূর্ণ নন্-কো-অপারেশন।

তিনটি ছেলে-পিলে যখন পাঁচটি হ'ল আর তারপর বড় দু'টিকে যখন যমের হাতে তুলে দিতে হ'ল—তখন রবীন হাল ছেড়ে দিলে ছেলেদের মানুষ করবার ভার থেকে সে ছুটি নিলে।

কিন্তু সে ছুটি নিতে চাইলে হয় কি? ছেলেগুলো স্বভাবতঃই তার নেওটা হ'য়ে উঠেছিল। মায়ের ধারে-কাছেও তারা যেতে চায় না। তাই কম্‌লি ছাড়লো না। আর নিস্তারিণীও এতদিন গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়িয়ে চট্ ক'রে ছেলেদের ঝক্কি নিজের ঘাড়ে নিতে মোটেই রাজী হ'লেন না। কাজেই রবীন যতই চেষ্টা করুক ছেলেদের হাঙ্গামা ছেড়ে তার কাজ ক'রতে—ছেলেরা তার ঘাড়ে রইলোই। যদি বা কখনও তার কাঁধ ছাড়ে, অমনি দেখতে না দেখতে নিস্তারিণী তাদের কুড়িয়ে এনে রবীনের কাছে দিয়ে ব'লে "বলি, এদের দু'টোকে রাখ না একটু—অস্থির ক'রে তুললে যে আমায়।"

নিস্তারিণীর কোনও দোষ নেই। সংসারের কাজ—ভারী ভারী কাজ, তরকারী কোটা, রান্না বাড়া, ঘর ঝাঁট দেওয়া, নেপা পোছা, কাঠ শুকোনো, ধান শুকোনো, এই সব গুরুতর কাজে সে সদা

ব্যস্ত। ছেলে দেখবার সময় তার কোথায়? অথচ স্বামীটি, তার বিবেচনায়, কোনও কাজই করে না। শুধু ঘরে ব'সে নিরর্থক কতকগুলো বই পড়ে, গোটা কয়েক বাইরের ছেলে টেনে এনে হৈ চৈ ক'রে, আর টো টো ক'রে বেড়ায়, সব নেহাৎ বাজে কাজ! এমন নিষ্কর্ম্মা মানুষ—ছেলেগুলো যদি ধরে তবু তো কাজ হয়।

পঁচিশ বছর বয়স হ'তে না হ'তে নিস্তারিণীর শরীর একেবারে ভেঙ্গে গেল। সে হ'য়ে গেল রীতিমত বুড়ী—অস্থিচর্ম্মসার, কালো—এবং অতিশয় খিটখিটে। খাটা-খুটি তার পক্ষে সম্ভব রইলো না, তাই রবীনকে ধ'রে আনতে হ'ল তার এক বিধবা দূর সম্পর্কের পিসতুতো বোন মাতঙ্গীকে।

তারপর নিস্তারিণী কাজে একেবারে ইস্তফা দিল। যা পারে সে, তাও সে করে না। করবার দরকারই বা কি? মাতঙ্গী আছে। বিধবা মেয়ে, তিন কুলে তার কেউ নেই তারা ছাড়া—সে খাটবে। না খাটবে কেন? নইলে বিধবা হ'ল কেন?

বিধবা আত্মীয়া, যাদের খাবার-পরবার নেই তারা এই ক'রতেই তো আছে। ভগবান দয়া করে এই বিধবাদের যদি না সৃষ্টি ক'রতেন তবে আমাদের সনাতন হিন্দু-সমাজ চ'লতোই না। এরা দাসীর মত খাটবে, অথচ মাইনে দিতে হবে না এদের, খাবে—সেও এক বেলা। কালে-ভদ্রে দু'চার আনা পয়সা যদি চায়—কি দরকার তাদের? পেলেই হয় তো অন্যায় কিছু ক'রে ব'সবে! খাও, ছেঁড়া-খোঁড়া যা পাও পর, আর খেটে যাও—যেহেতু বিধাতা সমাজের প্রতি দয়া ক'রে তোমাদের এরই জন্যে বিধবা ক'রেছেন। পুরস্কার?—তোমাদের ত্যাগ, সেবা, নিষ্ঠা ও দেবীত্ব নিয়ে খাসা খাসা কবিতা লিখবো, প্রবন্ধ লিখবো!—আর কি চাও?

ঘরের কাজ করে মাতঙ্গী—বাইরের কাজ, ফুট-ফরমাস করবার জন্যে আছে রবীন মাষ্টার, আর তার ছাত্রগুলো। কাজেই এর পর নিস্তারিণীর গিন্নীপনা কেবল হুকুম করায় পর্য্যবসিত হ'ল। সকালে উঠে ঘরের দাওয়ায় ব'সে সে আরম্ভ করে চেঁচাতে, রাতদুপুরে তার বাইরের ফরমাস শেষ হয়। তারপর ফরমাস চলে একা রবীনের উপর সারারাত্রি—যখনি নিস্তারিণীর ঘুম ভাঙ্গে।—বেশ চলে।

বিয়ের পর কিছুদিন রবীন চেষ্টা ক'রেছিল নিস্তারিণীকে নিজের মনের মত ক'রে ছাঁচে ঢেলে মানুষ ক'রতে। অল্পদিন বাদেই সে হাল ছেড়ে দিয়েছিল। ছেলেপিলে হবার পর সে চেষ্টা ক'রেছিল নিস্তারিণীকে ডিঙ্গিয়ে ছেলে মানুষ ক'রতে—নিজের ইচ্ছা বহাল রাখতে। সে চেষ্টাও সে ছেড়ে দিয়েছিল। এখন সে হাল ছেড়ে লাঙুল গুটিয়ে প'ড়ে থাকে তার বাইরের ঘরে,—ইস্কুলে পড়ায়, ইস্কুলের দরকারে যতটা প্রয়োজন বাইরে ছুটাছুটি করে।—আর দিনরাত, যখনি ফাঁক পায় ব'সে ব'সে প'ড়ে।

যখন হেড মাষ্টারের কড়া শাসনে তার ছাত্রদেরকে ছেড়ে দিতে হ'ল, তখন হ'ল মহাবিপদ। রবীন মাষ্টার দেখলে তার ছুট্-ফটানি মিথ্যে, যত আইডিয়াই তার থাক, তা নিয়ে কাজ করা তার হবে না। পরকে মানুষ করবার ভার সে নিয়েছিল, কিন্তু সমাজের হুকুম হ'ল যে কেউ তার হাতে মানুষ হবে না। এখন সে করে কি ?

অনেকগুলো আদর্শ নিয়ে সে কাজ আরম্ভ ক'রেছিল। তার ছোট দুনিয়াটাকে পারে তো রাতারাতি বদলে তার চেয়ে ভাল ক'রবে, এই পণ ক'রে অনেক কিছু কাজে সে হাত দিয়েছিল। সে সব কাজ একটি একটি ক'রে তার হাত-ছাড়া হ'য়ে গেল। কচ্ছপ যেন সব ক'টি পা বের ক'রে চলছিল, এক একটি পায়ে ঠোকা খেয়ে সে গুটিয়ে দিলে

সেগুলো ক্রমে তার খোলসের ভিতর! চারিদিকে রবীন হাত-পা ছড়িয়ে ব'সে ছিল, সবগুলি গুটিয়ে নিয়ে সে আপনার ভিতর আপনি ঢুকে বসে রইলো।

বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক তার মিটে গেল, তাই তার কর্ম্ম-পিপাসা ছড়িয়ে প'ড়লো অন্তর জগতে।

যখন ইস্কুল খোলে সে, তখন থেকেই সে প'ড়তে আরম্ভ করেছিল! তার প্রয়োজন অনুসারে প'ড়তে প'ড়তে তার পড়ার ক্ষেত্রটা প্রয়োজন ছাড়িয়ে অনেক বেশী দূর প্রসারিত হ'য়ে প'ড়েছিলো।

তাই যখন তার বাইরের কাজ ঘুচে গেল তখন সে লাগলো প'ড়তে। সমস্ত দিন সে প'ড়ে থাকে তার ঘরে, আর ব'সে ব'সে পড়ে। তিরিশ থেকে বাড়তে বাড়তে তার মাইনে হ'ল চল্লিশ টাকা। তাতে খোরাক পোষাক চলাই ভার—চলে যে, সে কেবল দু'চারখানা ক্ষেত আছে ব'লে। তবু সে তারই ভিতর বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে বই কিনতে লাগলো। বই কেনে বা ধার করে সে, আর নেহাৎ লোভে প'ড়লে এক আধখানা চুরিও যে না করে তা নয়। আর দিনরাত সে প'ড়ে থাকে সেই বই নিয়ে।

থাকে না—থাকতে চায়, কিন্তু পারে না। কেন না বাইরের হাঙ্গামা মিটে গেলেও তার ঘরের হাঙ্গামাটি পূর্ণ-গৌরবে বর্ত্তমান ছিল। যতদিন ছেলেরা বাড়ীতে আসতো ততদিন হাঙ্গামার বেশীর ভাগ পড়তো তাদের উপর—এখন রইলো শুধু রবীন নিজে!

তাই স্ত্রীর ফরমায়েসে সে বেশীর ভাগ সময় ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে থাকে—যেটুকু সময় পায় সে পড়ে।

ওই যে ঘরের মধ্যে গোঁজ হ'য়ে দিনরাত হাত পা ভেঙ্গে নিষ্কর্ম্মা হ'য়ে পড়ে থাকা, এটা—কাজের লোক নিস্তারিণী—দু'চক্ষে দেখতে পারে না। তাই সে প্রায়ই তাড়া ক'রে এসে রবীনকে শুনিয়ে যায় যে

নিস্তারিণী সমস্ত সংসারের হাঙ্গামা মাথায় ক'রে যেখানে খেটে ম'রছে, সেখানে রবীনের এমনি একেবারে নিষ্কর্ম্মা হ'য়ে ব'সে থাকৃতে লজ্জা করা উচিত !

একদিন এমনি তাড়া ক'রে এসে নিস্তারিণী দেখতে পেলে যে, রবীন পিয়নকে দুটো টাকা দিয়ে কি একটা জিনিষ নিলে। খুলে দেখে—ওমা—ছেঁড়া—খোঁড়া পুরোনো দু'খানা বই।

পিত্ত জ্বলে গেল নিস্তারিণীর। কি কষ্টে যে সংসার চালায় সে সেই জানে, আর মিন্সে কি না সেই কষ্টের সংসারের টাকা এমনি ক'রে অপচয় করে বই কিনে ! কি না—প'ড়বে ! কাজের মত কাজ ক'রবে না একটা—শুধু প'ড়বে !

এমন একটা লম্বা বক্তৃতা সেদিন হ'যে গেল যে, তাতে রবীনের জন্মের মত শিক্ষা হ'য়ে গেল। বই পড়া সে ছাড়তে পারলে না, কেনাও সে ছাড়লে না, কিন্তু সব ক'রতে লাগলো অতি গোপনে।

তাই সে প্রতি ছুটিতে ক'লকাতা যায়, দোকানে দোকানে ঘুরে যতদূর পারে বই পড়ে, আর সস্তায় ভাল বই পেলে সামান্ত দু'চারখানা সে কিনে আনে—অতি গোপনে, যাতে নিস্তারিণী কিছুতেই জানতে না পারে।

পুরোনো বইয়ের দোকানে অনেক সময় অনেক ভালো ভালো বই থাকে। খুঁজে খুঁজে রবীন মাষ্টার সেগুলো বেছে নিয়ে প'ড়তে থাকে। ঘন্টার পর ঘণ্টা সে প'ড়েই যাচ্ছে। এমন অনেকদিন হ'য়েছে যে দোকানদার ধমকে উঠেছে, "সারা বইখানা এখানে দাঁড়িয়ে প'ড়বে বাবু? এখানে বই পড়বার জায়গা নয়।" মুখখানা কাঁচুমাচু ক'রে অমনি রবীন ভয়ে ভয়ে জিগ্‌গেস করে দাম কত। দাম শুনে মুখ কালি ক'রে বইখানা রেখে দেয়। আর একখানা টেনে নেয়, আর দুই চার

খানা হাত ফিরিয়ে, এদিক ওদিক চেয়ে আবার সঙ্গোপনে সেই বই-খানাই টেনে নেয়। তারপর তার সাধ্যের ভিতর অল্পদামের এক আধখানা বই কেনে। পরের দিন আবার যায়—এদিক ওদিক চেয়ে আবার সেই দামী বইখানা টেনে নেয়।—এমনি ক'রে পাঁচ সাতদিন ঘুরে সে এক একখানা বড় বড় বই শেষ ক'রে ফেলে। ঘরে ফিরে, যা প'ড়লো তার চুম্বক ক'রে রাখে।

বইয়ের দোকানে এমনি ঘুরে ঘুরে তার কত যে নাকাল হ'তে হ'য়েছে তার সীমা নেই। তবু এমন তার বই-ক্ষেপামী যে, সে সেখানে না গিয়ে পারে না। এর জন্যে ঘরে খায় বকুনি, বাইরের লোকে তাকে ঠাট্টা করে, পাগল বলে। ঘরে বাইরে কথা শুনে ভারী সঙ্কোচ হয় তার। সে পড়ে—গোপনে। লোকের সাড়া পেলে বই লুকোবার পথ পায় না—যেন কত বড় অপকর্ম্ম সে ক'রেছে।

এত যে পড়ছে সে, এত শিখছে, অন্য লোকের হয় তো হত দম্ভ, ক'রতো তারা বড়াই। রবীন মাষ্টার দম্ভ ক'রবে কি, ভয়েই সে সারা! প'ড়ে সে একটা দিগ্বিজয় ক'রছে এমন ধারণা তার ছিল না। ভারী পণ্ডিত হ'য়েছে সে, এ সন্দেহও তার মনে হয় নি কোনও দিন। পড়তো সে—শুধু না প'ড়ে পারতো না ব'লে। খিদে-তেষ্টার মত ছিল তার এই পাঠ-বুভুক্ষা। এতে ক'রে সে যে অন্য লোকের চাইতে বড় বা ভাল কিছু কাজ ক'রছে এ কথা ভাবতে পারতো না সে। ভাবতো, ক'রছে এমন একটা কাজ যা সবার বিচারে—পাগলামী, একটা নিদারুণ অকার্য্য—যেটা কোনও মতে চেপে রাখাটাই সুযুক্তি।

মান-ইজ্জত তার নেই ব'ললেই চলে। ঘরে নিস্তারিণী তাকে যা নয় তাই ব'লে বকে। বাঁদর, কুকুর, ছাগল, জানোয়ার—এ সব তো তার নিত্য ব্যবহার্য্য বিশেষণ। গাল খেয়ে সে চুপ করে মাথা নীচু

ক'রে—বেহায়া এমন—ঢোকে সেই তার পড়ার ঘরেই, আর লুকিয়ে লুকিয়ে সেই বই নিয়েই প'ড়তে বসে যার জন্ত তার এত নাকাল।

ইস্কুলে হেড মাষ্টার তাকে উঠতে বস'তে নাকাল করেন। ছেলেদের সামনে বকাবকি করেন। রবীন মাষ্টার মুখ নীচু ক'রে থাকে, হেড মাষ্টার স'রে গেলে সে হাসে—আর ছেলেদের পড়াতে আরম্ভ করে, যেন কিছুই হয় নি।

একদিন একটা কাণ্ড হ'ল।

সেবার ক'লকাতায় গিয়ে পুরোনো দোকানে এক আনায় একখানা ছেঁড়া বই পেয়ে সে কিনে ফেললে—সেখানা মার্কস্-এর কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো। বইখানা প'ড়ে তার তাক লেগে গেল। বার বার প'ড়ে সেটা হজম করে ফেললে। এই বইয়ে মার্কস্ মানব-সমাজের পরিণতির একটা সাধারণ ইতিহাস দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে যুগে যুগে লোকে ক্ষুধার তাড়নায়' কেমন ক'রে দলাদলি ক'রে লড়াই ক'রতে ক'রতে সমাজ গঠনের প্রণালী, সৃষ্টি ও পরিবর্ত্তন করেছে।

প'ড়ে তার মনে হ'ল যে, ভারতের ইতিহাসের ধারাটা তা' হ'লে কি রকম হ'য়েছে? ভারতবর্ষের ইতিহাস তার পড়াতে হয়, তাই সে প'ড়েছে অনেক ইতিহাসের বই। যে বই সে পড়ায় তাতে মামুলী ভাবে যুগের পর যুগের কথা লেখা হ'য়েছে, ইতিহাসের বিবর্ত্তনের পরিচয় নেই কিছুই। সে ভেবে ভেবে নিজের মনে মার্কস্-এর ধারা অনুসারে ভারতের ইতিহাসের বিবর্ত্তন একটা গ'ড়ে ফেললে।

একদিন প্রথম শ্রেণীতে ইতিহাস পড়াতে গিয়ে সে ছেলেদের বোঝাতে আরম্ভ ক'রলে তার এই বিবর্ত্তন-বাদ। বোঝাতে বোঝাতে অনেক নূতন কথা তার মনে এলো। বেড়েই চললো তার কাহিনী। এমনি ক'রে সে ঝাড়া একমাস ছেলেদেরকে ভারতের ইতিহাসের হিন্দু

যুগের materialistic বিবর্ত্তন-ব্যাখ্যা ক'রে গেল। এক আধটা ছেলে বেশ বুঝলো, বেশীর ভাগই শুনে গেল, বিশেষ বুঝলো না।

একমাস বাদে একটি ছেলের বাবা ছেলেকে পড়াতে গিয়ে দেখলেন যে, এ এক মাসের মধ্যে হিষ্টরী বইয়ের এক পাতাও পড়ান হয় নি। 'কি পড়িয়েছে মাষ্টার ?'—এ কথা ছেলেকে যখন জিজ্ঞেস ক'রলেন, তখন সে বুদ্ধিমান ছেলে বললে, তিনি খালি বলেন "thesis, antithesis, synthesis" সমস্ত বক্তৃতার মধ্যে এই তিনটে কথাই তার মনে ছিল। বাবা তো চটে লাল। বুঝলেন রবীন মাষ্টার ডাহা ফাঁকি দিচ্ছে। তিনি এফ্-এ ফেল, ভুবনবাবুর সদর নায়েব। হিষ্টরী তাঁর পড়া আছে—তার ভিতর এ তিনটে কথার একটাও তিনি কোনও দিন শোনেন নি।

তেড়ে মেরে তিনি হেড মাষ্টারের কাছে গেলেন।

হেড মাষ্টার একখানা খাতা ক'রেছিলেন, তার ভিতর কোন্ দিন কোন্ মাষ্টার কোন্ বইয়ের ক'পাতা পড়ালেন তা লেখবার নিয়ম ছিল। জানা ছিল, রোজ হেড মাষ্টার দেখবেন সে খাতা, কিন্তু তিনি দেখতেন না মোটেই। এখন সদর নায়েববাবুর এই আক্রমণের ফলে খাতাখানা টেনে নিয়ে দেখে তাঁর চক্ষু স্থির।—এ একমাস রবীন মাষ্টার লিখেছেন শুধু "general lecture."

খেলে যা! এক মাস বাদে কোয়াটারলি। তাতে সমস্ত হিন্দু পিরিয়ডের পরীক্ষা হবে। এতদিন এক পাতাও বই প'ড়লে না ছেলেরা!

রবীন মাষ্টারের তলব হ'ল। হেড মাষ্টারবাবু তাকে এমন ঝাড়ন ঝেড়ে দিলেন যে, অন্য মাষ্টার হ'লে না খেতে পেলেও চাকরী ছেড়ে দিত। রবীন মাষ্টার শুধু মুখ কালির মত ক'রে ক্লাসে গিয়ে বললেন,

"হ্যাঁ এইবারে অশোকের চ্যাপ্টার—অশোক হলেন কে? চন্দ্রগুপ্তের ছেলে বিন্দুসার, তার ছেলে অশোক"—ইত্যাদি। Materialistic interpretation of Indian History ক্লাসে আর শোনা গেল না।

ফল কথা, অপমান হজম করবার অসামান্য শক্তি ছিল এই লোকটার। খুব বেশী অপমান হ'লে সে মাথা নীচু ক'রে ঢোকে গিয়ে তার বইয়ের ঘরে, আর সেখানে প'ড়তে প'ড়তে সব ভুলে যায়।

এমনি দিন যায় তার। দিন যেতে যেতে তার চুলগুলো পেকে উঠলো বারো আনা, দাড়ি গোঁফ পাকলো আট আনা রকমের। সেগুলিতে চিরুনী লাগাবার কোন বালাই ছিল না, নাপিতেরও হাত প'ড়তো না ন' মাসে ছ'মাসে। পরণের কাপড় তার একে খাটো তায় দারুণ ময়লা। জামা প্রায় থাকতো না—স্কুলে যাবার সময় প'রে যেত একটা চেক ছিটের পিরাণ, তার অর্দ্ধেক বোতাম থাকতো না, আর কাঁধে ফেলে যেত পাট ক'রে ভাঁজ করা একখানা চাদর যা, ধোপার ঘর ছ'মাস দেখে নি। চটী জুতো একজোড়া কখনও থাকতো কখনও থাকতো না—পেটেও ভাত যে সব দিন নিয়ম ক'রে থাকতো এমন নয়, কেন না নিস্তারিণীর অনেক দিনই রান্নার দেরী হয়ে যেত—সেদিন না খেয়েই বেরুতে হ'ত।

দিনে দিনে খ্যাতি তার বেড়েই গেলো। দশ বিশখানা গ্রামের যে কেউ তাকে দেখলেই এক ডাকে বলে দিতে পারতো, এ সেই পাগলা মাষ্টার!

অনেক বছর আগে যে এই পাগলা মাষ্টারই এই ইস্কুল গ'ড়ে তুলেছিল, সে কথা যারা জানতো তারা কতক গেছে ম'রে, বাদবাকী লোকে গেছে ভুলে। এখন সবাই জানে যে সে হ'ল চিরন্তন থার্ড মাষ্টার—এবং চিরদিনের পাগল।

৩

দু'একজন লোক আছেন যাঁরা সেকালের রবীন মাষ্টারের কথা একটু মনে ক'রে রেখেছেন, তার মধ্যে ভুবনবাবু একজন।

ভুবনবাবু বুড়ো হ'য়েছেন খুব, তিনি আর কাজ-কর্ম্ম কিছু দেখেন না, দেখে তাঁর বড় ছেলে যোগেশ। গাঁয়ের মাথা এখন তিনি নন, যোগেশ। যোগেশের ঘরেই যত দরবার হয়, আড্ডা বসে, গ্রামের পলিটিক্সের চর্চ্চা হয়।

ভুবনবাবু থাকেন সাড়ম্বর পূজা-আহ্নিক ধর্ম্ম-কর্ম্ম আর—দাবা নিয়ে। এই দাবা খেলার জন্য তাঁর দরকার হয় রবীন মাষ্টারকে, আর রবীন মাষ্টারের দরকার হয় তাঁকে।

রবীন মাষ্টার আসে। কোনও কথা না ব'লে চুপ চাপ কুলুঙ্গির উপর থেকে দাবা ব'ড়ে আর ছক নামিয়ে সাজিয়ে বসে ভুবনবাবুর সামনে, আর খেলা সুরু হ'য়ে যায়। কথাবার্ত্তা কিছু, ব'লতে গেলে, হয়ই না তাদের।

রবীন মাষ্টারের খেলাটা সাধারণ খেলোয়াড়ের মত নয়। সে খেলতে ব'সবার আগে মনে মনে গোটা খেলার সবগুলি মোটা মোটা চাল ঠিক ক'রে নিয়ে গোঁ ধ'রে সেই চালের অনুসরণ করে। এই সব চাল কতক সে বই প'ড়ে শেখে, আর কতক নিজের মনে ভেবে ভেবে তৈরী করে। যে চাল সে নিজে আবিষ্কার করে তাতে সে দু'চার দিন ঠ'কে শেষে সেটা এমন ক'রে দুরস্ত ক'রে নেয় যে সে জেতেই। পাকা খেলোয়াড় যারা তারা প্রথমে তার চাল দেখে মনে মনে হাসে—ভাবে ম'ল এই। শেষে এমন প্যাঁচেই তারা পড়ে যে, সামলাতে হিমসিম খেয়ে যায়।

যে দিন দাবার বৈঠক বসে সে দিন আর সময়ের কোনও ঠিকানা থাকে না। খেলেই যায় দু'জনে। যখন রবীন মাষ্টার বাড়ী ফেরে তখন দেখতে পায় নিস্তারিণী ভাত ঢাকা দিয়ে রেগে টং হ'য়ে ব'সে আছে—যদি না ঘুমিয়ে পড়ে থাকে। গালাগালি খেতে খেতে সে কোনও মতে মাথা গুঁজে দু'টো খায়—সব দিন খেতে পায়ও না। তারপর তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরে গিয়ে বই নিয়ে পড়া ছাড়া আর তার গত্যন্তর থাকে না।

* * * *

ভুবনবাবু খেলছিলেন দাবা।

তাঁর পিলটা টিপে দিয়ে ভুবনবাবু ব'ললেন "কিস্তী!"

যোগেশ ঘরে এসে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। এইবার ফাঁক পেয়ে ব'ললে, "বাবা, একটা কথা আছে।"

ভুবনবাবু ব'ললেন, "কি কথা বাবা?"—ব'লেই একবার ছকের দিকে চাইলেন। রবীন মাষ্টার তখন ছকের উপর ঝুঁকে প'ড়ে যেন চোখ দিয়ে সেটা গিলে খাচ্ছে।

যোগেশ ব'ললে, "হেড মাষ্টারবাবু এসেছেন স্কুলের কয়েকটা কথা ব'লতে।"

ইতিমধ্যে রবীন রাজাকে একপদ সরিয়ে দিয়ে তেমনি তীব্র-দৃষ্টিতে ছকের দিকে চেয়ে রইলো। ভুবনবাবুর আর শোনা হ'ল না। তিনি ব'ড়ে ঠেলে পিলটাকে জোর দিলেন।

তারপর ঠিক তিন চালে ভুবনবাবু মাৎ!

ভুবনবাবু মহা বিরক্ত হ'য়ে যোগেশের উপর ক্ষেপে প'ড়লেন, ব'ললেন "বাপু হে, তোমার ও ঘোড়ার ডিমের কথাটা ব'লবার আর সময় পেলে না, এলে ঠিক এই সময়। কোথায় আমি মাৎ

ক'রবো, না মাৎ হ'য়ে গেলাম। একটু কাণ্ডজ্ঞান যদি তোমার থাকে।"

মহা বিরক্তভাবে চিৎ হ'য়ে প'ড়ে তিনি গড়গড়া টানতে লাগলেন।

রবীন চুপ চাপ আবার ছক সাজাতে লাগলো।

সাজান হ'য়ে গেলে ভুবনবাবু ব'ললেন, "রেখে দাও হে, ও আর এখন হবে না। মেজাজটা খিঁচড়ে গেছে। এমন বে-আক্কেল ছেলেটা—একটু যদি বুদ্ধিশুদ্ধি থাকে। একেবারে খেলার সঙ্গীন সময়টায—ওর না কি আমার কাছে দরকার! কিসের দরকার হে বাপু? দরকার থাকে, নিজে বুদ্ধি খাটিয়ে ক'রতে পার না? আমি এতদিন বেঁচে আছি এইটেই যেন আমার অপরাধ, নইলে ম'রে গেলে কার কাছে গিয়ে ব'লতে? তখন তো নিজের বুদ্ধিতেই সব ক'রতে হ'ত। সব তো দিয়েছি ছেড়ে তোমার হাতে—যা বোঝ, কর না বাপু! আমি বুড়ো মানুষ ধর্ম্মকর্ম্ম নিয়ে আছি—আমাকে কেন ঘাঁটাও?"

এই বক্তৃতার মাঝখানে রবীন মাষ্টার দাবার ছক আর গুটি তুলে নিয়ে কুলুঙ্গীর উপর রেখে কাউকে কোনও কথা না ব'লে ছাতা বগলে ক'রে হন হন ক'রে চ'লে গেল। যেতে যেতে নিজের মনে মনে কি যেন ব'লতে লাগলো, আর হাত নেড়ে চেড়ে ঠিক যেন একটা কাল্পনিক বোর্ডের উপর জিওমেট্রীর নক্সা আঁকতে লাগলো।

এতই অন্যমনস্ক হ'য়ে ছিল সে যে, তার পথ ছেড়ে যে সে ঘাসের উপর গিয়ে পৌছেছে সেটা তার খেয়াল ছিল না, আর সেখানে যে যোগেশের ছোট ছেলে খেলা ক'রছে, তাও তার হুঁস হয় নি।

হুমড়ি খেয়ে সে ছেলেটার ঘাড়ের উপর প'ড়তেই রবীন মাষ্টার মহা অপ্রস্তুত হ'য়ে ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে আদর ক'রতে লাগলো। তাতে হিতে বিপরীত হ'ল। কেন না এই পাগলা মাষ্টার ছিল এ যুগের ছোট ছেলেদের মহা ভীতির কারণ। বেশী কান্নাকাটি ক'রলে বয়স্কেরা তাদের এই পাগলা মাষ্টার দেখালেই তারা ঠাণ্ডা হ'য়ে যেতো। সেই পাগলা যখন তাকে ধ'রে কোলে নিলে, যোগেশের ছেলে তখন ভয় পেয়ে একেবারে আরও বিকট চীৎকার ক'রে উঠলো।

যোগেশ ছুটে গিয়ে ছেলেকে রবীন মাষ্টারের কোল থেকে কেড়ে নিয়ে মাষ্টারকে দিলে এমন ধাক্কা যে, সে প'ড়তে প'ড়তে কোন মতে টাল সামলে গেল, তারপর লাগালো এমন গালাগালি যে, তাতে মরা মানুষ হয়তো ক্ষেপে উঠতো—কিন্তু রবীন মাষ্টার শুধু মাথা নীচু করে মুখ কাঁচু মাচু ক'রে দাঁড়িয়ে হাত কচলাতে লাগলো।

যোগেশ ছেলেটাকে চাকরের কোলে দিয়ে চাকরটাকে আচ্ছা ক'রে কাণ ম'লে দিলে। তারপর দম্ দম্ ক'রে পা ফেলে সে ফিরে গেল বাপের কাছে—বেশ চটা মেজাজে।

ভুবনবাবুকে সে ব'ললে, "দেখলেন লোকটার আক্কেল! কাণা নয়, অন্ধ নয়, তবু পথ চ'লতে লোক চাপা দেয় ভর দুপুরে!"

ভুবনবাবু ব'ললেন, "না, রবীনটা দেখছি একেবারেই ক্ষেপে যাবে এবার। নইলে বুড়ো তো আমিও ওর চেয়ে ঢের বেশী, কই, আমার তো অমন হয় না।"

যোগেশ বেশ তাতের সঙ্গেই ব'ললে, "ওঁরই কথা ব'লতেই তো এসেছেন হেড মাষ্টারবাবু। নইলে ইস্কুলের কথা নিয়ে আপনাকে ঘাঁটাব কেন?"

খেলায় হেরে গিয়ে ভুবনবাবুর মেজাজ চ'টেই ছিল, তিনি ব'ললেন, "তা যাও, নিয়ে এসো তোমার হেড মাষ্টারকে! বাবা গো বাবা, শান্তি এরা দেবে না কিছুতেই! দু'দণ্ড যে ব'সে ভগবানের নাম ক'রবো তার উপায় নেই! সংসারে এসে যেন দাসখত লিখে দিয়েছি, জীবনের ওয়াদা পেরিয়ে গেল, তবু নারায়ণ নিচ্ছেন না—না জানি কত দুঃখ আছে কপালে!"

যোগেশ গেল হেড মাষ্টারকে ডাকতে, ভুবনবাবু তাড়াতাড়ি তাঁর মালাব থলে হাতে নিয়ে গট্ হ'য়ে বসলেন।

হেড মাষ্টার বিনীত ভাবে ঘরে ঢুকে ভুবনবাবুর পায়ের ধূলা নিয়ে তফাতে ব'সলেন। যোগেশ দাঁড়িয়ে রইলো।

ভুবনবাবু ব'ললেন, "কি হে বাপু, তোমার কথাটা কি? তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, ঘাটে পা বাড়িয়ে র'য়েছি, তবু তোমরা আমায় দেখছি শান্তি দেবে না। দু'দণ্ড নিশ্চিন্দি হ'য়ে যে ভগবানের নাম করবো তাও যে পারি না দেখি!"

হেড মাষ্টার ঘাড় নেড়ে ব'ললেন, "ভারি অন্যায় আমাদের আপনাকে বিরক্ত করা। আপনার মত লোক, ঋষি ব'ললেই হয়, তাঁকে বিষয়-কর্ম্ম নিয়ে জ্বালাতন করা পাপ। কিন্তু যোগেশবাবু ব'ললেন যে এ কথাটা না কি আপনাকে না ব'ললে চলে না তাই এলাম। নইলে আমি কখনও আসি—শুধু আপনার কাছে ধর্ম্মের উপদেশ শুনতে ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে?"

কতকটা নরম সুরে ভুবনবাবু ব'ললেন "কিন্তু ব্যাপারটা কি, তাই শুনি? আমার সময় বড় কম, এখনি পূজোয় ব'সতে হবে, চট্-পট্ ব'লে ফেলো।"

হাত কচলাতে কচলাতে হেড মাষ্টার ব'ললেন, "কথাটা

আমাদের রবীনবাবুকে নিয়ে, ওঁকে নিয়ে তো আর কাজ চ'লছে না।"

"কেন? কি হ'য়েছে?"

"আজ্ঞে, একে উনি বি-এ ফেল—"

"বি-এ ফেল তাই কি? সেকালের বি-এ এত সস্তা ছিল না হে বাপু। সে কালের বি-এ ফেল আজ-কালকার গণ্ডা গণ্ডা এম-এ পাশের সমান!"

"আজ্ঞে, তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু, কি জানেন, ওঁর মাথাটা একেবারে খারাপ হ'য়ে গেছে।"

ভুবনবাবু উগ্রস্বরে ব'ললেন, "মাথা খারাপ হ'য়েছে—বটে; খেলে দেখ তো একবাজী দাবা ওর সঙ্গে—টেরটি পাবে কেমন মাথা খারাপ।"

হেড মাষ্টার দিশেহারা হ'য়ে যোগেশের দিকে চাইলেন। যোগেশ তাঁর কাছে ব'লেছিল যে, ভুবনবাবু এইমাত্র ব'লছিলেন যে রবীনের মাথা বিগড়ে গেছে। তাতেই খুব ভরসা ক'রে তিনি এই কথাটা ব'লেছিলেন। এ কথার এই উত্তর শুনে তিনি আর হালে পানি পেলেন না। তাঁর আশা হ'ল যে, যোগেশ কিছু ব'লবে হয়তো।

যোগেশও ব'ললে, "দাবা উনি যতই ভাল খেলুন বাবা, মাথার ওঁর ঠিক নেই।"

ভুবনবাবু খুব চটে ব'ললেন, "দেখ আর যে-ই বলুক, তুমি ওকথা বলো কি ব'লে? ওই রবীন মাষ্টারের কাছে পড়েছ তো তুমি? গুরু, হাজার খারাপ হোন, শিষ্যের মুখে তার নিন্দা—এত বড় পাপ আর নেই। পাগল বলো তুমি তোমার গুরুকে!—আমার ছেলে হ'য়ে কালে কালে ধর্ম্ম দেখছি রসাতলে চ'ললো।"

যোগেশ মুখ লাল ক'রে ব'সে রইলো চুপ ক'রে। বাপের সঙ্গে মুখে মুখে তর্ক ক'রবার ছেলে সে নয়।

হেড মাষ্টারবাবু তারপর এক নতুন চাল চাল্‌লেন। তিনি ব'ললেন, "কিন্তু-দেখুন, রবীন মাষ্টার যদি বেশী দিন ইস্কুলে থাকেন তবে যাও বা ধর্ম্ম আছে আজকাল, তাও লোপ পাবে। ধর্ম্মকর্ম্মের ছিঁটে-ফোঁটাও নেই ওঁর, ঠাকুর দেবতাকে কোনও দিন প্রণাম করেন না। এতেই তো ছেলেদের পক্ষে একটা কুদৃষ্টান্ত হয়। তার পর উনি ছেলেদের শেখান সব এমন কথা, যা শুনলে আপনি কাণে হাত দেবেন। হিষ্টরী পড়ান উনি, উনি ছেলেদের শিখিয়েছেন যে, আমরা না কি সব অনার্য্য! বলেন, সেকালে অনার্য্যেরা ছিল খুব সভ্য আর আর্য্যেরা ছিল অসভ্য! আরও শিখিয়েছেন তাদের যে, ঠাকুর দেবতার পূজা—এ সব বেদে নেই! এমন সব ভয়ানক কথা যদি ছেলেরা বিশ্বাস ক'রতে আরম্ভ করে, তবে তাদের মধ্যে কি আর ধর্ম্ম-টর্ম্ম থাকবে?"

"বটে?"—ব'লে ভুবনবাবু চুপ ক'রে থাকলেন কিছুক্ষণ, তারপর ব'ললেন, "তা তোমরা ক'রতে চাও কি?"

হেড মাষ্টার ব'ললেন, "আমি তো চাই নে কিছু ক'রতে কিন্তু আমার ভয় হয় যে, ইন্‌স্পেক্টারবাবু এলে তিনি হয়তো ইউনিভারসিটি থেকে ইস্কুলের নাম কাটিয়ে দেবেন। তাই ভাবছিলাম যে, সামনের বছর থেকে ওঁকে বিদায় ক'রে দিলে হয়।"

ভুবনবাবু গর্জ্জে উঠলেন, "কি? তারই ইস্কুল থেকে বিদেয় করবে তাকে? তুমি কে হে? কে তোমায় জানতো? পেতে কোথায় এ ইস্কুল যদি রবীন মাষ্টার না থাকতো? দেখ হে, মাথার উপর এখনও ধর্ম্ম আছেন। এত অধর্ম্ম সইবে না। ওসব হবে টবে না।"

হতাশ হ'য়ে হেড মাষ্টার যখন উঠলেন, তখন ভুবনবাবু আবার তাঁকে ব'ললেন, "আর শোন। আমি এখন তোমাদের কমিটির কেউ নই—কাজেই আমার কথা তোমাদের শোনবার দরকার হয় তো নেই। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি—রবীন মাষ্টার যতক্ষণ মরে না যাচ্ছে, কি নিজের ইচ্ছেয় চাকরী ছেড়ে না দিচ্ছে, ততক্ষণ যদি সে ও ইস্কুলে না থাকে, তবে, কর গে তোমরা যেখানে পার ইস্কুল, আমার ও জমীবাড়ী আমি দেব না।"

একথা তিনি ব'লতে পারতেন, কেন না 'স্কুল কোড' তখনও হয় নি, আর জমী-বাড়ী কোনও লেখাপড়া ক'রেও তিনি দেন নি। আর সেই জন্যেই হেড মাষ্টারের ভুবনবাবুর কাছে দরবারের এত গরজ!

দরবারে কিছু ফল হ'ল না দেখে হেডমাষ্টার তো বিষণ্ণমনে চ'লে গেলেন। কিন্তু সন্ধ্যেবেলায় ভুবনবাবু রবীন মাষ্টারকে ডেকে পাঠালেন।

ভুবনবাবু ব'ললেন, "হ্যাঁ হে মাষ্টার, তুমি না কি ঠাকুর দেবতা মান না?"

রবীন হো হো ক'রে হেসে উঠলে, ব'ললে, "এক দেবতা মানি সে পেট, এর চেয়ে বড দেবতা নেই। এই পেট মানুষকে কিসের থেকে কি ক'রেছে? পেটের ক্ষিদের জন্যে বনের বাঁদর হ'য়েছে আজ প্রায় জ্যান্ত দেবতা। আর এই পেট দেবতাই সৃষ্টি ক'রেছেন সব ঠাকুর দেবতা—কেন না তা নইলে বামুনের দেবতা ভরে না।" বলেই সে আবার বেজায় হাসতে লাগলো।

কাণে হাত দিয়ে ভুবনবাবু ব'ললেন, "রাম, রাম, এ সব কথা শুনলেও পাপ।"

"তবে কেন শোনেন? হুকটা নামিয়ে আনি?"

ভুবনবাবু মানা ক'রে ব'ললেন, "না, না, ও আজ থাক। শোন, বয়েস তো গেল মাষ্টার, এখনও যে এমনি ক'রছ, তোমার যে নরকেও স্থান হ'বে না।"

"কেমন ক'রে হবে? কেন না যেটা নেই তাতে স্থানও নেই। আর যদি সত্যিকার নরকের কথা বলেন, সেখানে তো আছিই। দিব্বি স্থান হ'য়েছে আমার এখানে।"

"শোন, ও সব মস্করা রাখ, ভজন পূজন একটু কর।"

"ক'রছিই তো—আমার যিনি দেবতা তাঁর ভজন পূজন সে তো ক'রছিই, নইলে ইস্কুল মাষ্টারী ক'রতে যাবো কেন? আর আপনারাই বা তার চেয়ে বেশি কি বড় ক'রছেন। একটা ঠাকুর খাড়া ক'রে আপনারা ভোগ দিচ্ছেন, শেষে সে তো যাচ্ছে ঐ পেট দেবতার কাছেই—হয় আপনার নয় তো আর কারও।"

"হুঁ।"—ব'লে ভুবনবাবু একটু চুপ ক'রে রইলেন। পরে ব'ললেন "আমরা যে আয্য, এ কথা না কি তুমি মান না।"

হেসে রবীন ব'ললে, "শশকের শিং আছে কি না ব'লতে পারেন? বাঁজা মেয়ের যে ছেলে তা দেখছেন? আর্য্য জাতি সেই শশবিষাণ—সেই বন্ধ্যাপুত্র। আয্য জাতি নেই যে!"

"কি বল তুমি? পাগল হ'লে না কি?"

হো হো ক'রে হেসে মাষ্টার ব'ললে, "ঠিক ধ'রেছেন। বুদ্ধিমানেরা চিরদিনই পাগল। জানেন, নিউটনকে পাগলা গারদে ধ'রে নেবার জন্যে তাঁর পড়শী থানায় খবর দিয়েছিলেন?"

ভুবনবাবু বুঝলেন ছেলে মিথ্যা বলে নি, রবীন মাষ্টারের মাথা খারাপই হ'য়ে গেছে। ভুবনবাবুকে এজন্য দোষ দেওয়া যায় না, কেন না, শুধু তিনি কেন, এ দেশের অনেক বড় বড় পণ্ডিতই

জানেন না যে, রবীন মাষ্টার যা ব'লছিল সেইটাই পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত।

বড দুঃখ হ'ল ভুবনবাবুর। রবীন মাষ্টারকে তিনি ভালবাসতেন। আর, হেড মাষ্টার ও যোগেশকে অতখানি ধমকে দেবার পর শেষ যদি তাঁকেই স্বীকার ক'রতে হয় যে, রবীন পাগল হ'য়ে গেছে তাতে তাঁকে বড খেলো হ'য়ে যেতে হবে। তাই তিনি ভাবলেন, "দেখা যাক একটু বুঝিয়ে।" তাই ভেবে তিনি ব'ললেন, "শোন মাষ্টার, ও সব পাগলামী এখন তাকে তুলে রাখ। নইলে যে দেবতাকে তুমি মান, তাঁর সমূহ বিপদ, পেট চলা কঠিন হবে।"

"কেন ?"

"চাকরী থাকবে না। হেড মাষ্টার আজই এসেছিল আমার কাছে নালিশ ক'রতে—তুমি ঠাকুর দেবতা মান না, ছেলেদের না কি শেখাও যে, আমরা আর্য্য নই—অনার্য্যেরা না কি সভ্য ছিল সেকালে, আর্য্যেরা না কি অসভ্য ছিল, বেদে নাকি ঠাকুর দেবতা নেই—এই সব কথা। সে ব'লেছে, এ সব শেখালে চাকরী রাখা দায় হবে তোমার।"

রবীন মাষ্টার চমকে উঠে ব'ললে, "অ্যাঁ। একথা এতক্ষণ বলেন নি ? তাই তো ! কি ক'রতে হবে বলুন !"

"প্রথমে ঐ ঠাকুর ঘরে গিয়ে গড় হ'য়ে প্রণাম ক'রে আসতে হবে—এখন তারপর রোজ এসে দু'বেলা প্রণাম ক'রে আসবে।"

রবীন মাষ্টার তখনি উঠে গিয়ে ঠাকুর ঘরের সামনে প্রণাম ক'রে এলো। তারপর ব'ললে, "এ নয় হ'ল। কিন্তু ছেলেদের শেখাব কি ? যা বলেন হেড মাষ্টারবাবু তাই শেখাতে রাজি আছি। পৃথিবী চ্যাপ্টা আর সূর্য্য একটা ঠাণ্ডা জিনিষ, এ সবই ব'লতে

রাজী আছি। কিন্তু কেমন ক'রে শেখাই? যে বই তিনি ছেলেদের পড়াতে দিয়েছেন, তাতেই যে ছাই ঐ সব কথা আছে—আছে আমরা অনার্য্য, অনার্য্যেরা ছিল সভ্য—এই সব।"

"তাই না কি? কি বই সে।"

রবীন মাষ্টার বইযেব নাম বললে, আর তারপব নামটা লিখে দিলে একখানা কাগজে।

"আচ্ছা, এখন তুমি যাও"—ব'লে ভুবনবাবু রবীনকে বিদায় ক'রলেন। দোরের কাছে গিযে সে ফিরে এসে ব'ললে, "দেখুন, আজ ঐ যে পিলের কিস্তি দিযেছিলেন তার পরে, ব'ড়েটা না ঠেলে যদি দাবার কিস্তি দিতেন, তবেই মাৎ হ'তেন না আপনি, খেলাটা চ'টে যেতে।"

ভুবনবাবু ব'ললেন, "আচ্ছা যেতো তো যেতো—তুমি এখন বাড়ী যাও। মনে থাকে যেন যে সব কথা ব'লে দিলাম।"

"নিশ্চয়"—ব'লে রবীন মাষ্টার হন্ হন্ ক'বে হেঁটে চ'ললো। অনেকদিন পর্য্যন্ত রবীন মাষ্টারের একথা সত্যি মনে ছিল। ঠাকুর দেবতা দেখলেই সে সবার আগে গিযে গড় হ'য়ে প্রণাম ক'রতো।

ভুবনবাবুর বাড়ীতে থেকে অনেক ছেলে ইস্কুলে প'ড়তো। তাদের একজনের কাছে সেই হিষ্টরী বই বেরুলো। ভুবনবাবু তাকে ডেকে ব'ললেন, "আর্য্য জাতি সম্বন্ধে কোথায কি আছে দাগ দিয়ে দাও তো।" সে দিল।

তারপর যোগেশকে ডেকে ভুবনবাবু ব'ললেন, "এই বইয়ের এই ক'টা জায়গা প'ড়ে মানে কর তো।"

ভুবনবাবু ইংরাজী জানেন না, যোগেশ জানে।

যোগেশ প'ড়ে মানে ক'রে গেল।

ভুবনবাবু ব'ললেন, "তবে? রবীন মাষ্টারের দোষটা কি? হেড মাষ্টার যে বড় গলায় তার নামে ব'লে গেল, এ কী বই সে পাঠ্য ক'রেছে তার গুষ্টির মাথা?"

"তাই তো। তাই তো।"—বলে যোগেশ চ'লে গেল।

তার পর দিন রবীন মাষ্টার ফার্ষ্ট ক্লাশে হিষ্টরী পড়াচ্ছিল। পড়ান হ'চ্ছিল হুমায়ুনের কথা। দোরের কাছ দিয়ে হেড মাষ্টারকে যেতে দেখে রবীন মাষ্টার খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ব'লতে লাগলো, "আর্য্যজাতি জগতের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ জাতি। রাজপুতেরা ছিল আর্য্য, আর আমরা আর্য্য। কিন্তু হুমায়ুন ছিল মোগল—অসভ্য অনার্য্য।"

হেড মাষ্টার শুনতে পেলেন। তিনি বুঝলেন সব, কিছু ব'ললেন না। ব'লবার মুখ ছিল না তাঁর।

কিন্তু আর এক দিয়ে এতে বিপদ ঘটলো। ক্লাশে নতুন একটি মুসলমান ছেলে এসেছিল। একথা শুনে সে ভয়ানক চ'টে গেল। যদিও মোগলের সঙ্গে তার শত পুরুষের কারও সংস্রব ছিল না, তবু হুমায়ুনকে অসভ্য অনার্য্য বলায় তার নিজের ব্যক্তিগত ভাবে ভারি অপমান বোধ হ'ল।

বাড়ী গিয়ে ছেলেটি ইনস্পেক্টর আফিসে পাঠিয়ে দিলে এক বেনামী চিঠি। সেই চিঠি উঠতে উঠতে গেল লাট সাহেবের কাছে আর নামতে নামতে নেমে এলো হেড মাষ্টারের কাছে। হেড মাষ্টার রবীন মাষ্টারের কাছে লিখিত জবাব চাইলেন।

রবীন মাষ্টার ঝেড়ে অস্বীকার ক'রে লিখলে যে, হুমায়ুনের কথা সে মোটেই বলে নি, বলেছিল আটিলার কথা। তবু সে ক্ষমা প্রার্থনাটাও করে রাখলে।

সেদিন ভুবনবাবুর সঙ্গে দাবা খেলতে গিয়ে সে ব'ললে,

"দেখুন বিপদ। আপনাদের আর্য্য ক'রতে গিয়েও যে চাকরী যায় আমার!"

কিন্তু চাকরী গেল না।

৪

সে দিন সকালে রবীন মাষ্টার তার বাইরের ঘরে ব'সে একেবারে নিবিষ্টমনে একখানা বই প'ড়ছিলো। তার বাহ্যজ্ঞান ছিল না, সে যেন একেবারে তারি ভেতর ডুবে গিয়েছিল।

বইখানার একটু ইতিহাস আছে। অনেক দিন থেকে তার মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল মার্কস-এর "ক্যাপিটাল" বইখানা প'ড়বার। ইকনমিক্সের যত বই সে প'ড়েছে, তার অনেক জায়গায় এ বইয়ের উল্লেখ সে দেখেছে, এর কথা যা প'ড়েছে তাতে ভারী কৌতূহল হ'য়েছিল তার বইখানা প'ড়বার।

এবারে ক'লকাতায় গিয়ে হঠাৎ পুরানো একটা বইয়ের দোকানে খুঁজে পেয়েছিল সে এই অমূল্য নিধি। তখন বেশ অন্ধকার হ'য়ে গেছে। রাস্তার ফুটপাথে সে দোকান, তাতে জ্বলছে দু'টো কেরোসিনের ডিবে, যাতে আলো যা হয় তার একশো গুণ হয় ধোঁয়া। বইখানা পেয়েই সে লোভীর মত তাকে গ্রাস ক'রে নিয়ে প'ড়তে লাগলো সেই ডিবের আলোতে।

সেই বিকেল থেকে সে এ দোকানের বই ঘাঁটছে, একখানা কেনে নি। তাই সে যখন তিন পাতা প'ড়ে শেষ ক'রেছে, তখন দোকানদার এসে এক টানে বইখানা কেড়ে নিয়ে গেল।

মুখ কাঁচু-মাচু ক'রে সে জিজ্ঞেস ক'রলে, "দাম কত?" দোকানদার

ব'ললে, "তিন টাকা।" এক ভল্যুম মাত্র "ক্যাপিটাল"—তারই দাম তিন টাকা। রবীন কি আর ব'লবে? লুব্ধ দৃষ্টিতে শুধু চেয়ে রইলো বইখানার দিকে।

রবীনের এক পুরানো ছাত্র, সে এখন ক'লকাতার এক কলেজে প্রফেসার—সে এই দৃশ্য দূর থেকে দেখতে পেয়েছিল। সে তখন গা ঢাকা দিয়ে, রবীন সেখান থেকে চ'লে গেলে, সেই দোকানে গিয়ে বইখানা কিনে নিয়ে গেল। রবীন মাষ্টারকে কিন্তু সে খুঁজে পেলে না।

সেই ছোকরা এখন একটি লোকের হাত দিয়ে তাকে এই বইখানা পাঠিয়ে দিয়েছে!

বইখানা পেয়ে রবীনের এত আনন্দ হ'ল যে, কে যে কেন এ বই পাঠিয়েছে সে সম্বন্ধে কোনও কথা শোনবার তার তর সইল না। সে অমনি ঘরে ঢুকে প'ড়তে লেগে গেল।

"ওগো!" "কোথায় তুমি?" "মর মুখপোড়া—কোথায় গেল?" "ওগো শুনছো"—অন্দর হ'তে তারস্বরে এই সব চীৎকার এসে রবীনের কর্ণপটাহে বৃথাই আঘাত ক'রে ফিরলো, তার সম্বিতে এতটুকুও তাতে ঘা লাগলো না।

রবীন প'ড়ছিল, মার্কস্ যেখানে Value বা জিনিষের দামের বিশ্লেষণ ক'রেছেন। খুব জমাট মার্কসের যুক্তি, একেবারে ঠাস বুনোন —একটা কথা ছেড়ে গেলে পরের কথাটা বোঝা যায় না। মার্কস্ Value-র বিশ্লেষণ ক'রে দাঁড় করিয়েছেন শেষে এই যে, জিনিষের আসল দামের মান হ'ল Labour time বা সেই জিনিষটা তৈরী ক'রতে যতখানি সময় লাগে তাই। এমনি কথা রবীন অন্য জায়গায় প'ড়েছিল, বুঝতে পারে নি ভাল। এখন মার্কসের নিজের ব্যাখ্যান প'ড়ে মনে হচ্ছিল যেন জিনিষটা জলের মত সোজা। Value তো

হোল Labour time, কিন্তু কার শ্রমের সময়? একটা লোক এমন সুদক্ষ যে, অন্তে যেখানে দু-ঘণ্টায় একটা জিনিষ তৈরী ক'রে, সে সেখানে আধ ঘণ্টায় সেটা করে। আবার একজনে হয় তো হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে টিনের কৌটো তৈরী ক'রছে, আর একজন একটা ছাঁচে ফেলে ক'রে যাচ্ছে তাই তার সিকি সময়ে। এখানে কার সময়ের মাপে জিনিষের দাম ঠিক হবে? মার্কস্-এর বইয়ে এই প্রশ্ন প'ড়ে রবীনের মনে হ'ল, ঠিক তো! এই কথাই সে ভাবছিল এর উত্তর কি, সেইটা জানবার ব্যগ্র উৎকণ্ঠায় সে প'ড়তে লাগলো। এমন সময়—

"বলি, তুমি কি মানুষ না জানোয়ার? কাণের মাথা কি খেয়ে ব'সে আছ না কি? চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ফেটে গেল, বাবু ম'শায় ব'সে ক্যাতাব প'ড়ছেন। বলি, এত যে ক্যাতাব প'ড়লে কোন্ স্বর্গের দুয়োর খুলে গেল শুনি? মাইনে তো পাও তবু ঐ চল্লিশ টাকা। আর এই হেড্ মাষ্টার—দেড়শো টাকা মাইনে পায়, তার বাড়ীতে গিয়ে দেখ ক'খান কেতাব আছে? আমি দেখে এযেছি গুণে—পাঁচখানা। আর সে বই কি সে পড়ে? রাম বল! হেড্ মাষ্টার-গিন্নীকে জিজ্ঞেস ক'রতে সে তো হেসেই খুন। বলে, এতগুলো পাশ দিয়ে এসেছে আবার পড়বে কি?—আর তুমি প'ড়েই যাচ্ছ, প'ড়েই যাচ্ছ—মুরোদ তো তবু ঐ চল্লিশ টাকা।—এখন একটু দয়া ক'রে উঠবে কি? এত বড় সংসারটা সামলাব, না তোমার ছেলে সামলাব? আর তো কোনও কাজে লাগো না, একটু ধ'রলেও তো একটা কাজ হয়!"

নিস্তারিণী ঘরে ঢুকে এমনি লম্বা বক্তৃতা ক'রতে ক'রতে রবীন মাষ্টারের কোলের উপর,—মার্কসের "ক্যাপিটাল" খানার উপরে বসিয়ে দিলে তার সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্রকে। বইখানা যায় দেখে মহা ব্যস্ত

হ'য়ে রবীন মাষ্টার ছেলেটাকে ঠেলে ফেলে বইয়ের পাতা পাট ক'রে বইখানা বন্ধ ক'রলে। ছেলেটা কেঁদে উঠলো।

কাণ্ড দেখে নিস্তারিণীর রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠলো। নিস্তারিণী উঠানে ডালের বড়ি দিচ্ছিল। ছেলেটা গিয়ে তার সেই ভয়ানক শ্রমসাধ্য কাজে বিঘ্ন উপস্থিত করায় সে তার নিষ্কর্ম্মা স্বামীটিকে ছেলেটি নিয়ে একটু উপকার করবার জন্য ডাকাডাকি ক'রছিল। সাড়া না পেয়ে বাঁ হাত দিয়ে ছেলেটার হাত ধ'রে তাকে ঝুলোতে ঝুলোতে ঝেড়ে ফেললে গিয়ে রবীন মাষ্টারের কোলে। ডাল বাটা মাখা ডান হাত সে আগাগোড়া উঁচু ক'রেই ছিল।

অন্য দিন রবীন মাষ্টার এমন অবস্থায় ত্রস্তে ব্যস্তে উঠে যায় পত্নীর হুকুম তামিল ক'রতে, আর ছেলে কোলে ক'রে অত্যন্ত নিরীহভাবে তাকে আদর ক'রতে থাকে। আজ—একে তো সে শুনতেই পেলো না, তারপর ছেলেকে তার কোলে দিতে কি না সে ঠেলে ফেললে ছেলেকে ঐ ঘোড়ার ডিম বই-খানার জন্যে! এও কি সয় রক্ত মাংসের শরীরে? নিস্তারিণীর শরীরে যেহেতু রক্ত ছিল প্রচুর এবং মাংস ইদানীং বেড়ে চ'লেছিল, তাই সে ক্ষেপে উঠলো। অবিশ্যি সে যে নিজে ছেলেটার এক হাত ধ'রে ঝুলিয়ে প্রায় পোয়াটাক রাস্তা নিয়ে এসেছে—সেটার ভিতর যে কোনও দরদের অভাব আছে, তা তার মনে হ'ল না। একদণ্ড অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে সো শুধু কট-মট ক'রে চেয়ে রইলো স্বামীর দিকে। তারপর ব'ললে "ও কি হ'ল? ছেলেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে! খুব তো! ইস্ মস্ত বড় লাট হ'য়েছেন! রাগ দেখাচ্ছেন! বলি, এত রাগটা কিসের শুনি?—র'সো, তোমার ঐ বই আমি আজ হেঁসেলের উনোনে না ফেলে দিয়েছি তো আমার নাম নয়!"—

ব'লে ছোঁ মেরে ডাল-বাটা মাথা হাতে সে তুলে নিয়ে গেল রবীনের এত সাধের সেই বই—আর দম্ দম্ ক'রে পা ফেলে চ'লে গেল ভিতর বাড়ীর দিকে।

"আহা-হা-হা—কি কর? কি কর? আমার নয় ও বই—শোন—থাম—ও গো—"

ছোট ছেলেটাকে কোলে তুলে রবীন পিছু পিছু ছুটলো অনুনয় বিনয় ক'রতে ক'রতে।

অনেক সাধা-সাধনায় স্বধু এইটুকু হ'ল যে আসন্ন অগ্নি-সৎকার থেকে বইখানা রক্ষা পেল কিন্তু রবীন তা ফেরৎ পেলো না। কোথায় যে তাকে লুকিয়ে রাখলে নিস্তারিণী, তা কেউ জানতে পেলো না।

ইস্কুলের বেলা হ'যে গেছে, আর ব'সে থাকা চলে না,—এই বইয়ের হাঙ্গামা নিয়ে এত দেরী হ'যে গেছে যে, যাবার সময় মেলাই দায়। স্নান আর হ'ল না। ছেলে কোলে করেই হেঁসেলে গিয়ে রবীন ডাকলে, "মাতঙ্গী, ভাত হ'য়েছে কি?"

অন্য ঘর থেকে মাতঙ্গী বেরিয়ে ব'ললে, "আমি ধান সেদ্ধ ক'রছি দাদা, রাঁধছেন বউ ঠাকরুণ।"

রবীন আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না ক'রে তাড়াতাড়ি মাতঙ্গীর কোলে ছেলেটি গছিয়ে দিয়ে কাঁধে চাদর ফেলে দে ছুট।

নিস্তারিণী নির্ব্বিকার হ'যে উঠোনে ব'সে ডালের বড়িই দিতে লাগলো।

বাড়ীর উঠোন পার হ'তেই রবীনের মনে উঠলো সেই সমস্যা যার সম্বন্ধে মার্কসের জবাবটা প'ড়বার স্থযোগ তার হ'ল না। Labour time—কার labour এর time? ধর, তার ইস্কুলের ছেলেরা আছে।

উপেন, সে দশ মিনিটে যে প্রশ্নের উত্তর করে, নবীনের সে প্রশ্নের উত্তর দিতে আধ ঘণ্টা লাগে। দু'টোর কি মূল্য এক? উত্তর দু'টো যদি ঠিক এক দরের হয় তবে তারা দু'জনেই নম্বর পাবে সমান—ধর নয়, কিন্তু নবীন যে আধ ঘণ্টা ধ'রে সেই প্রশ্নের উত্তর ক'রলো, সেই আধ ঘণ্টায় উপেন আর দু'টো তেমনি প্রশ্নের উত্তর ক'রে ফেলেছে। তার দরুণ সে পেলো আরও ৯+৯=১৮। সুতরাং একই সময় খেটে নবীন পেলো নয়, আর উপেন পেলো সাতাশ। তবে Labour time থেকে value হ'ল কেমন ক'রে?

আবার আর এক দিক দিয়ে দেখ, উপেনও দশ মিনিটে একটা প্রশ্নের উত্তর ক'রলে আর যোগেশও সেই সময়েই ক'রলে। যোগেশের উত্তরটা হ'ল অসম্পূর্ণ, কাঁচা লেখা, উপেনের হ'ল সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উত্তর। এখানে উপেন আর যোগেশ তো সমান নম্বর পেতে পারে না।

তার পাশ দিয়ে সেকেণ্ড মাষ্টার—সে রবীনের চেয়ে অনেক ছোট—হন হন ক'রে হেঁটে চ'লে গেল। রবীন ভাবলে, ওই সেকেণ্ড মাষ্টার পাঁচ মিনিটে এই পথ চলাটুকু সারলে, আমার লাগবে দশ মিনিট। ও যে পাঁচ মিনিট আগে গেল সেটা কি বাজে খরচ?

তারপর মনে হ'ল পাঁচ মিনিটেই যাও, দশ মিনিটেই যাও—কাজটা হ'ল সমান, অর্থাৎ এইটুকু পথ চলা। দামটা সেই কাজের—সময়ের নয়? অর্থাৎ কাজের একটা মান আছে যেটা সময় ও ব্যক্তি নিরপেক্ষ। সেটা কি? মার্কস্ বলেন, আর কিছুই নেই—আছে শুধু সময়ের তফাৎ। ভারী গোল লাগলো তার। মার্কস্ এ সম্বন্ধে কি সমাধান ক'রেছেন জানবার জন্যে মনটা ছট্ ফট্ ক'রতে লাগলো।

Surplus value-র একটা আবছায়ার মত ধারণাতার মনে উঁকি-ঝুঁকি মারতে লাগলো।

ভাবতে ভাবতে রবীন মাষ্টার ইস্কুলে এলো। থার্ড ক্লাসে গিয়ে ব'সে সে ভাবতে লাগলো। কাজ মাপা যায় কি দিয়ে?

উপেন ব'ললে, "স্যার, আজ আকবর পড়াবেন।"

রবীন যেন ঘুম থেকে উঠে ব'ললে, "হাঁ—আচ্ছা। আকবর হুমায়ুনের ছেলে। তার জন্ম হ'য়েছিল কখন জান? শের শা হুমায়ুনকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন জান তো?"—ব'লেই থেমে গিয়ে রবীন মাষ্টার ব'ললেন, "উঁহু, আজ আমি ব'লবো না। এই প্যারাগ্রাফে আকবরের জন্ম-বৃত্তান্ত আছে। তোমরা সবাই বেশ ভাল ক'রে পড়। বেশ ক'রে প'ড়ে লেখো—আমি দেখবো। হাঁ, শোন। যখন যার পড়া শেষ হবে, অমনি হাত তুলবে, আর লিখতে আরম্ভ ক'রবে, বুঝলে?—এই গোপাল, তোর ঘড়িটা আমার কাছে রেখে দিয়ে যা।"

গোপাল যোগেশের ছেলে, তার হাতে হাত-ঘড়ি ছিল, সে সেটা খুলে মাষ্টারের ডেস্কের উপর রেখে দিলে। রবীন মাষ্টার ঘড়ি ধ'রে ব'সে রইলো। যে যখন হাত তুললে, অমনি তার নামের পাশে সময়টা লিখে রাখলে। তারপর যে যখন লেখা শেষ ক'রলে, তার সময়টাও নোট ক'রে রাখলে। এমনি ক'রে সব কাগজগুলো নিয়ে সময় অনুসারে সেগুলোতে দু'তিন রকম নম্বর দিয়ে গেল। তারপর সে লেখাগুলো যত্ন ক'রে বাড়ী নিয়ে গেল দেখবে ব'লে। যাবার সময় ভুল ক'রে গোপালের ঘড়িটা পকেটে ক'রে নিয়ে গেল।

ঘড়িটার কথা গোপালেরও মনে ছিল না। সে যখন বাড়ী গেল তখন যোগেশ হঠাৎ লক্ষ্য ক'রলে যে গোপালের হাতে ঘড়ি নেই। গোপালকে জিজ্ঞেস ক'রতে তারও মুখ শুকিয়ে গেল।

যোগেশ এ নিয়ে মহা হৈ চৈ লাগিয়ে দিলে। রাত্তির শুদ্ধ লোক জেগে গেল ঘড়ির খোঁজ ক'রতে। তখন একটা ছেলে ব'ললে যে, গোপাল ঘড়ি দিয়েছিল রবীন মাষ্টারকে। গোপালেরও সে কথা তখন মনে হ'ল। যোগেশ তখন ধেয়ে গেল রবীন মাষ্টারের বাড়ী।

রবীন মাষ্টার ইস্কুল থেকে বাড়ী ফিরেই ব'সে গিয়েছিল আজকের এক্সারসাইজের খাতাগুলো নিয়ে। ভয়ানক জটিল তার বোধ হ'ল সমস্তটা। সোজাসুজি সময় হিসেব ক'রে, নম্বর দিয়ে দে'খা গেল যে, সব চেয়ে গাধা যে ছেলে সেই পেলে সব চেয়ে বেশী নম্বর। বুঝলে যে, মালের দামের বেলাও যদি সুধু খাটুনীর সময় বুঝে জিনিষের দাম ধরা যায়, তবে সব চেয়ে যে কুঁড়ে এবং অকর্ম্মণ্য তার মালের দাম বেশী হবে। স্থির ক'রলে মার্কসের এমন অর্থ হ'তেই পারে না। তারপর সে ঠিক ক'রলে সব চেয়ে অল্প সময়ে যে ছেলেটা ক'রেছে তার সময়টাই হ'ল মান। কিন্তু তা'হলে বাকী ছেলেদের কি হবে? তাদের কাজের সুধু ওই labour time দিয়ে ওজন ক'রতে গিয়ে তার মনে লেগে গেল মহা খট্‌কা। কিছুই ভেবে সে ঠিক ক'রতে পারলে না—সন্ধ্যে হ'য়ে গেল।

সন্ধ্যে বেলায় আজ দাবা খেলার নিমন্ত্রণ ছিল। নিস্তারিণীর কাছে অভ্যাসমত এক মাত্রা গাল খেয়ে সে চ'ললো জমীদার বাড়ী।—বাড়ী থেকে বেরুবার আগেই সেখানে এসে প'ড়লো লণ্ঠন হাতে জমীদার বাড়ীর খানসামা।

খানসামাকে দেখে রবীন মাষ্টার ব'ললে, "চল বাবা যাচ্ছি—বড্ড দেরী হয়ে গেছে—চল—"

পেছনে দেখতে পেলে এসেছে যোগেশ ও আর চার পাঁচজন লোক।

রবীন ব্যস্ত হ'য়ে গেল। তার বাহির বাড়ীর ঘরে লোককে

ব'সতে দেবার জায়গা নেই। তিনঠেঙ্গো এক সাবেক কালের চেয়ার ছিল, সেটা সম্পূর্ণ অব্যবহার্য্য হ'যে গেছে। আর সে ঘরের তক্তপোষের উপর, আর চার ধার দিয়ে তক্তা বিছিয়ে তার উপর ছড়ান আছে কেবলই গাদা গাদা বই—রবীন মাষ্টারের বিশ বছরের সঞ্চয়! বই হয় তো সেগুলোকে বলা যায় না, কেন না তার অনেকগুলোরই বাঁধাই ছিঁড়ে গেছে, তাদের পাতাগুলো কোনও মতে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হ'য়েছে। এর ভিতর লোক ব'সবার জায়গা নেই।

ওরই মধ্যে যোগেশকে একটুকু জাযগা ক'রে দেবার জন্য রবীন ব্যস্ত হ'যে ছুটলো, কিন্তু যোগেশ বেশ পরুষ কণ্ঠে ব'ললে, "বসতে আসি নি মাষ্টার মশায়, জিজ্ঞেস ক'রতে এয়েছি গোপ্‌লার ঘড়ি কোথায়?"

বিন্দু-বিসর্গও রবীনের মনে ছিল না। সে আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'ললে, "ঘড়ি? সে কি?"

"সে কি? জানেন না? নেবার বেলায় তো দিব্বি নিয়েছিলেন খুলে।"

রবীন শুব্ধ বিস্ময়ে হাঁ করে চেযে রইলো। গোপাল পিছু পিছু এসেছিল, সে বললে, "হ্যাঁ স্যার, সেই এক্‌সারসাইজ নেবার সময় আপনি নিয়েছিলেন আমার কাছ থেকে।"

এতক্ষণে মনে হ'ল। সে ব'ললে, "ও হো! তাই তো! তারপর? তারপর নিস নি তুই? এই ম'রেছে—গ্যাছে বুঝি সে ঘড়ি। চল একবার ইস্কুলে যাই, খুঁজে দেখি গে।"

রবীনের গায়ে পরা ছিল আজ একটা সেকেল পিরাণ। বড় গরম বোধ হওয়ার রবীন সেটা খুলতে গেল। অমনি টুপ ক'রে জামার বুক পকেট থেকে গড়িয়ে তার সামনে প'ড়লো সেই ঘড়ি।

যোগেশ ও গোপাল এক সঙ্গে ব'লে উঠলো, "ওই তো!" রবীন মাষ্টার আশ্চর্য্য হ'যে ব'ললে, "তাই তো—আমার পকেটে ওটা এলো কি ক'রে?"

ভ্রূকুটি ক'রে যোগেশ ব'ললে, "যেমন ক'রে আর দশ জনের এসে থাকে।"

ঘড়িটা তুলে নিযে যোগেশ দেখলে, বন্ধ হয়ে গেছে আছাড় খেযে।

তারপর সে যা গালি-গালাজটা ক'রলে রবীন মাষ্টারকে, সে আর ব'লবার মত নয।

রবীন মাষ্টার স্তব্ধ পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িযে রইলো।

যোগেশের কণ্ঠ যখন খুব চ'ড়ে উঠলো তখন হট্টগোল শুনে নিস্তারিণী আড়াল থেকে একবার উঁকি মেরে দেখলে। তারপর ক্রমে সে বেরিযে এলো।

যোগেশকে সে জিজ্ঞেস ক'রলে, "কি হ'য়েছে বাবা?"

যোগেশ খুব চড়া সুরে ব'ললে, "হ'যেছে? হবে আবার কি? হ'যেছে চুরী। আপনার স্বামী আমার ছেলের ঘড়ি চুরি ক'রেছেন!"

নিস্তারিণী ব'ললে, "ছি যোগেশ, তোমার মুখে একথা? উনি যে কত যত্ন ক'রে তোমায় লেখা-পড়া শিখিযেছেন বাবা!"

"শিখিযেছেন তো মাথা কিনেছেন! তাই ব'লে চোরকে চোর ব'লবো না?"

নিস্তারিণী এবার তেতে উঠে ব'ললে, "না, ব'লবে না। ব'লতে হয় বল গে তোমার বাড়ীতে, এখানে নয। বাড়ীতে ব'সে তুমি তোমার বাপকে চোর ব'ললেও তোমাকে আমি ব'লতে যাব না। কিন্তু আমার বাড়ী ব'সে আমার সোয়ামীকে যা' তা'ব' লে যাবে—এত বড় বাপের বেটা তুমি নও! বেরোও শীগ্‌গির বাড়ী থেকে।"

যোগেশ পাল্টা জবাব দিল। কিন্তু সে কোত্থেকে পারবে নিস্তারিণীর সঙ্গে ?

রণে ভঙ্গ দিয়ে সে পালাল।

নিস্তারিণীর একটা মস্ত জোর ছিল—যোগেশের বাপের জমীতে তার বাড়ী নয়। বাড়ী আর জমী যা আছে সে তাদের লাখেরাজ।

যোগেশ চ'লে গেলে নিস্তারিণী ঘরে চ'লে গেল।

অনেকক্ষণ তারপর রবীন মাষ্টার তেমনি স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

এইটুকু তার বাকী ছিল। পঞ্চাশ বছরের জীবনে পাগল, বেকুব, অকর্ম্মণ্য, মূর্খ, অনেক কিছু লোকে তাকে ব'লেছে, কেউ কোনও দিন বলে নি যে, সে অসৎ। এ ঘা'টা যেন রবীন কিছুতেই সইতে পারলে না। বিশেষ যোগেশের কাছ থেকে—যে যোগেশকে এই সে দিন রবীন মাষ্টার এত আদর-যত্ন ক'রে লেখাপড় শিখিয়েছে।

সহিষ্ণুতার তার সীমা ছিল না—কিন্তু এবার যেন সীমায় এসে ঠেকেছে মনে হ'ল।

রবীন মাষ্টার গোঁজ হ'য়ে বসে ভাবতে লাগলো। সমস্ত জীবনটা উল্টো-পাল্টা ক'রে সে ভাবলে, এতটা ব্যর্থ, এত পরিপূর্ণরূপে অসার্থক মনে হ'ল তার জীবন যে, সে সত্যি সত্যি ভাবতে লাগলো—একে আর টেনে ব'য়ে লাভ কি ? জীবনে তার যত ব্যর্থ বঞ্চিত আশা, যত দুঃখ যত লাঞ্ছনা সব পুঞ্জীভূত হ'য়ে তার মনের একেবারে কেন্দ্র থেকে যেন তাকে তিল তিল ক'রে পোড়াতে লাগলো।

অতীতের রিক্ততা ও ভবিষ্যতের শূন্যতা নিয়ে তার দৈন্যভরা জীবন যেন অট্টহাসিতে তাকে উপহাস ক'রে গেল। কোনও কিছুতেই আর তার আসক্তি রইলো না, কিছুতেই তার মন ব'সতে চাইলো না।

মনে হ'ল তার যে, এই শেষ অপমানের পর তাব আর বেঁচে থাকবার কোনও মানে নাই।

তার বার বছরের ছেলে শৈল পা টিপে টিপে সেই অন্ধকার ঘরের ভিতর এলো। চুপি চুপি বাপের কাছে গিয়ে তার হাতে একখানা বই দিয়ে ব'ললে, "মাকে লুকিয়ে নিয়ে এয়েছি বাবা!"

বইখানা রবীন হাতে নিল সম্পূর্ণ নিরুৎসাহের সহিত, কিন্তু হাতে বইটা ঠেকতেই সে চমকে উঠলো। তাড়াতাড়ি দেশলাই জ্বেলে পিদিমটা ধরিয়ে নিয়ে সে দেখলে—সেই "ক্যাপিটাল"।

শৈলকে ব'ললে, "কোথায় পেলি?"

শৈল ব'ললে, "মা এটা মাচার উপর চালের ভেতর লুকিয়ে রেখেছিল, পিসিমা চাল নিতে গিয়ে পেয়ে আমায় দিলে।"

হারানিধি পেয়ে রবীন ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে খুললে সেই পাতাটা যেখানে তার পড়া হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। যে সমস্যাটা সে সারাদিন ধ'রে মনের ভিতর আলোড়ন ক'রছিল—সেইটার সমাধান জানবার জন্য একেবারে বইয়ের ভিতর চোখ বসিয়ে সে প'ড়তে লাগলো।

অনেকটা পড়া হ'য়ে গেল। ফিরে আবার সমস্তটা প'ড়লে। তারপর মনের ভিতর কথাটা নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রতে লাগলো।

মার্কস যে জবাব দিয়েছেন তাতে তার মনের খট্‌কা মিটলো না। আজ সমস্ত দিন ধ'রে নিজের মনে নাড়াচাড়া করে সে এই প্রশ্নের ভিতর এত সব সমস্যা আবিষ্কার ক'রেছিল যে, সে দেখতে পেলে—তার অর্দ্ধেক কথার কোনও উত্তরই দেন নি মার্কস্। কিছুতেই সে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলো না এ সন্দেহ যে, জিনিষের দামের ভিতর তা তৈরী ক'রবার সময় ছাড়া আরও কিছু—একটা এমন কিছু সূত্র আছে যাতে time ছাড়া quality-রও হিসেব ক'রতে হয়।

শ্রমের ভিতর তারতম্য সুধু সময়ের নয়। জাতিগত, গুণগত তারতম্যও একটা আছে। কিন্তু ঠিক কি সে জিনিষ যাতে এই প্রভেদ আসে, সেটা সে কিছুতেই স্থির ক'রতে পারলে না। ভাবতে লাগলো সে এই সমস্যা নিয়ে এমন নিবিষ্ট মনে যে, সম্প্রতি যে সব লাঞ্ছনা হ'য়ে গেছে তার কথা তার মনে এলো না একবারও।

ভাবতে ভাবতে সে বেরিয়ে প'ড়লো। পূর্ণিমার রাত, ফুটফুটে জ্যোছ্না। তার ভিতর সে বেড়াতে বেড়াতে চ'ললো জমীদার-বাড়ীতেই। আজ যে এমন কিছু ঘ'টেছে যাতে ক'রে তার সেখানে যাবার পক্ষে কোনও বাধা হ'তে পারে, সে কথা তার একবারও মনে হ'ল না।

সে সটান চ'লে গেল ভুবনবাবুর ঘরে। তখন যোগেশের বৈঠকখানায় ইস্কুল-কমিটির মেম্বাররা মিলে রবীন মাষ্টারের কথাই আলোচনা ক'রছিল।

তা সে লক্ষ্যও ক'রলো না।

ভুবনবাবু চিৎ হ'য়ে শুয়েছিলেন।

রবীন মাষ্টার ছক নামিয়ে সাজিয়ে ব'সলো। ভুবনবাবু অবাক্ হ'য়ে গেলেন।

আজ যে কাণ্ডটা হ'য়ে গেছে তা যোগেশ এসে ভুবনবাবুকে ব'লে গিয়েছিল। সে কথা শুনে তাঁর বড় দুঃখ হ'য়েছিল এই ভেবে যে, রবীন মাষ্টারের মাথা নিশ্চয় খারাপ হ'য়ে গেছে। তা নইলে সে ক'রবে চুরী—এ সম্ভবই নয়। সামান্য পঁচিশ টাকা দামের একটা ঘড়ি! এমন দিন গেছে যে, ইচ্ছে ক'রলে রবীন পাঁচ সাত শো টাকা বেমালুম সরাতে পারতো!

ছকটা সাজান দেখে তিনি উঠে ব'সলেন। খেলা চ'ললো।

রবীন মাষ্টার কিন্তু আজ খেলায় জুত ক'রতে পারলে না কিছুতেই —কেন না তার মাথায় ঘুরে ফিরে সেই Theory of Value বার বার এসে প'ড়ছিল। খেলায় অখণ্ড মনোযোগ সে দিতে পারছিল না কিছুতেই। ভুবনবাবু ভাবলেন, আজকের কাণ্ডটায় তার মন খারাপ আছে, তাই তার খেলা জমছে না। দু'দান খেলে তিনি খেলা ছেড়ে দিয়ে ব'ললেন, "রবীন মাষ্টার, আমিও বুড়ো হয়েছি, তোমারই বা বয়স এমন কি কম? চল দু'জনে কাশীবাস করি গে।"

রবীন ব'ললে, "কাশীর জল বায়ু শুনেছি ভাল। কিন্তু বাস যদি কোথাও ক'রতে হয়, সে জায়গা ক'লকাতা। ওঃ, সেখানে যে ক'দিন থাকি কি সুখেই কাটে সারাদিন!"

"এত ভাল লাগে যদি ক'লকাতা, তবে কোনও দিন সেখানে চাকরীর চেষ্টা ক'রলে না কেন? চেষ্টা ক'রলে কি আর পেতে না?"

"আরে ধেৎ, ক'লকাতার কি আমার মত লোকের চাকরী হয়? ক'লকাতার ইস্কুলে যারা মাষ্টার তারা নিশ্চয় দিগ্‌গজ পণ্ডিত সব। কত বই তারা প'ড়তে পায়! আমার মত বিদ্যে নিয়ে পাড়াগাঁয়ের ইস্কুলে মাষ্টারী করা চলে ক'লকাতায়? ওরে বাপ রে! সেখানে গলিতে গলিতে আমার মত বি-এ ফেল লোক গড়াগড়ি যাচ্ছে!"

ক'লকাতা সম্বন্ধে রবীনের এমনি একটা অদ্ভুত আদর্শবাদ ছিল, কেন না ক'লকাতা ব'লতে সে বুঝতো 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী,' 'এসিয়াটিক সোসাইটি', আর পুরোনো বইয়ের দোকান। তা ছাড়া ক'লকাতার সঙ্গে ব'লতে গেলে তার পরিচয় মোটেই ছিল না। আর নিজের মূল্যটা রবীন মাষ্টার মোটেই জানতো না। তার ওই

যে বি-এ ফেলের ছাপ, সেইটে যেন চিরজন্মের মত তার মনটাকে পঙ্গু ক'রে দিয়েছিল। এত প'ড়ে শুনেও সে যে সেই বি-এ ফেল ছাড়া আর কিছু হ'য়েছে, একথা তার মনে ওঠে নি একদিনও। প'ড়ে প'ড়ে তার জ্ঞান বুদ্ধি কেবল বেড়েই গেছে স্তূপীকৃত হ'য়ে তার মনের ভিতর। সে বিদ্যা-বুদ্ধির ওজন ক'রে নিজের পরিমাপ ক'রবার কথা তার মনেই ওঠে নি কোনও দিন।

ভুবনবাবু ব'ললেন, "না হে না, তুমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখ না। আমি বরং রাধানাথবাবুকে একখানা চিঠি লিখে দেব—তিনি চেষ্টা ক'রলে পারবেন একটা ব্যবস্থা ক'রতে নিশ্চয়।"

রাধানাথবাবু এক সময়ে এ অঞ্চলের স্কুলের ডেপুটী ইনস্পেক্টার ছিলেন, এখন তিনি ক'লকাতায় থাকেন। ভুবনবাবু জানেন তাঁকে একটা মস্ত কেষ্ট বিষ্টু লোক ব'লে।

এ কথায় রবীন মাষ্টার মহা উৎসাহিত হ'য়ে উঠলো। ভাবলে সে—"ওঃ! ক'লকাতার ইস্কুলে চাকরী ক'রতে পেলে, তাকে পায় কে?"—সেই স্বপ্ন দেখতে দেখতে মহা উল্লাসের সঙ্গে নাচতে নাচতে রবীন মাষ্টার বাড়ী ফিরে গেল।

সতীশ চৌধুরী তখন বাড়ী ফিরছিলেন। হেড মাষ্টারের প্রচুর উৎসাহ এবং যোগেশের তীব্র বক্তৃতা সত্ত্বেও সতীশ চৌধুরী কিছুতেই বিশ্বাস ক'রতে পারলেন না যে, রবীন মাষ্টার চুরী করেছে। তিনি ব'ললেন, "নিশ্চয় কোনও দুষ্ট ছেলে ঘড়িটা রবীন মাষ্টারের পকেটে ফেলে দিয়েছে। ও যে ভাল-ভোলা, সেটা খুবই সম্ভব।"

সতীশ চৌধুরী বিগড়ে দাঁড়ালেন, ভুবনবাবু তো বিগড়েই আছেন। তাই হেড মাষ্টার রবীন মাষ্টারকে তাড়াবার বিষয়ে নিরুৎসাহ হ'যে প'ড়লেন। আজকের মত সভা ভঙ্গ হ'ল।

সতীশ চৌধুরী ফিরবার পথে রবীন মাষ্টারকে ধ'রে জিজ্ঞেস ক'রলেন, "হাঁ হে রবীন মাষ্টার, ব্যাপারটা কি বল তো?"

রবীন ব'ললে, "বিশেষ কিছু না, ভাবছিলাম ক'লকাতা গেলে কেমন হয়!"

"আরে না, সে কথা নয়। ওই ঘড়ির ব্যাপারটা—"

রবীন ব'ললে, "কিছু বুঝতে পারছি না। ব্যাপারটা হ'ল কি, আজ সকালে Marx-এর 'Capital' ব'লে একখানা বই আছে, তাই প'ড়ছিলাম। সে বই-খানায় মার্কস্ ব'লছেন, জিনিষের আসল দাম যেটা সেটা হ'ল তার তৈরী ক'রতে যতটা সময় লাগে তাই।—সময় সুধু—বুঝলেন কি না। অর্থাৎ তাঁর মতে কাজের time quantity ছাড়া অন্য কোনও factor নেই যার দ্বারা value নিয়মিত হয়। কথাটায় আমার বড় ধোঁকা লেগে গেল—আমি ভাবলাম কি—"

এমনি ক'রে মার্কসের মূল্যবাদের বিস্তীর্ণ আলোচনা এবং তার সম্বন্ধে তার যা কিছু সংশয় সব ব্যাখ্যা ক'রে গেল। সতীশবাবুকে কথাটা বোঝাবার জন্য তাকে এতটা বিস্তৃতভাবে আলোচনা ক'রতে হ'ল যে, তার ভিতর ঘড়ির কথাটা একদম চাপা প'ড়ে গেল।

সতীশবাবু শুনতে শুনতে ব'ললেন, "এমন উদ্ভট কথাও লোকে ভাবতে পারে? পাঁচ ঘণ্টা খেটে স্যাকরা গড়লে একটা সোনার গয়না, আর সেই পাঁচ ঘণ্টা খেটে কামার গ'ড়লে গোটা কয়েক কাস্তে—তাই সেই গয়নাটার দাম হবে কাস্তের সমান।"

"আজ্ঞে না, কথটা অত উদ্ভট মোটেই নয়। আর এর পক্ষে যুক্তি অনেক আছে।"—ব'লে রবীন মাষ্টার মার্কসের সব গুলি যুক্তি খুব জোর ক'রে আর খুব বিশদভাবে ব'লে গেল—ঘড়ির কথা কারও মনেই রইলো না।

অনেকক্ষণ পরে যখন রবীন মাষ্টার তার বাড়ীর দিকে পথ ধ'রবে, তখন সতীশবাবু ব'ললেন, "আচ্ছা, সে কথা পরে শুনবো, কিন্তু ঐ ঘড়ির ব্যাপারটা ?"

"ও! সে কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। ক্লাশে পড়াতে গিযে ছেলেদের এক্সারসাইজ দিযে মার্কসের থিওরীটা একবার পরীক্ষা ক'রবার কথা মনে হ'ল। তাই ক'রলাম। দেখলাম তার ফল হ'ল অদ্ভুত!" —ব'লে সে সেই অদ্ভুত ফল সম্বন্ধে বেশ বিস্তীর্ণ আলোচনা সুরু ক'রলে।

সতীশবাবু ব'ললেন, "কিন্তু ঘড়িটা ?"

"ও। ঠিক। সবার টাইমটা দেখবার জন্যে ঘড়িটা চেয়ে নিযেছিলাম। নিয়ে নোট ক'রলাম সবার নামে, কে কতক্ষণে প'ড়ে শেষ ক'রলে, কতক্ষণে কে লিখলে? সেই টাইম অনুসারে নম্বর দিয়ে দেখলাম—"

"কিন্তু তারপর ফেরত দাও নি ঘড়িটা ?"

"ঠিক মনে নেই। তখনি ক্লাশে নম্বর দিয়েই আমার ফলগুলো অদ্ভুত ঠেকলো। ভাবতে ভাবতে সারাদিন পর যখন বাড়ী গেলাম তখন ওই কাগজগুলো প'ড়ে দেখি, যা ভেবেছিলাম তাই—"

সতীশবাবু ব'ললেন, "আচ্ছা, আজ যাই, আর একদিন শুনবো।"

রবীন মাষ্টার তারপর বাড়ী গেল। বাড়ীর পথে চ'লতে চ'লতে সতীশবাবু ভাবতে লাগলেন, "বেচারা! একেবারে ক্ষেপেই উঠবে এবার।"

৫

ক'লকাতায় দরখাস্তও গেল, রাধানাথবাবুর কাছে চিঠিও গেল কিন্তু কাজের কোনও সুবিধা হ'ল না। তার কারণ এ নয় যে, ক'লকাতার অলিতে-গলিতে দিগ্‌গজ পণ্ডিত গড়াগড়ি যাচ্ছে কিম্বা রবীন মাষ্টারের চেয়ে যোগ্য লোক ইস্কুলে ইস্কুলে ঠাসাঠাসি হ'য়ে র'য়েছে। কারণ এই যে, রবীন মাষ্টারের সাধ্য ও সাধনার সঙ্গে কোনও যোগই ছিল না কোনও দিন।

সাধনার সঙ্গে সাধ্যের যোগ কতক ঘটে বরাতে—আর কতকটা হয় চেষ্টায়। একটা সাধারণ কুসংস্কার আছে যে, শক্তি ও যোগ্যতা সংগ্রহ ক'রলে কপাল খুলে যায়ই—আর কাজ পাবার যে চেষ্টা তার প্রধান অংশ হচ্ছে সেই কাজের যোগ্যতা অর্জ্জন। সেটা যে কত বড় অসত্য তা চারদিকে চোখ মেলে চাইলেই দেখা যায়। কাজ পেতে হ'লে বরাত ছাড়া যা দরকার সেটা যোগ্যতা নয়, জোগাড়! সে বিদ্যা রবীন শেখে নি কোনও দিন। তা ছাড়া আর একটা জিনিষ দরকার হ'চ্ছে নিজের বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে প্রকাণ্ড একটা ধারণা নিজের মনে থাকা এবং পরকে জানান। মাত্রাধিক্যে একে সবাই বলে 'হাম্বাগ'। কিন্তু এই 'হাম্বাগ'ই ঠিক তালমান ঠিক রেখে চালাতে পারলে পঙ্গুর পক্ষে গিরি লঙ্ঘনের জন্য ভগবানকে ডাকবার দরকার হয় না।

রবীনের এই অত্যাবশ্যক গুণটি মোটে নেই। যদি থাকতো তবে সেই 'ভুবনমোহন হাই স্কুলে'ই দিব্বি মোড়লি ক'রে চালাতে পারতো। বরং তার মনের ভাবটা ছিল ঠিক উল্টো—যাকে বলে inferiority

complex—নিজেকে সে ভারী ছোট ক'রে দেখতো। যে কেউ তার কাছে আসে তাকেই সে ভাবে তার নিজের চেয়ে মস্ত বড়—তাই একেবারে নিতান্ত সঙ্কুচিত হ'য়ে সে আপনাকে কোনও মতে লুকিয়ে ফেলবার চেষ্টা করে। তার বিশ্বাস যে, দু' দু'বার বি-এ ফেল করবার পর তার কোথাও চাকরিই হ'তো না, যদি ভাগ্যে সে ভুবনবাবুর দয়ায় ঐ ইস্কুলটা ক'রে ফেলতে না পারতো। ঐ ইস্কুলের চাকরি ছাড়া জগতে আর কোনও চাকরি তাকে কেউ দেবেই না। এই ভেবেই সে হাজার অপমান সয়েও ঐ চাকরিই আঁকড়ে ধ'রে প'ড়ে ছিল—কেন না সে ভাবতো ঐ চাকরি গেলেই তার মরণ!

তাই যখন রাধানাথবাবু কোনও অনুসন্ধানের চেষ্টা না ক'রেই ভুবনবাবুকে জবাব দিলেন যে, ক'লকাতায় চাকরির বাজার ভারী চড়া এবং সেখানে রবীন মাষ্টারের চাকরি মেলা দুর্ঘট, তখন আশাভঙ্গ হ'লেও সে মোটেই বিস্মিত হ'ল না। বরং সে ভুবনবাবুকে ব'ললে, "দেখলেন? ক'লকাতায় চাকরি, সে কি সহজ কথা? সেখানে এম্-এ পাশ না হ'লে কেউ পোঁছেই না। আমাকে কি দেখে চাকরি দেবে তারা?"

ভুবনবাবু লেখাপড়া বিশেষ কিছুই জানতেন না, বাইরের খবরও বেশী রাখতেন না। তিনি ভাবলেন, হবেও বা।

ঘড়ি চুরির ব্যাপারটা চাপাই প'ড়ে গেল। তা নিয়ে বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করা সুবিধা হবে না ভেবে যোগেশ ও হেড মাষ্টার দু'জনেই চেপে গেলেন।

রবীন মাষ্টার প্রবল বেগে 'ক্যাপিটাল' প'ড়তে লাগলো।

Marx-এর Surplus Value-র বিবরণ তার ভারী মনে ধ'রলো। কিন্তু সেই যে গোড়ায় গলদ, Value-র সম্বন্ধে মত, সে সম্বন্ধে তার

পটকা মিটলো না। অথচ Value সম্বন্ধে মতটাই যদি না টেঁকে তবে Surplus Value টেঁকান দায়।

মনে মনে সে স্থির ক'রলে যে, এবারে ক'লকাতায় গিয়ে সেখানকার লোকের কাছে জিজ্ঞেস ক'রে সে বেশ ভাল ক'রে জিনিষটা বুঝে আসবে।

কিন্তু গ্রীষ্মের ছুটিতে তার কল'কাতা যাওয়া হ'ল না। সে ছুটিতে সে যা' ক'রলে তাতে সবাই বুঝলো যে, এবার সে একেবারে ক্ষেপে গেছে। তার হিতাকাঙ্ক্ষীরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে ছোট্ট একটা।

আইডিয়াগুলো এখন তার মাথার ভিতরই টগবগ ক'রে ফুটতো—সে তাদেরকে বের হ'তে দেয় নি অনেক দিন। যখনি সে চেষ্টা ক'রেছে কোনও আইডিয়া নিয়ে কোনও কাজ ক'রতে, দু'দিনে হোক চার দিনে হোক তাকে তাড়া খেয়ে ফিরতে হ'য়েছে। তাই কোনও কিছু ভেবে-চিন্তে কর্ত্তব্য ব'লে স্থির জানলেও সত্যি সত্যি সেই কাজে নেমে যাবার কথা ভাবতেও এখন তার ভয় হ'ত।

কিন্তু মার্কসের 'ক্যাপিটাল' আর তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 'কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো' প'ড়তে প'ড়তে আর তাই নিয়ে ভাবতে ভাবতে সমাজের গঠন-প্রণালী, অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে এত সব কল্পনা তার মাথায় ফুটতে লাগলো, এত সব সংস্কারের খেয়াল তার হ'তে লাগলো যে, শেষ পর্য্যন্ত সে তার নিষ্কর্ম্ম চিন্তা-বিলাসে আটকে থাকতে পারলো না কিছুতেই।

সে ভাবলো যে, আমাদের ধন-সৃষ্টির প্রণালী—Productive system অত্যন্ত সেকেলে এবং অত্যন্ত অকেজো। আমাদের যে জমী আছে তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার ক'রলে আর তার উৎপন্ন ফসলটা ঠিক নীতিসঙ্গত উপায়ে বিনিয়োগ ক'রলে কোনও দুঃখই থাকে না দেশের লোকের। ব'সে ব'সে সে হিসাব ক'রতে লাগলো। মাঠে মাঠে ঘুরে তার গ্রামের

সমস্ত জমীর একটা ফিরিস্তি ক'রে ফেললে, কোথায় কত ফসল জন্মায়, তার দাম কত, সব হিসেব ক'রে ফেললে। গ্রামে কতগুলি লোক আছে, কে কি কাজ ক'রতে পারে, সব হিসাব হ'য়ে গেল। তার পর সে ব'সে ব'সে স্কীম ক'রতে লাগলো এই—জমীগুলো অন্যভাবে গুছিয়ে খরচ ক'রলে এ থেকে কি পাওয়া যেতে পারে।

কৃষিবিভাগ থেকে অনেক বই আর কাগজ আসে ভুবনবাবুর বাড়ীতে। সেগুলো সব জমাই থাকে। রবীন মাষ্টার একদিন কাউকে না ব'লে সেগুলো সব নিয়ে এলো। সবগুলো প'ড়ে শুনে সে তার হিসাব সম্পূর্ণ ক'রলে। সে হিসাবে সে দেখতে পেলে যে, গ্রামের সবগুলি লোক বেশ সুনিয়ন্তভাবে যদি খাটে আর গ্রামের জমী যদি বেশ সুশৃঙ্খল-ভাবে আবাদ করা যায়, তবে কোনও কলকারখানা না এনেও গ্রামের সম্পদ চারগুণ বাড়িয়ে ফেলা যেতে পারে।

তাদের গ্রামে বোনে সবাই শুধু ধান আর পাট। পাটের দাম যখন বেশী ছিল তখন লোকের তাতে বেশ চলতো। এখন চলে না। ধান যা জন্মায়, একটু ভাল ক'রে চাষ ক'রলে এর মাত্র তিন পোয়া জমী আবাদ ক'রলে সে ধান অনায়াসে পাওয়া যেতে পারে। ধানের আর পাটের জমী কমিয়ে সে বাড়্তি জমীতে কোথায় কোন্ ফসল হ'তে পারে তার একটা প্রায় সম্পূর্ণ ছক ক'রে ফেললে।

তার পর হিসাব হ'ল যে, গৃহস্থেরা যদি 'কো-অপারেটিভ সোসাইটি' গঠন করে—তার মেম্বাররা সবাই যদি ভাল ভাল গরু কেনে, তবে সোসাইটি সেই দুধ কিনে ঘি মাখন ছানা ক'রে ক'লকাতা বা অন্য দেশে পাঠালে অনেক টাকা হ'তে পারে। এই গরুকে খাওয়াবার জন্যে fodder crop জন্মাতে কত জমী লাগবে তার হিসাব হ'ল।

সে এক বিস্তারিত স্কীম ত'য়ের হ'ল। যতই সে তাই নিয়ে ভাবে ততই তার প্রাণ উৎসাহে ভ'রে ওঠে। এ না হ'য়ে যায় না। একবার যদি গাঁয়ের সবাই মিলে লেগে যায় এই প্রণালীতে কাজ ক'রতে, আর দেখাদেখি যদি আশে পাশে এ গ্রামের দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে যায়, সবার ঘরে সম্পদের ছড়াছড়ি লেগে যাবে।

এমন একটা স্কীম সে সুধু মাথার ভিতর আটকে রাখতে পারলে না। তার হাতপায় ভয়ানক সুড়সুড়ী লেগে গেল। শেষে সে লেগে গেল কাজে।

প্রথমে সে গেল ভুবনবাবুর কাছে। তার সেই মোটা কাগজের বস্তা নিয়ে ভুবনবাবুকে সে বোঝাবার চেষ্টা ক'রলে। ভুবনবাবু দুই-চার মিনিট তার দুই-একটা কথার অনেক রকম আপত্তি উত্থাপন ক'রলেন, তার পর হাই তুলতে লাগলেন আর সতৃষ্ণ নয়নে দাবার ছকের দিকে চাইতে লাগলেন।

যোগেশকে বোঝাতে গিয়ে রবীন মাষ্টার দেখলে আরও বিপদ। যোগেশ শুনলো অল্পই—সুধু মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো। তার যত সব পারিষদ তারা রবীন মাষ্টারের এই বস্তা নিয়ে এমন সব মস্করা আরম্ভ ক'রে দিলে যেন রবীন মাষ্টারের এত সাধের স্কীম সুধু পাগলের প্রলাপ!

তার বস্তা গুটিয়ে রবীন মাষ্টার গেল সতীশ চৌধুরীর কাছে। সতীশ চৌধুরী কিছুক্ষণ বেশ মনোযোগ দেখিয়ে শুনলেন। রবীন মাষ্টার উৎসাহিত হ'য়ে কাগজের পর কাগজ, চার্টের পর চার্ট, হিসাবের পর হিসাব খুলে দেখাতে লাগলো। সতীশবাবু কোনও তর্ক ক'রলেন না এবং যদিও দেখালেন যে, কতই শুনছেন, শুনলেন না কিছুই। সমস্তক্ষণ তিনি ভাবতে লাগলেন, "লোকটা একেবারে ক্ষেপেই গেল দেখছি।"

আদার বেপারীর জাহাজের খবর নিতে মানা আছে। রবীন মাষ্টার—আদাও বেচে না যে, সে হিসেব ক'রছে ব'সে ব'সে জাহাজে ক'রে ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, আমেরিকা—মায় চিলি পর্য্যন্ত কত পাটের রপ্তানি হয়! পাগল না হ'লে এমন উদ্ভট খেয়াল হয় কারও?

ঘণ্টা দুই পর সতীশবাবু ব'ললেন, "হাঁ হাঁ, সব ঠিক মাষ্টার, বেশ হবে সব। কিন্তু শোন, আমি ব'লছিলাম কি, তোমার শরীরটা বড় ভাল দেখাচ্ছে না। এবার গরমের ছুটিতে যাও না কোথাও বেড়িয়ে এসো গে। রাঁচী যায়গাটা বেশ ভাল। সেখানে আমার এক বন্ধু আছেন, বল তো আমি তোমার থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দি।"

ফল কথা সতীশবাবু বুঝেছিলেন এই যে, এই স্কীম রবীনের নিছক পাগলামীর নিদর্শন। একেবারে ক্ষেপে গেছে সে এবার। এ সময় ব'লে ক'য়ে ওকে একবার রাঁচী পাঠাতে পারলে বেশ হয়।

এদের কারও কাছে কোনও সাড়া না পেয়ে রবীন মাষ্টার ভাবলে যে, একবার চাষীদের ভিতর গিয়ে তাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা ক'রলে হয়। গেল সে মণ্ডলদের বাড়ী বাড়ী—লম্বা লম্বা বক্তৃতা ক'রে তাদের বোঝাতে লাগলো।

ফলে তার মাসখানেক চেষ্টার ফল এই হ'ল যে, দু'পাঁচ মাইল দূর পর্য্যন্ত সবাই জেনে গেল আর বলাবলি ক'রতে লাগলো যে, রবীন মাষ্টার একদম ক্ষেপে গেছে। সে এক বস্তা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় আর ভাবে যে, সে সেই বস্তার জোরে রাতারাতি লাখপতি হবে। পাগলা মাষ্টার বলে তার খ্যাতি অনেক দিনই ছিল কিন্তু সবাই জানতো যে পুরো পাগল নয়, যাকে বলে আধ্‌পাগলা। এখন সবাই জানে যে, সে সত্যই পাগল!

ইস্কুলের একদল ছেলে একদিন মাঠে ব'সে তার কথাই আলোচনা ক'রছিল। সবাই ব'ললে রবীন মাষ্টার যে পাগল হ'য়ে গেল, কোন্‌দিন কি ক'রে ব'সবে ছেলেদের তার ঠিকানা কি ?

একটা ছেলে ব'ললে, "কিন্তু ভাই, এত যে পাগল হ'য়েছে তবু পড়ায় কিন্তু চমৎকার। বই না খুলে যা ক্লাসে ব'লে দেয়—তা আর ভোলা যায় না।"

আর একজন ব'ললে, "সে দিকে ঠিক আছে পাগল। ইস্কুলের কাজে একচুল এদিক ওদিক নেই। কিন্তু একবার ওর ওই স্কীমের কথা উঠলে হয়! সে যা ব'কতে থাকবে তার আর থামা নেই। সেদিন সেকেণ্ড মাষ্টার, ভাই, তুলেছিলেন কথা, অমনি সে চীৎকার ক'রতে সুরু ক'রে দিলে ঝাড়া একঘণ্টা। মাষ্টাররা সবাই হাসতে লাগলো।"

দূরে বস্তা হাতে রবীন মাষ্টারকে দেখা গেল। তিনি আসছিলেন অছিম মোড়লের বাড়ী থেকে।

একটা ছেলে ব'ললে, "ওই আসছে।"

আর একজন ব'ললে, "র'স ওকে নিয়ে একটু রগড় করা যা'ক।"

যারা পাগল, তাদের নিয়ে 'রগড় করা' আমরা বুদ্ধিমান লোকেরা একটা সম্পূর্ণ-নির্দ্দোষ খেলা ব'লে মনে ক'রে থাকি। পাগল যে, সে যে এতবড় একটা নির্ম্মম আঘাত পেয়েছে অদৃষ্টের কাছে যাতে সে মানুষ হয়েও মানুষ নয়, সে কথা শিশুরা জানে না, যুবকেরা ভাবে না, আর বর্ষীয়ানদের মধ্যে অন্ততঃ বারো আনা লোক ভুলে যায়। যেখানে অদৃষ্টের নির্ম্মম আঘাতে সে বেচারা জর্জ্জরিত, সেখানে তাকে ক্ষেপিয়ে তার দুর্দ্দশা বাড়ানটা বেশীর ভাগ লোকে দোষ মনে করে না। যুবকেরা সাধারণতঃ মনে করে তাকে একটা নিছক আমোদ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে যখন রবীন মাষ্টার পাগল সাব্যস্ত হ'য়ে গেছে তখন

এই ছোকরার দল ভাবলে যে তাকে নিয়ে রগড় করাটা তাদের ন্যায্য খেলা।

তাই রবীন মাষ্টার যখন কাছে এলো তখন ছেলেরা তাকে ঘিরে ধ'রলে।

একটা সবচেয়ে বাঁদর ছেলে ব'ললে, "স্যর, আমরা আপনার স্কীম শুনবো।"

ছেলেদের এই কথায় রবীন মাষ্টার ভারি উৎসাহিত হ'য়ে ব'ললেন, "শুনবে? ভারী খুসী হ'লাম শুনে। তোমরাই তো ক'রবে এসব দু'দিন বাদে—তোমাদের শোনা চাই, আচ্ছা ব'স।"—ব'লে তার বস্তাটা পাশে রেখে রবীন মাষ্টার তাদেরকে বোঝাতে আরম্ভ ক'রলে।

প্রথমে সে বোঝালে সম্পদ (wealth) কাকে বলে। তারপর ব'ললে, জিনিষের মূল্য হয় কিসে আর বাড়ে কিসে। ব'ললে, "ধর পাট। আমরা যদি পাট নিয়ে এই গাঁয়েই ব'সে থাকি বাইরে না যেতে দি—কি তার দাম হবে? বড় জোর আট আনা মণ। এখানকার পাট যেখানে তার দরকার সেখানে গেলে তার দাম বেড়ে যায়। এই যে বাড়ে, তার কতকটা তার real value—কেন না, স্থানান্তর করার দরুণ তার উপর আর খানিকটা শ্রম খরচ করা হয়—আর কতকটা তার Value in Exchange." তারপর সে বোঝাতে লাগলো value বা দরের মানে কি?

ইতিমধ্যে ছেলেরা তার পাশ থেকে বস্তাটা সরিয়ে নিয়ে অনেক দূর চালান ক'রে দিয়েছে। তাই যখন রবীন মাষ্টার একটা কথা ব'লে ব'ললে, "কথাটা তোমরা বেশ বুঝতে পারবে একটা চার্ট দেখলে।" তখন সে সেই চার্ট বের করবার জন্য বস্তা খুঁজতে গিয়ে দেখলে নেই।

পোঁটলা না দেখে রবীন মাষ্টার অস্থির হ'য়ে গেল। তার এতদিন-

কার এত পরিশ্রমের ফল ওর ভিতর। যে প্রণালীতে কাজ ক'রে চার-পাচ বছরের ভিতর তার গ্রামের চেহারা ফিরে যাবে—সে সব ওর ভিতর! ওটা হারালে ওই জিনিষ ফিরে তৈরী ক'রতে লাগবে তার আর এক বচ্ছর!

চমকে উঠে পাগলের মত সে চার দিকে খুঁজতে লাগল। মনভোলা মানুষ, সে ঠিক মনে ক'রতে পারলে না যে, অছিম মোড়লের বাড়ী থেকে বস্তাটা নিয়ে এসেছে কি না? মনে তো হ'ল এনেছে—কিন্তু—যাক একবার দেখেই আসা যাক! সে ছুটলো অছিমের বাড়ীর দিকে। এই ফাঁকে একটা ছেলে তার কাঁধের উপর থেকে চাদরটা সরিয়ে নিলে। ভয়ানক ব্যস্ত হ'য়ে ছিল রবীন মাষ্টার, খেয়াল হ'ল না কিচ্ছুই।

ছেলেরা মুখ চেপে চেপে হাসছে—তাদের দম ফাটে আর কি?

অছিম মোড়লের বাড়ীর দিকে খানিক দূর যাবার পর একটা ছেলের তার উপর মায়া হ'ল। সে ব'ললে, "ছি, বুড়ো মানুষকে নাহক দৌড় করান কেন? দিয়ে দাও ওটা!"

যার হেপাজতে সে বস্তাটা ছিল সে ব'ললে, "দাঁড়া না, আর একটু রগড় দেখ্।"

কিন্তু প্রথম ছেলেটা চ'টে গেল—ক্রমে বেশ রাগারাগি হ'তে লাগলো। শেষ পর্য্যন্ত সেই ছেলেটা সে বস্তাটা ও চাদর বের ক'রে কেড়ে নিয়ে ছুটে ব'ললে, "স্যর, স্যর, এই যে পাওয়া গেছে।"

হারানিধি পেয়ে রবীন মাষ্টার এতটা উল্লসিত হ'য়ে গেল যে, তা কোথায় ছিল, কেমন ক'রে পাওয়া গেল এই সমস্ত অবান্তর বিষয়ের আলোচনাকে সে মোটে আমল দিলে না। লোভীর মত ছুটে এসে বস্তাটা নিয়ে চাদর কাঁধে ফেলে সে সোজা ছুটলো বাড়ীর দিকে।

একটা ছেলে ব'ললে, "স্যর স্কীমটা—"

রবীন মাষ্টার ব'ললে, "আজ থাক বাবা, আর একদিন বোঝাব।"

অছিম মণ্ডল যদিও জানতো যে, রবীন মাষ্টার পাগল হ'যে গেছে ও তার স্কীমটা একটা পাগলামীর খেয়াল, সে তবু শুনেছিল রবীন মাষ্টারের সব কথা।

বোঝে নি সে কিছুই, কেন না, রবীন মাষ্টার যত সোজা ক'রেই কথাটা ব'লতে চেষ্টা করুক, জিনিষটা জটিল। তার উপর সে সেই স্কীম বোঝাতে গিয়ে Value, Value in Use, Value in Exchange প্রভৃতি অনেক তথ্য বোঝাবার চেষ্টা ক'রেছিল, তাতে সব আরও গুলিযে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মোদ্দা কথাটা অছিম বুঝলে যে, সবার জমী এক লপ্ত ক'রে তার পর ভাগ ক'রে নিয়ে আবাদ ক'রতে হ'বে নানা রকম ফসল—এবং তাই ক'রলেই ফসলের দাম চারগুণ হ'য়ে যাবে। একথাটা তার কাছে হাস্যাস্পদ মনে হ'ল—সে বুঝলে তাহা পাগলের প্রলাপ!

কিন্তু তবু সে এ সম্বন্ধে অনেক আপত্তি তুললে যা' যে কোনও চাষী তার সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-বুদ্ধি থেকে তুলতে পারে। সে সব আপত্তি খণ্ডন করবার জন্য রবীন মাষ্টার অঙ্ক ক'সে তাকে বোঝাতে লাগলো—বলা বাহুল্য, অছিম কিছুই বুঝলে না।

তার পর অছিম মোড়ল ব'ললে, "আচ্ছা বাবু সব না হয় হ'ল। আমরা সব জমী এক ক'রে নিলাম—কিন্তু জমীদার যখন গলাটিপে ধ'রবে আমার, ব'লবে তার সীমানা গোলমাল ক'রেছি—কিম্বা চাইবে আমার জমীর খাজনা আমারই কাছে—তখন? আর তা ছাড়া, আমরা খেটে খুটে জমীর ফসল বাড়াব, তখন জমীদার খাজনা বৃদ্ধি চাইবে—তার কি?"

রবীন মাষ্টার ব'ললে, "সে জন্যে ভাবনা নেই। আমি সে সব ঠিক

ক'রে দেবো। ভুবনবাবুকে ব'ললেই তিনি ঠিক ক'রবেন।। তা ছাড়া, আমি যা' ব'লছি এ তো স্বধু প্রথম কাজটা। এর পর, তোমরা জমীদারের স্বত্ব তো কিনে নেবে, তোমরাই হবে মালিক।" —ব'লে সে তার স্কীমের এই অংশটা বোঝেতে লাগলো।

অছিম মোড়ল হেসে ব'ললে, "তা বেশ, জমীদারকে আপনি ঠিক করুন আগে, তার পর আমরা শুনবো আপনার কথা।"

রবীন মাষ্টার এ কথায় উৎসাহিত হ'য়ে উঠলো। এ পর্যান্ত তার সঙ্গে এতখানি আলোচনা কেউ করে নি, কেউ এইটুকু উৎসাহও তাকে দেয় নি। তাই রবীন মাষ্টার অছিম মণ্ডলের কথাগুলো মনে মনে নাড়া চাড়া ক'রতে ক'রতে আনন্দে উৎফুল্ল হ'যে উঠছিল।

ছেলেদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বাড়ী ফিরে সে ভাবতে লাগলো, কি রকম ব্যবস্থা ক'রলে জমীদারকে খুসী ক'রে মালিকী স্বত্ব ছেড়ে দিতে রাজী করা যায়। নানা রকম অঙ্ক ক'সে সে বের ক'রলে একটা পথ যাতে তার মনে হ'ল যে, জমীদার সেই সর্ত্তে যদি মালিকী স্বত্বটা প্রজাসমবায়ের হাতে ছেড়ে দেয় তবে জমীদারের লোকসান তো নেই-ই বরং লাভই হয়।

আর সে স্থির হ'য়ে থাকতে পারলে না। অমনি আবার তল্পী বগলে ক'রে সে ছুটলো ভুবনবাবুর কাছে।

ভুবনবাবুর কাছে গিয়ে ব'সেই সে ব'ললে, "এইবারে সব ঠিক হ'য়ে গেছে।"

ভুবনবাবু অবাক্ হ'যে ব'ললেন, "কি ঠিক হ'য়ে গেছে?"

"অছিম মণ্ডল ব'লেছে সে প্রজাদের সব ঠিক ক'রে দেবে আপনি রাজী হ'লেই হয়। আর এতে আপনার গররাজী হবার কোনও কারণ নেই, কারণ আপনার লাভ যথেষ্ট।"

রবীন মাষ্টারের স্বভাব এই যে, একটা কথা যখন সে নিজের মনে ভাবতে আরম্ভ করে তখন সে কারও সঙ্গে সে সম্বন্ধে কথা কইতে গেলে ধ'রে নেয় যে, যাকে সে ব'লছে, তার যেন সবটাই জানা আছে ; নিজের মনের ভিতর তার যে সব কথা হ'য়ে গেছে সে সবই যেন তার শ্রোতাকে বলা হ'য়ে গেছে। তাই সে সাধারণতঃ কথাটা এমন ভাবে আরম্ভ করে যা তার শ্রোতা বুঝতেই পারে না। বিশেষ ক'রে তার এই স্কীম সম্বন্ধে সে এত লোকের সঙ্গে এত আলোচনা ক'রেছে যে, সে সহজেই ধ'রে নেয় যে তার স্কীমের সবগুলি অন্ধি সন্ধি তার শ্রোতার স্বধু জানা নয়, মুখস্থ আছে। কিন্তু সবাই তার কাছে সে স্কীমের কথা শোনেও নি, যে শুনেছে সেও তার কথাগুলো সর্ব্বদা মাথায় ব'য়ে বেড়ায় না। তাই অনেক সময়ই তার কথাগুলো হয় একেবারে সম্পূর্ণ অবোধ্য। লোকে তাতে আশ্চর্য্য হয় না জিজ্ঞাসাও করে না কিছু তাকে, কেন না তারা জানে এ সবই পাগলের প্রলাপ!

ভুবনবাবু ব'ললেন, "রাজী হব, কিসে?"

বেশ প্রশান্তভাবে রবীন ব'ললে, "আপনার মালিকী স্বত্বটা ছেড়ে দিতে! ওটা রেখে তো আর দরকার নেই আপনার—যে কালে—"

আর বলা হ'ল না। ভুবনবাবু অবাক্ হ'য়ে ব'ললেন, "বটে, তুমি এই কথা নিয়ে প্রজাদের সঙ্গে ঘোঁট পাকাচ্ছ। তা' হ'লে তোমার এসব পাগলামী নয়, পেটে পেটে শয়তানি! খবরদার বলছি, ফের যদি তুমি একথা নিয়ে কথা কও তবে তোমারই একদিন কি আমারই একদিন।"

রবীন মাষ্টার একটু ভয় খেলো কিন্তু তবু সে ব'ললে, "আপনি বুঝতে পারছেন না, আমি তো অনিষ্ট ক'রছি না আপনার কিছু;

মালিকীটাকে স্থধু ছেড়ে দেবেন। মালিকানা পাবেন, আবার তার উপর ডিভিডেণ্ড পাবেন। বুঝতে পারছেন না। এই দেখুন এই হিসেবটা দেখলেই—"

"আর হিসেব দেখাতে হবে না বাপু। তোমার কাছে বুদ্ধি ধার ক'রে আমার জমীদারী ক'রতে হবে, এমন দুর্দ্দশা হয়নি আমার। ব'লে রাখছি মাষ্টার, সাবধান! ফের যদি তুমি তোমার ঐ বস্তা নিয়ে টুঁ শব্দটি ক'রবে কিংবা আমার প্রজার বাড়ী যাবে, তোমার ঠ্যাং ভেঙ্গে দেবো ব'লছি। আর তোমার ঐ যে চাকরী—এতদিন টায় টোয় আমি সেটা ঠেকিয়ে রেখেছি, সেটিও থাকবে না। ওসব শয়তানি আমার কাছে চ'লবে না।" বেশ চ'টে কথা ক'টা ব'ল্লেন তিনি।

এইবার রবীন মাষ্টার রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। সে ভাবলে—গেল বুঝি চাকরিটুকু এবার। চক্ষে সে সরষে ফুল দেখতে লাগলো। ভুবনবাবুর পায় জড়িয়ে ধ'রে মাপ চাইলে, ব'ললে, আর কখনও সে ওকার্য্য করবে না।

ভুবনবাবু ব'ললেন, "তবে তোমার ঐ বস্তাটা দাও—আমি ওটাকে রেখে দিচ্ছি।"

বুকটা যেন ফেটে গেল রবীন মাষ্টারের! তার এতদিনকার পরিশ্রমের ফল এমনি ক'রে সঁপে দিতে তার কিছুতেই মন স'রতে চাইলো না। কিন্তু সে নিরুপায়। দিলে সে বস্তাটা। ভুবনবাবু একটা খানসামাকে ডেকে ব'ললেন সেটাকে সিন্দুকে বন্ধ ক'রে রাখতে।

৬

এর পর লোকে দেখলে রবীন মাষ্টারের ক্ষেপামি যেন একদম সেরে গেল। কাগজের বস্তা নিয়ে বাইরে বাইরে সে আর ঘোরে না, কেউ জিজ্ঞেস ক'রলেও সে তার স্কীমের কথা প্রাণ গেলেও কিছু বলে না। সে আবার ঢুকলো গিয়ে তার সেই বইয়ের দুর্গে।

কিন্তু কিছুদিন পরে একদিন হঠাৎ দেখা গেল যে, লাঙল কাঁধে ফেলে গরু ঠেলতে ঠেলতে সে তার দুই ছেলেকে নিয়ে চ'লেছে তার জমীর দিকে। অবাক হ'য়ে সবাই দেখতে লাগলো—ভিড় ক'রে লোকে দেখতে এলো, ঘরে ঘরে র'টে গেল রবীন মাষ্টার আবার ক্ষেপে গেছে !

ব্যাপারটার ইতিহাস এই—

তার স্কীম যদিও ভুবনবাবুর সিন্দুকে বন্ধ রইলো, তবু তার জন্য খেটে খেটে কৃষি সংগঠন ও কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে সে যে-সব তত্ত্ব সংগ্রহ ক'রেছিল, সেগুলো তার মাথার ভিতর কেবলই ঘুরতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে আবার মার্কসের ক্যাপিটাল পড়াও চলতে লাগলো।

ভেবে ভেবে সে স্থির ক'রলে যে, চাষের সুব্যবস্থার দ্বারা জমী থেকে আদায় করা সম্পদ যে বাড়ান যেতে পারে, সেটা হাতেকলমে না দেখাতে পারলে লোকের চোখ ফুটবে না। সমস্ত গ্রামের জমী তার হাতে না এলে, তা ঠিক দেখাবার উপায়ও নেই ; কিন্তু তার নিজের যে বিঘে-ছয়েক জমী, আর বাড়ীর যে দু'বিঘে জমী আছে, সেটার আবাদে একটু বুদ্ধি খরচ ক'রে সে তবু লোককে কতকটা বোঝাতে পারবে।

কৃষি-বিভাগের অনেকগুলো বিজ্ঞাপন তার হাতে ছিল, দু'চারখানা বইও ছিল। সেইগুলো প'ড়ে শুনে সে ছ'কে ফেল্লে তার ছ' বিঘে জমী

আবাদের প্ল্যান। ধান আর পাট হয় তার জমীতে, দো-ফসলা জমী, রবিশস্যও কিছু হয়। পাটের দাম বেজায় ক'মে গেছে। তাই সে ঠিক ক'রলে, পাট সে আবাদ ক'রবেই না। পাটের জায়গায় আবাদ ক'রবে আখ, তার বাড়ীর আমগাছ তলায় আদা ও হলুদের চাষ লাগাবে, খানিকটা জমীতে তামাক, খানিকটাতে আলু দেবে—এমনি ক'রে সব ঠিক ক'রে সে তার বর্গাদারকে ব'ললে, এবার এই সব আবাদ ক'রতে হবে। ফসলের অর্দ্ধেকের মালিক বর্গাদার, সে এই পরীক্ষা করতে নারাজ হ'ল।

তখন রবীন মাষ্টার ঠিক ক'রলে এবার সে বর্গা বিলি ক'রবেই না। গোপনে গোপনে সে হাল-গরু কিনে ফেললে,—একটা পাঞ্জাবী হাল আনালে ঢাকা ফার্ম থেকে। সেখান থেকে নানারকমের বীজও আমদানী হ'ল। তার মনে হ'ল, এই তো ঠিক। সে কেন বর্গাদারকে খাটিয়ে তার জন্মান ফসল নিতে যায়? মার্কসের Surpluse Value-র তত্ত্ব মনে মনে আউড়ে নিলে। যতটুকু জমী তার আছে, তা' সে আর তার দুই ছেলে অনায়াসে চাষ ক'রতে পারে। তা না ক'রে সে কেন মিছে মালদার হ'য়ে বর্গাদারকে শোষণ ক'রতে যাবে?

তার বড় ছেলে ম্যাট্রিক ফেল ক'রেছে। তার পরের ছেলেটা লেখা পড়ায় ভাল। কিন্তু রবীন মাষ্টার ভেবে দেখলে তাতে লাভ কি? লেখা পড়া শিখে পাশ ক'রে ক'রবে তো কেরাণী-গিরি, না হয় কোনও রকম শোষণ বৃত্তি! তার চেয়ে নিজে হাতে চাষ-বাস যদি ক'রতে পারে, তবে ঘরে ব'সে লেখা পড়া শিখে পণ্ডিত হ'তে তাদের ঠেকাবে কে?

ছেলে দু'টোকে ডেকে রবীন মাষ্টার তাদের বোঝালে অনেকক্ষণ। ছেলেরা বাপের খুব বাধ্য, উৎসাহীও, বাপ যা' ব'ললেন, তাতেই তারা রাজী হ'ল।

চৈত্রমাসে খুব এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গেল, চাষীরা সব বেরিয়ে প'ড়লো ক্ষেতে হাল দিতে। ইস্কুল সেদিন ছুটি। রবীন মাষ্টারও হাল-গরু ঠিক ক'রে দুই ছেলে নিয়ে বেরিয়ে প'ড়লো।

নিস্তারিণীর কাছে কথাটা একেবারে গোপন রাখা হ'য়েছিল। হাল-গরু সেও রাখা হ'য়েছিল অন্য একটা গেরস্ত বাড়ীতে। তাই যখন পিতা ও পুত্রদ্বয় বেরিয়ে গেল, নিস্তারিণী তখন খবর পেলে না।

ঘণ্টাখানেক পর পাড়া-পড়শীরা এসে খবর দিয়ে গেল। নিস্তারিণী হন্ত-দন্ত হ'য়ে ছুটলো আধ মাইল দূরে সেই ক্ষেতে। কপালে হাত ঠুকে সে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলো—"হায় রে কপাল—এত দুঃখও লিখেছিলেন ভগবান আমার কপালে!"

রবীন মাষ্টার তখন মনের আনন্দে লাঙ্গল ধ'রে গরু ঠেঙাচ্ছে। তার আশে-পাশে অন্য সব ক্ষেতে চাষারা যার যার জমী চ'ষছে।

পাড়াগাঁয় চিরকাল মানুষ রবীন মাষ্টার। হাল বাওয়া তার অভ্যাস না থাকলেও সে এ বিষয়ে একেবারে আনাড়ী নয়, কাজেই জমীটা চষা হ'চ্ছিল। কিন্তু রবীন চেয়ে দেখলে যে, তার বাঁয়ের জমীতে নকুড় কৈবর্ত্ত, আর ডাইনের জমীতে কাঙ্কি সেখ যত তাড়াতাড়ি হাল চালাচ্ছে, রবীন মাষ্টার বা তার ছেলে তা পারছে না। সে মনোযোগ দিয়ে তাদের হাল চালানোর সঙ্গে নিজের কাজের তুলনা ক'রতে লাগলো। দেখতে দেখতে সে দেখতে পেলে কাঙ্কি সেখ, নকুড়ের চেয়েও তাড়াতাড়ি কাজ ক'রছে। যখন কাঙ্কির আধবিঘে চষা হ'য়ে গেছে, নকুড় ততক্ষণে চ'ষেছে সিকিবিঘের কিছু বেশী, আর রবীন মাষ্টার ততক্ষণ সিকিবিঘের কাছাকাছিও নয়!

অমনি তার মনে হ'ল Value-র কথা—Labour time-এর কথা। গরু ঠেলতে ঠেলতে সে ভাবতে লাগলো। কাঙ্কি সেখ, নকুড় আর

তার, প্রত্যেকের একবিঘে জমীতে ফসল হয় তো জন্মাবে সমান। কিন্তু কাঙ্কির যত সময় লাগবে, নকুড়ের লাগবে তার দেড়গুণ, আর তার নিজের লাগবে তার আড়াইগুণ। সবার ফসলেরই Value in Exchange হবে সমান, শ্রমের কাল হবে অসমান; কিন্তু আসল Value?—যে সমস্যা সে সমাধান ক'রতে গিয়ে চিরদিনই খেই হারিয়ে ফেলেছে, সেই সমস্যা ভাবতে ভাবতে মাথায় ব্যথা ধ'রে গেল। লাঙল সমান চ'লতে লাগলো।

রবীন মাষ্টার হাঁপিয়ে প'ড়লো, তার ছোট ছেলে এসে তার হাল ধ'রলে, মাষ্টার গাছতলায় গিয়ে বিশ্রাম ক'রতে লাগলো। কাঙ্কি ও নকুড় কিন্তু সমানে হাল চালিয়েই গেল—আর নকুড় গলা ছেড়ে একটা গান ধ'রলে। Labour ও Value-র সমস্যা রবীন মাষ্টারের মনে আরও জটিল হ'য়ে উঠলো।

গামছা দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে রবীন মাষ্টার একবার কাঙ্কির আর একবার নকুড়ের জমীর কাছে দাঁড়াল। হাত দিয়ে মাটি দেখলে; চষা মাটির ভিতর লাঠি চালিয়ে দিলে। সে দেখতে পেলে যে, কাঙ্কি শেখ শুধু তাড়াতাড়ি হাল বাইছে না; তার হালে মাটি কাটছে বেশী গভীর ক'রে। তারপর নিজের জমীর মাটি পরীক্ষা ক'রে সে দেখতে পেলে যে, তার পাঞ্জাবী হালে মাটি সবচেয়ে গভীর ক'রে কেটে গেছে। Labour ও Value-র হিসাবে আরও গোলযোগ লেগে গেল।

তারপর বড় ছেলেকে বসিয়ে রবীন মাষ্টার আবার হাল ধ'রলে। তার উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। তার কাজ দ্রুত এগুচ্ছে না দেখে সে একটু দমে গিয়েছিল কিন্তু চাষটা যে ওদের চেয়ে ভাল হ'চ্ছে তা দেখে তার ভারী উৎসাহ হ'ল। সে নতুন ক'রে হিসাব ক'রতে লাগলো মনে মনে। এতক্ষণ ধ'রে নিয়েছিল যে, তিনখানা জমীতে

সমান ফসল হবে—এখন ভাবলে তা নয়। সুতরাং নতুন ক'রে হিসাব ক'রতে হ'ল।

এমন সময় নিস্তারিণী এসে আর্তনাদ ক'রে প'ড়লো! নিস্তারিণীকে সেখানে ঐ অবস্থায় দেখে রবীন মাষ্টারের পেটের পিলে চমকে গেল। সে হাল ছেড়ে দিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

এ অবস্থায় কি যে কর্তব্য তা রবীন মাষ্টার ঠিক ক'রতে পারলে না। নিস্তারিণী এসে তার সামনে দাঁড়ালে, কেবল মাথানত ক'রে তার আজ্ঞা পালন করা ছাড়া আর কোনও কিছুই কোন দিন তার মনে আসে না। আজও কিছুই তার মনে এলো না।

তার ক্ষেতের চারধারে লোক দাঁড়িয়ে গেছে—এতগুলো লোকের চোখের সামনে নিস্তারিণী এখুনি না জানি কি একটা কেলেঙ্কারী ক'রে ব'সবে, এই ভেবে রবীনের বুক একেবারে দ'মে গেল! আকাশটা হয় তো এই মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়বে কিম্বা পৃথিবীটা উল্টে জলস্থল এক্ষুনি একাকার হ'য়ে যাবে, এমনি একটা অস্পষ্ট আশঙ্কায় তার মন চঞ্চল হ'য়ে উঠলো।

কিন্তু রবীন মাষ্টার দেখে অবাক্ হ'য়ে গেল যে, তেমন কিছুই হ'ল না।

বড় ছেলে রণেন তখন ব'সে বিশ্রাম ক'রছিল। মাকে সেই অবস্থায় আছড়ে প'ড়তে দেখেই, সে মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ব'ললে, "এ কি কাণ্ড ক'রছো তুমি মা? লজ্জা সরমের মাথা খেয়েছ?" এমনি ভয়ানক বকতে লাগলো সে তার মাকে।

রবীন তা দেখে আরও ভয় পেয়ে গেল। নিস্তারিণীকে এমনি ক'রে ব'কলে, তখনি যে একটা ভিস্যুভিয়াসের অগ্ন্যুদ্গার হবে সেই কথা ভাবতে ভাবতে মাষ্টারের হাতে-পায়ে খিল ধ'রে গেল।

কিন্তু হ'ল উল্টো। স্বামীর কাছে যার অখণ্ড প্রতাপ, দেখা গেল সেই নিস্তারিণী ছেলের বকুনিতে একেবারে থতমত খেয়ে গেল। দেখতে দেখতে রণু তাকে টেনে তুলে নিয়ে গেল বাড়ীর দিকে।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো মাষ্টারের। নিস্তারিণী বাড়ীর দিকে পা বাড়াতেই সে হালের বাঁটটা ধরে মুখে বিচিত্র শব্দ ক'রতে ক'রতে গরুকে তাড়না ক'রতে লাগ্‌লো।

দু'বিঘা জমী চষে রবীন মাষ্টার সে দিন বুক ফুলিয়ে বাড়ী ফিরলো। গ্রামের লোকের কিন্তু সে দিন দুঃখে আর ঘুম হ'ল না যে, রবীন মাষ্টার আবার ক্ষেপে গেছে।

নিস্তারিণী সেদিন রাত্রে রবীন মাষ্টারকে যা নয় তাই ব'লে গালা-গালি দিলে, ব'ললে 'চাষা', 'ছোট লোক' আরও কত কিছু—ব'ললে সমস্ত গাঁ-খানার কাছে আজ নিস্তারিণীর মাথাটা কাটা গেল।

আজ জমী চ'ষে এসে রবীনের মনে হ'য়েছিল একটা অপূর্ব্ব উল্লাস —সে সব একেবারে নিবে গেল তার। সে মাথা নীচু ক'রে মুখভার ক'রে নিস্তারিণীর গালাগালি হজম ক'রলে। তার পর মনের দুঃখে ঢুকল গিয়ে তার সেই বইয়ের দূর্গে।

ভাবলে, পরের দিন আর চাষ ক'রতে যাওয়া যাবে না। অথচ বর্গাদারকে দিয়েছে সে বিদায় ক'রে, কতকগুলো পয়সা খরচ ক'রে হাল-গরু কিনেছে—কি যে ক'রবে সে ভেবে পেলে না। এ সমস্যার একটা সহজ সমাধান ছিল চাকর লাগিয়ে জমী চাষ করা। কিন্তু রবীন মাষ্টারের একটা বিশেষত্ব এই যে, খুব বড় বড়, সমস্যার সমাধানে তার মাথা যেমন পরিষ্কার খেলে, অতি সহজ ছোট ছোট সমস্যার সমাধানে তা খেলে ঠিক সেই অনুপাতে কম। অনেকক্ষণ ভেবে চিন্তে কোনও কুল কিনারাই সে ক'রতে পারলে না।

পরের দিন সকালে উঠেও সে ভাবতেই লাগলো ! আজ না গেলে নয়, কিন্তু নিস্তারিণীর কাছে বুঝিয়ে ব'লে যাবার অনুমতি চাইতেও তার ভরসা হ'ল না।

বিবস বদনে বাইরে ব'সে সে ভাবছে, এমন সময় দেখলে রণেন আর তার ভাই হাল-গরু নিয়ে ত'রেব। কেঁপে উঠলো তার বুক।

রণেন ওরফে রণু ব'ললে, "বাবা, আপনি যাবেন না আজ?"

এদিকে ওদিকে চেয়ে ভয়ে ভয়ে রবীন ব'ললে, "আচ্ছা, তোরা যা' আমি আসছি।"

বিস্ময় তার সব চেয়ে এই দেখে হ'ল যে, নিস্তারিণী দাঁড়িয়ে তাদের যাওয়া দেখলে, কিন্তু ব'ললে না কিছুই! তারপর সে এক ফাঁকে বেরিয়ে চ'লে গেল ক্ষেতে চুপি চুপি।

এর আগে যে ব্যাপারটা ঘ'টেছিল তা সে জানতো না, তাই সে আশ্চর্য্য হ'য়েছিল।. কাল রাত্রে যখন নিস্তারিণী রবীনকে বকাবকি ক'রছিল রণু তা' আড়াল থেকে শুনতে পেয়েছিল। আজ সকালে তাই নিয়ে মায়ের সঙ্গে তার বেশ একটু বচসা হ'য়ে গিয়েছিল। রণু মাকে ব'লেছিল যে নিজে হাতে জমী চাষ করায় কোনও অসম্মান নেই, আর চাষ তারা ক'রবেই। মাকে সে শাসালে, যদি তাকে এখানে চাষ ক'রতে বারণ করা হয়, তবে সে যাবে সুন্দরবনে—সেই বাঘ-ভালুকের দেশে—সেখানে জমী নিয়ে নিজে হাতে আবাদ ক'রবে। ছেলের এই কথায় নিস্তারিণী ভয় পেয়ে গিয়ে ব'ললেন, তার চেয়ে থাক সে এখানেই যা' তার মন চায় করুক!

তাই রণু যখন হাল-গরু নিয়ে বের হ'ল, নিস্তারিণী তখন চুপ ক'রে রইলো, আর কিছু ব'লতে তার সাহস হ'ল না।

রবীন মাষ্টার আর তার ছেলে পাড়াগেঁয়ে গেরস্ত—চাষবাসের

বিষয়ে তারা একেবারে অনভিজ্ঞ মোটেই নয়, যদিও হাতে-কলমে তারা খুব বেশী কিছু কোনও দিন করে নি। তার পর রবীন মাষ্টার পয়সা খরচ ক'রে জমীতে ফেলেছিল সার, ভাল ভাল বীজ এনে আবাদ ক'রেছিল, আর কৃষি-বিভাগের বই এনে তার সব উপদেশ পালন ক'রেছিল। কাজেই তার ক্ষেতে যা চারা জন্মাল, সে চমৎকার, সেগুলো বাড়তেও লাগলো বেশ। তার ক্ষেতের চারার পাশে নিজেদের ক্ষেতের চারা দেখে চাষীদেরও চমক লেগে গেল। তারা রবীন মাষ্টারকে এসে জিজ্ঞেসাবাদ ক'রতে লাগলো কেউ কেউ, কি সে ক'রেছে, কোথা থেকে বীজ এনেছে, ইত্যাদি। মহা আনন্দে রবীন মাষ্টার উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলো —আবার তার মুখ খুলে গেল। যার সঙ্গে দেখা হয় তাকেই ধ'রে ভিন্ন ভিন্ন ফসলের, কার জন্য কেমন ক'রে জমী তৈরী ক'রতে হয়, কিসে কি সার দিলে কেমন ফসল ফলে ইত্যাদি কৃষিতত্ব ঘটিত বিস্তারিত বিবরণ সে না শুনিয়ে ছাড়তো না।

দিব্য বাড়তে লাগলো তার ক্ষেতের ফসল। নিড়ান হ'য়ে গেল— সামান্য কিছু রোপা-ধান ছিল, বর্ষার জল-কাদা ঘেটে রবীন মাষ্টার সে গুলো রুয়ে দিলে। রোজ সে তার ক্ষেতের ধারে দাঁড়িয়ে ঝাড়া দু'ঘণ্টা তার ফসলের দিকে তাকিয়ে দেখে, আর তুলনা করে তার ক্ষেতের সঙ্গে অন্য চাষীদের ক্ষেতের। সেই সময় তার পাশে এসে দাঁড়ায় চাষীরা কেউ কেউ, জিজ্ঞেসাবাদ করে—বুক তার ফুলে ওঠে।

এই সুযোগে সে ঝোঁকের মাথায় চাষীদের আবার বোঝাতে চেষ্টা ক'রলে তার স্কীম। তার বস্তা তার হাত ছাড়া হ'য়েছিল বটে কিন্তু তার মোটামুটি কথাটা তার মাথায়ই ছিল। সে চাষীদের তাই বুঝিয়ে ব'লতো, বোঝাতে চেষ্টা ক'রতো যে, তার কথা যদি তারা শোনে, আর সমস্ত গাঁয়ের সব ক্ষেত এক ক'রে তার ভিতর একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ

ব্যবস্থা ক'রে সবাই মিলে আবাদ করে, তবে গাঁয়ের সবাই তাদের খাবার যোগ্য ধান, তরী-তরকারী আর কলাই পাবে, তেলের জন্যে স'রষে পাবে ; আর বাকী জমীতে যা আবাদ হবে, তাতে প্রত্যেকের রোজগার হ'তে পারে গড়ে বছরে দেড়শো টাকা। সে ব'ললে যে গ্রামের চাষী এবং ভূস্বামী সবাই মিলে এখন গড়ে রোজগার করে বড় জোর একশো টাকা। এই কথা শুনে ছমির মণ্ডলের ছেলে হেসে ব'ললে, "বাজে কথা মাষ্টারবাবু। এই ধরুন আমাদের। যে বছর পাটের দর ভাল থাকে, সে বার পাট বেচেই আমরা পাই এক হাজার টাকা, বাজার মন্দ হ'লেও পাঁচশো টাকার কম পাই না।"

রবীন মাষ্টার তাকে বোঝাতে চেষ্টা ক'রলে average কাকে বলে। ছোকরা সেটা যখন তার নিজের মত ক'রে বুঝলো তখন সে ব'ললে, "ভাল কথা ব'লছেন। তবে আমার জমী আমি ছাড়তে যাব কেন? নকুড় মাঝি বছরে পঞ্চাশ টাকা পায়, সে না হয় ছেড়ে দেবে তার জমি, দেড়শো টাকা যদি পায়, সে তার আশায়। আমি আমার হাজার টাকার জমী ছেড়ে দেড়শো টাকা নিতে যাব কেন?"

রবীন মাষ্টার ব'ললে, "তার দেড়শো টাকা হ'তে যাবে কেন? সে লাভ পাবে তার জমীর অনুপাতে। দেড়শো টাকা হবে গড়পড়তার হিসেব—তার মধ্যে কেউ বা পাবে হাজার টাকা, কেউ হয় তো দশ টাকা।"

মোড়লের ছেলে হেসে ব'ললে, "তা' হ'লে আর লাভটা কি হ'ল। এখনো তো তাই হ'চ্ছে, কেউ হাজার পাচ্ছে, কেউ পাচ্ছে দশ।"

রবীন মাষ্টারের মনে হ'ল, আর যাই হোক না হোক প্রত্যেক লোককে বাধ্য ক'রে পাটীগণিতটা শেখান গভর্ণমেণ্টের নিতান্তই উচিত। এই সোজা হিসেবের কথাটা যে ছোকরা বুঝতে পারছে না, তাতে উত্যক্ত হ'যে উঠলো রবীন মাষ্টার।

আর একটি গেরস্ত দাঁড়িয়ে শুনছিল, সে কথাটা বুঝতে পেরেছিল অনেকটা। সে ছমিরের ছেলেকে তার নিজের মত ক'রে কথাটা বুঝিয়ে দিলে। সে বললে যে, মাষ্টার মশায় সব জমীগুলো নিয়ে এক সঙ্গে চাষ করাবেন। তার পর ফসল হ'লে যার যেমন দরকার খাবার ফসল তাদের দিয়ে বাকীটা বেচবেন। বেচে যে টাকা হবে, সেটা মাষ্টারবাবু বেঁটে দেবেন, যার যত জমী সেই হিসেবে।

রবীন মাষ্টার এই ব্যাখ্যায় ঘাড় নেড়ে সায় দিতে দিতে দেখতে পেলে যে, লোকটি একটা মস্ত ভুল ক'রছে। সে ব'লছে, 'মাষ্টার মশায়' চাষ ক'রবেন, 'মাষ্টার মশায়' ফসল বেচবেন ইত্যাদি। সেটা রবীন মাষ্টারের মতলব নয়—মতলব এই যে, চাষীরাই সব ক'রবে। সেই কথাটা বোঝাতে যাবে সে, কিন্তু তার আগেই মণ্ডলের ছেলে ব'লে ব'সল, "হবেছে! আমার জমীর ফসল আমি নিজেই তো বেচতে পারি—মাষ্টারবাবুকে তা' দিতে যাব কেন?"

রবীন মাষ্টার এ কথার জবাব দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু সেই সময় দেখা গেল, একটা গরু চ'রতে চ'রতে এসে গলা বাড়িয়ে দিয়ে রবীন মাষ্টারের ক্ষেতের চারাগুলো চড় চড় করে ছিঁড়ে খাচ্ছে। রবীন মাষ্টার যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, ঠিক তার উল্টো দিকে ছিল গরুটা। ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে হৈ হৈ ক'রে মাষ্টার ছুটে গেল গরু তাড়াতে —ক্ষেতের আ'ল ঘুরে গরুর কাছে লাঠি বাগিয়ে যেতে যেতে সে গরু বেশ খানিকটা খেয়ে গেল। গরু তাড়িয়ে রবীন মাষ্টার চেয়ে

দেখলে যে, প্রায় দুই-তিন বর্গহাত জায়গায় ধানের চারার উপর দিয়ে কে যেন কাস্তে চালিয়ে গেছে। ক্ষেতের গায়ের সেই জখমটা যেন রবীন মাষ্টারের বুকের ভিতর ছুরীর মত ব'সে গেল। সে এক দৃষ্টে সেই দিকে চেয়ে রইলো।

সব চারাই দিব্যি বাড়তে লাগলো। বর্ষাটাও হ'ল বেশ। ক্ষেতের চারাগুলো প্রাণভরে জল পেয়ে যেন একেবারে জীবনরসে ভরপুর হ'য়ে তাজা সবুজ শোভা ছড়িয়ে মাথা বাড়িয়ে উঠতে লাগলো। চাষীর প্রাণ ক্ষেতের দিকে চেয়ে আনন্দে নেচে উঠলো কিন্তু সব চেয়ে আহ্লাদ হ'ল রবীন মাষ্টার আর রণুর। তারা নেচে-কুঁদে বেড়াতে লাগলো।

কিন্তু কয়েক দিন যেতে না যেতে ধাঁ ধাঁ ক'রে বাড়ত লাগলো জল। খাল বিল যে যেখানে ছিল বুক ভরে কেঁপে উঠলো। দিনে আধ হাত কি তিন পোয়া হাত জল বাড়তে লাগলো। দেখতে দেখতে ক্ষেত-খোলা সব ভেসে গেল, চারা গুলো ডুবে গেল। এত তাড়াতাড়ি বাড়লো জল যে, আমন ধান পর্য্যন্ত তার সঙ্গে তাল সামলে বাড়তে পারলো না।

হাহাকার লেগে গেল। ক্ষেতের দিকে চেয়ে চেয়ে চাষীরা ভাবতে লাগলো, এখনো যদি জল টেনে যায়!—হাঁ ক'রে উৎসুক দৃষ্টিতে তারা চেয়ে রইলো ক্ষেতের দিকে একচুল জল কমবার আশায়, কিন্তু বৃথাই চেয়ে রইলো।

রবীন মাষ্টার মাথায় হাত দিয়ে ব'সে প'ড়লো। লোকসানটা তারই সব চেয়ে বেশী, কেন না চাষের জন্য খরচ ক'রেছিল সে সবার চেয়ে বেশী। কিন্তু কোন ভরসাই রইলো না তার।

গ্রামে সব চেয়ে বুড়ো ভুবনবাবু, তিনিও ব'ললেন, এমন বর্ষা তিনিও জন্মে কখন দেখেন নি। সব বাড়ীর উঠোনে হ'ল হাঁটু জল বা বেশী,

কারও কারও ঘর ভেসেও গেল। লোকগুলির দুর্দ্দশার আর অন্ত রইলো না।

জল যখন নেমে গেল তখন দেখা গেল ধানের বারো আনা নষ্ট হ'য়ে গেছে। পাট যারা বুনেছিল বারো আনা রকম বজায় আছে কিন্তু পাট খারাপ হ'য়ে গেছে--দাম হবে না তার। রবীন মাষ্টার পাট বোনে নি, বুনেছিল অন্য ফসল। সেগুলি সবই মাটি হ'য়ে গেল, কেবল খুব উঁচু জমীতে ছিল আখ, সেগুলো রইলো। রবীন মাষ্টারের ধান কিন্তু নষ্ট হ'য়েছিল অন্যের চেয়ে কম। বর্ষাটা এসে প'ড়বার আগেই তার চারাগুলো হ'য়েছিল অন্যের চারার চেয়েপ্রায় আধ হাত বড়। তাই সবার ধান যখন ডুবে গেল, রবীন মাষ্টারের ধান তখনও জেগে ছিল, তাই তার লোকসান হ'য়েছিল সবচেয়ে কম।

'তা হ'লে কি হয়, ছ' বিঘের মধ্যে তিন বিঘে আন্দাজ জমীর ফসল একেবারে মাটি হ'য়ে গেল, রইলো কেবল বাকী তিন বিঘের উপর ধান, প্রায় অদ্ধা-অদ্ধি, আর আখ।

অন্য চাষীরা যদিও এতে রবীন মাষ্টারের ক্ষেতের দিকে হিংসার দৃষ্টিতে চাইতে লাগলো, তবু রবীন মাষ্টার একেবারে ব'সে প'ড়লো। কিন্তু দুর্ভাগ্যের তার আরও বাকী ছিল। একদিন কোথা থেকে একপাল বুনো শূয়োর এসে তার আখের ক্ষেত তচ্ নচ্ ক'রে দিলে। আর একদিন রাত্রে দেখা গেল চারটে গরুতে মিলে ধানক্ষেতে মনের আনন্দে চ'রছে।

৭

রবীন মাষ্টার মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লাগলো, তার সঙ্গে অদৃষ্টের বিষম শত্রুতার কথা। এ শুধু তার দুর্ভাগ্যের ফের। নইলে এবার সে ক্ষেত থেকে যা ফসল ঘরে আনতে পারতো জন্মে সে কখনও তা পায় নি।

অমনি তার দৃষ্টি ফিরে গেল তার সমস্ত অতীত জীবনের দিকে। জীবনের সবগুলি ঘটনা একটি একটি ক'রে সে আলোচনা ক'রে গেল। অনেক বৈচিত্র্যময় সে জীবন—কেন না সে অনেক কিছু কল্পনা ক'রে অনেক রকম উৎসাহে অনেক কাজ আরম্ভ ক'রেছে—আংশিক সফলতাও সে অনেক পেয়েছে—কিন্তু পরিণাম তার বৈচিত্র্যহীন। সব চেষ্টা, সব সাধনার সীমায় গিয়ে সেই একই ফল—পরাভব! এমন নিয়ম ক'রে নির্য্যাতন অদৃষ্টের হাতে কেউ পেয়েছে কি কোনও দিন?

সে দিন ক্ষেতের ধান মাড়াই হ'য়ে জমা হ'চ্ছিল। গেল বছর বরগা-দারও যা দিয়েছিল, এ তার চেয়েও কম। অন্য ফসল যা হ'য়েছিল সব নষ্ট হ'য়ে গেছে। শূয়োরের খাবার পর আখের যা' অবশিষ্ট ছিল, ছেলে-পিলেরা চিবিয়েই তা' মেরে দিয়েছে।

সেই অপ্রচুর ধানের সমষ্টির দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছিল রবীন মাষ্টার। তার সমস্ত জীবনের পুঞ্জীভূত নিস্ফলতার ভারে যখন চুরমার হ'য়ে যাচ্ছে তার হৃদয়, তখন নিস্তারিণী মুখটা বেঁকিয়ে ব'ললে, "আহা! বাপ বেটায় চাষ ক'রে ধান এনেছেন দেখ! ম'রে যাই আর কি!"

উঠোন ঝাঁট দিয়ে মাতঙ্গী ধানগুলো জড়ো ক'রে ধামায় ধামায় ভ'রে ঘরে নিচ্ছিল। নিস্তারিণী তার কাছে ছেলে কোলে ক'রে তদ্বির

ক'রছিল। কোথায় কোন্ কোণায় দু'চার দানা ধান হয় তো প'ড়েছিল, মাতঙ্গীর চোখে পড়ে নি তখনও, সেই কটা কুড়িয়ে এনে ধামায় ফেলে সে মাতঙ্গীকে শাসাচ্ছিল, "ভাল ক'রে কুড়িয়ে নে ঠাকুরঝি—ধান লক্ষ্মী। একদানা যদি নষ্ট হয় তো লক্ষ্মী রাগ ক'রবেন! এমনি তো ঘরে ব'সে আছেন জ্যান্ত অলক্ষ্মী!"—ব'লে স্বামীর দিকে চাইলে।

নিস্তারিণীর কথাগুলো আজ যেন রবীন মাষ্টারের বুকে বিষের ছুরির মত বিঁধছিল। অনেক স'য়েছে সে, কিন্তু আজ যেন আর সইতে পারে না। ক্রোধ—যা জীবনে কোনও দিন সে দেখায় নি, ভাল ক'রে অন্তরেও অনুভব করে নি কোনও দিন, সেই ক্রোধ যেন গোখ্‌রো সাপের মত মনের মাঝে গর্জ্জন ক'রে উঠলো।

রণ্‌ বাড়ী নেই। নইলে সে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করতো। সে মায়ের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে পারতো যে, তার ঘরে আজ যে ধান উঠেছে অন্য চাষীর ঘরে তার অর্দ্ধেকও ওঠে নি। কিন্তু সে নেই, কাজেই নিস্তারিণীকে জবাব দেবার বাধা দেবার কেউ নেই। তুচ্ছ বাস্তব অবস্থার খাতিরে নিস্তারিণী কথার ঝাঁঝটা কমাবার কোনও দরকার মনে ক'রলে না।

সে ব'লে গেল, "ঐ যে বলে,—'যার কর্ম্ম তারে সাজে' ভদ্রলোকের ছেলে তাদের না কি সাজে চাষ করা। আমি আগেই জানি এই হবে।"

রবীন মাষ্টার এবারে এমন একটা কাণ্ড ক'রলো জীবনে যা কোন দিন কল্পনাও সে ক'রতে পারে নি। সে উঠে চোখ রাঙিয়ে নিস্তারিণীকে ব'ললে, "তুমি জান তোমার গুষ্টির মাথা। লক্ষ্মীছাড়ী!"—ব'লে দাঁত কড়্‌-মড়্‌ ক'রতে ক'রতে সে ঢুকলো গিয়ে তার বাইরের ঘরে।

নিস্তারিণী স্বামীর এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে এতই আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল যে, কিছুক্ষণ সে কোনও কথাই ব'লতে পারলে না, রাগে কটু

মট্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে চেয়ে রইলো শুধু। তার পর আরম্ভ হ'ল তর্জ্জন, গর্জ্জন, বর্ষণ এবং শেষে বন্যা।

রবীন মাষ্টার তখন বাইরের ঘরে। হাতের সামনে যে বইটা সে পেলে সেইটা নিয়ে তার উপর চোখ বুলোতে লাগলো। কিছুক্ষণ মন বসাতে পারলে না। কিন্তু একটু পরেই তার মনটা একেবারে ডুবে গেল সে বইয়ে। কিন্তু Westermarck-এর History of Marriage—পুরানো দোকানে সস্তায় পেয়ে সে কিনেছিলো। আরুণ্টা জাতির অদ্ভুত যৌন সম্মিলন পদ্ধতির কথা প'ড়ে সে প'ড়তেই লাগলো। বাইরের জগৎ সে একেবারে এতটা ভুলে গেল যে, বাড়ীর ভিতর যে বজ্রনির্ঘোষ ও ঝটিকার সঙ্গে বর্ষণ হ'চ্ছিল তা' তার কানেই গেল না।

এ বই তার পড়া ছিল। এমন সম্পদ তার ছিল না যাতে বই কিনে সে না পড়ে সাজিয়ে বা জমিয়ে রাখতে পারে। যা সে কিনতো তা' সে আদ্যোপান্ত পড়তো, আর যা কিনতে পারতো না, তা' সে নানারকম ফিকির ক'রে প'ড়ে আসতো।

আরুণ্টা জাতির কথা প'ড়তে প'ড়তে তার মনে এল Hobhouse-এর Evolution of Morals-এর কথা। সে বইখানা সে কিনতে পারে নি, ক'লকাতায় ব'সে প'ড়ে এসেছিল, আর আদ্যোপান্ত নোট ক'রে এনেছিল। আর একখানা বই সে কিনেছিল, তার মলাট ছিল না, লেখকের নামও সে জানে না, সে বই খানার নাম Evolution of Law।

Westermarck-এর বইয়ের সেই জায়গাটা পড়া হ'য়ে গেলে সে খুঁজে বের ক'রলে শেষোক্ত বইখানা, আর তার রাশি রাশি নোটের জীর্ণ খাতা ঘেঁটে বের ক'রলে, Hobhouse-এর যে নোট ক'রেছিল

সেই খাতা খানা। নিবিষ্টমনে সে প'ড়লো। বিবাহ অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্য ও তার পরিণতির ক্রম সম্বন্ধে সে মনে মনে ভাবতে লাগলো।

তার মনে একটা প্রশ্ন উঠলো যে, বিবাহের এই ইতিহাসের মধ্যে প্রেম—ভালবাসা, যা' নিয়ে কবিরা এত কাব্য লিখে গেছেন, যা' ছাড়া উপন্যাস, ব'লতে গেলে হয় না, সেই ভালবাসার স্থান কতটুকু?

আরুণ্টাদের ভিতর একটি পুরুষ ও একটি নারীর বিবাহ হয় না, এক গোত্রের এক পুরুষের সব ছেলের বিয়ে হয়—আর এক গোত্রের এক পুরুষের সব মেয়ের সঙ্গে। তারপর এই দুই দলের মধ্যে সঙ্গম হয়—যার যেমন খুসী। রবীনের মনে হ'ল, এ ব্যবস্থায় পুরুষ ও নারী তাদের সঙ্গিনী বা সাথী বেছে নেয় পছন্দ অনুসারে, যে যাকে ভালবাসে সে তার সঙ্গে যায়। এদের ভিতর আর এমনি অসভ্য জাতের ভিতর হয় তো যৌনসঙ্গমে ভালবাসার একটা বড় স্থান হ'তে পারে এই ব্যবস্থায়।

কিন্তু এই আরুণ্টা জাতি—এদের ভিতরও যৌন মিলনে ভালবাসার পথ একেবারে নিরঙ্কুশ নয়। Tabu দিয়ে বারণ করা আছে অনেক কিছু—সেই tabu-র গণ্ডির ভিতরে ভালবাসার অধিকার।

তারপর অন্য নানা সভ্য ও অসভ্য জাতির বিয়ের পদ্ধতির কথা স্মরণ ক'রে দেখলে, যেন যতই মানুষের সমাজ সভ্য হচ্ছে ততই এই tabu-র গণ্ডি শক্ত আর অল্প পরিসর হ'য়ে যাচ্ছে—বিয়ের ভিতর ভালবাসার যে একটা স্থান আছে সেইটাই যেন চাপা প'ড়ে যাচ্ছে। সব জাতের বিয়ের আইন প'ড়ে দেখ, আচার অনুশীলন ক'রে দেখ, দেখবে, তাতে শুধু বিরুদ্ধ সম্বন্ধের কথা, অনুষ্ঠান বাহুল্যের কথা, বাঁধাবাঁধির কথা, স্বত্ব ও অধিকারের কথা। সেই আদিম tabu,

সমাজের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেন ভালবাসার গলা টিপে মেরেছে। ভালবাসা চাপা পড়ে মারা গেছে নিয়মের ভারে—বিয়েটা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে শুধু নিয়মের বন্ধন, শাসনের পরিনিষ্ঠা। নিয়ম অনুষ্ঠান—যা' আদিম tabu-র অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র—যার লক্ষ্য হ'চ্ছে সমাজ বাঁধবার, ছেলে-পিলে মানুষ করবার একটা সুব্যবস্থা করা—তারই নাম বিবাহ। সমাজের খাতিরে ব্যক্তিকে বাঁধবার একটা বিশিষ্ট প্রণালী মাত্র এটা—এর ভিতর ভালবাসার ঠাঁই নেই—শুধু জবরদস্তি ক'রে মাঝে মাঝে ভালবাসা এসে নিয়মের এ দুর্গের ভিতর হানা দিয়ে যায়—চোখ রাঙিয়ে নিয়ম তার অনধিকার প্রবেশকে শাসন করে।

সমাজ ভেদে, অবস্থা ভেদে এ প্রণালী হ'য়েছে বিচিত্র, কিন্তু সর্ব্বত্রই—অন্ততঃ সভ্য সমাজে—বিবাহ হ'চ্ছে নিয়মের এই বন্ধন। রবীনের মনে হ'ল সমাজের জন্য এসবের দরকার যাই থাক, ব্যক্তিকে এতে বাঁধেই শুধু, মুক্তি দেয় না—অভ্যুদয় আনে না প্রাণে, যা' আনতে পারে শুধু ভালবাসায়!

অভ্যুদয় যে আনে ভালবাসায়, তার বাঁধনে প'ড়ে আত্মা যে কেমন একটা মুক্তি ও স্ফূর্ত্তির আস্বাদ পায় সে কথা রবীন মাষ্টার জানতো। একদিন সে জেনেছিল। অনেক দিনের কথা সে—তিরিশ বৎসরের উপর।

রবীন তখন ঢাকায় বি-এ পড়ে। একটি ভদ্রলোকের বাড়ীতে থেকে সে প'ড়তো। স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে সে তাঁর মেয়ে তড়িতের শিক্ষার ভার নিয়েছিল। তিন বছর সে পড়িয়েছিল তড়িৎকে—তারপর সে চ'লে এলো। তড়িৎ তখন ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠেছে।

তড়িৎ দেখতে সুন্দর নয়। কিন্তু রবীনের মনে হ'ত উর্ব্বশীর রূপও তার কাছে হার মেনে যায়। এমন মিষ্টি স্বভাব তার, এমন মধুর কণ্ঠ—

আর তার চোখের দৃষ্টি—এত মাধুরী তাতে ছিল যে, এত দিনকার মরচে-পড়া তার স্মৃতি মনে উঠে রবীনের প্রৌঢ় হৃদয় চঞ্চল ক'রে দিলে।

তড়িৎকে সে ভাল বেসেছিল। তড়িৎ তাকে ভাল বেসেছিল। ভালবাসার কথা কোন দিনও হয় নি তারা একটিও, তবু তারা পরস্পরকে ভালবাসতো, আর দু'জনেই জানতো যে, এ ওকে ভালবাসে।

সেই দিনকার সেই স্মৃতি আজ ভেসে উঠলো রবীনের মনে। মনে হ'ল তার কি অপূর্ব্ব উল্লাস, কি অভ্যুদয় হ'য়েছিল তার মনে সেই প্রেমে! নিস্তারিণীর সঙ্গে তার বিবাহ সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্যের নিগড়বন্ধনের পাশে সেই প্রেমের স্মৃতি তার চিত্তে আরও গৌরবান্বিত হ'য়ে উঠলো।

এই অভ্যুদয়, এই উল্লাস, এই মুক্তির আস্বাদ যা রবীন মাষ্টার পেয়েছিল একদিন, আজ তার মনে হ'ল যেন সভ্যসমাজ বিবাহের নিগড় বেঁধে মানুষকে তা' থেকে বঞ্চিত ক'রেছে।

ভাবতে ভাবতে, আজ অনেক দিন পরে—প্রায় দশ বৎসর পরে, সে তার একটা তোরঙ্গ খুলে বের ক'রলে একটা পোঁটলা। একে একে তার শত আবরণ উন্মোচন ক'রে ক্রমে তার ভিতর থেকে বের হ'লো, এক তাড়া চিঠি—তড়িতের চিঠি।

ঢাকা থেকে সে চ'লে আসবার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত তড়িৎ তার কাছে চিঠি লিখেছিল, রবীন মাষ্টারও তার রীতিমত জবাব দিয়েছিল। লম্বা লম্বা সে চিঠি—তুচ্ছ ও মহান বহু বিবরণে ভরা। কত কথাই তড়িৎ তাকে জানিয়েছে, বাড়ীর নিতান্ত ছোট-খাট খবর,—তার আদরের বেড়ালের ক'টি ছানা হ'য়েছে, তার কোন্‌টি কেমন, এমনি সব ছোট কথা থেকে তার ভিতর জীবনের বড় বড় সমস্যার অনেক আলোচনা আছে। চিঠিগুলোর ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে এমন একটা প্রেম যাতে ক'রে একজন আর একজনের এত আপনার হ'য়ে যায় যে, জীবনের অতি

তুচ্ছ কথাও তার কাছে বলতে সাধ যায়। কিন্তু স্পষ্ট কথায় প্রেমের প্রকাশের ছিটেফোঁটাও তাতে নেই।

সেই চিঠির ভিতর ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ হ'য়েছে তড়িতের সাত বৎসর সমস্ত জীবনের ইতিহাস, অন্তরের ক্রমবিকাশের ইতিহাস। সেই গুলি রবীন খুলে প'ড়তে লাগলো। তড়িৎ কবে ম্যাট্রিক দিলে, কবে সে আই-এ পাশ ক'রলে, কবে বি-এ পাশ ক'রলে, সে কথা সে প'ড়লো।

বি-এ পাশ ক'রবার পর সে একখানা চিঠি লিখেছিল, সেখানা প'ড়তে গিয়ে রবীনের চোখ ঝাপ্‌সা হ'য়ে এলো। তড়িৎ লিখেছে—

"আপনি কি রাগ ক'রবেন এ চিঠি পেয়ে? আপনার পায়ে পড়ি আমাকে যেন ভুল বুঝবেন না। আমি বি-এ পাশ ক'রেছি, এটা স্পর্দ্ধা করে আপনাকে জানাচ্ছি না। জানাচ্ছি এই আশায় যে, এ শুনে আপনার আহ্লাদ হবে। আর কেউ জানুক বা না জানুক, আমি জানি আর আপনিও জানেন যে, আপনি আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছিলেন, সে শিক্ষা না পেলে আমার বি-এ পাশ ক'রবার শক্তি হ'ত না। তাই এ খবরটা আপনাকে আনন্দ ক'রে জানাচ্ছি; আশা করি আপনিও আনন্দ লাভ ক'রবেন।

* * * *

"মা-বাবার একান্ত ইচ্ছা যে, আমি বিয়ে করি। আপনি কি বলেন? কি হাসির কথা দেখুন, আমি জিজ্ঞেস ক'রছি এমন ভাবে যেন আমার বিয়ের সব ঠিকই আছে, কেবল আপনার মতের অপেক্ষা! কিন্তু আসলে কিছুই নেই। যিনি আমার পাণিগ্রহণ ক'রে আমায় ধন্য ক'রবেন সেই পুরুষ-পুঙ্গবের দেখা আমি এখনও পাই নি কিম্বা হয় তো পেয়েছি—কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না। বলুন তো পেয়েছি কি না? সুতরাং প্রশ্নটা নিতান্ত বাজে—সম্পূর্ণ academic। বিয়ে আমার হবে কি না কোনও

দিন জানি না। কিন্তু এ ঠিক যে, এমন কাউকে আমি বিয়ে ক'রতে রাজী হব না, যাকে পেয়ে আমার জীবন আমি ধন্য মনে না ক'রবো। আপনি তো জানেন আমার মনের খবর, বলুন তো কে বা কেমন সে লোক, যাকে পেলে আমার জীবন ধন্য হবে?

"ভাল কথা, আপনি কি বিয়ে ক'রেছেন? ক'রে থাকলে কোন্ ভাগ্যবতীকে? ফটো একটা পাঠিয়ে দেবেন।"

এ চিঠি পড়ে তখনি রবীনের মনে হ'য়েছিল যে, তড়িৎ এর উত্তরে আশা ক'রেছিল রবীনের কাছ থেকে একটা বিবাহের প্রস্তাব। রবীন তখন স্কুল নিয়ে ভারী ব্যস্ত, তার চাল- চুলোর কোনও ঠিকানা নেই, বিয়ের কথা সে ভাবতেই পারে না। তা ছাড়া তড়িৎ বি-এ পাশ ক'রেছে, সে বি-এ ফেল। কি সাহসে সে বিয়ে ক'রতে চাইবে তড়িৎকে!

এ চিঠির উত্তরে রবীন লিখেছিল একখানা খুব ভাসা-ভাসা চিঠি তাতে সে লিখেছিল যে, তার বিয়ের কোনও সম্ভাবনাই নেই—বিয়ে ক'রবার কথা ভাবেও নি সে, ভাববার মত শক্তিও নেই তার তড়িতের কি রকম স্বামী হ'লে তার মন ভ'রবে, তার একটা আন্দাজ সে ক'রেছিল,—সে লিখেছিল, তিনি হবেন মস্ত পণ্ডিত—ভারি রসিক, চরিত্র-বলে বলীয়ান ইত্যাদি। সে চিঠির উত্তরে তড়িৎ লিখেছিল—

"আপনার চিঠি পেয়ে আমার এত রাগ হ'য়েছিল যে, আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। আপনি কক্ষণও ঠিক আপনার মনের কথা লেখেন নি। সব জেনে-বুঝে মিথ্যে ক'রে লিখেছেন। কাকে পেলে আমার জীবন সার্থক হবে তা আপনি খুবই জানেন, মিথ্যে ভাঁড়িয়েছেন। যাক, এ কথা নিয়ে আপনাকে ঘাঁটান মিথ্যে।

"আপনার নিজের কথা শুনে আমার ভারি দুঃখ হ'ল। কেন মিছে

ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে পাড়াগাঁয় ঐ স্কুল নিয়ে প'ড়ে আছেন? চ'লে আসুন না এখানে! (চিঠিখানা ক'লকাতা থেকে লেখা।) এখানে একটা উপায় হবেই।

"তবে যদি আপনার সে ইচ্ছা না থাকে, ব্রহ্মচারী হ'য়ে আপনার গ্রামের সেবা ক'রবেন আপনি—এই যদি আপনার আদর্শ হয়, তবে অবিশ্যি কথা স্বতন্ত্র। আপনার সে সাধু-সংকল্পে আমি অন্তরায় হ'তে চাই নে।"

তড়িতের শেষ চিঠি তার তিন বছর পরে লেখা। তড়িৎ তখন এম্-এ পাশ ক'রেছে—চিঠিখানা লিখেছে সে তার বিয়ের আগের দিন। এ চিঠিতে আর কোনও কিছু ঢাকাঢাকি নেই। সে লিখেছে—

"কাল আমার বিয়ে।"

"ভাববেন না হাসিমুখে আমি বিয়ে ক'রছি। কান্নায় আমার বুক ভ'রে যাচ্ছে। বিয়ে হ'চ্ছে আমার কিন্তু তাঁর সঙ্গে নয় যাঁকে আমার হৃদয়ের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা ক'রে এতদিন পূজা ক'রে এসেছি। নিষ্ঠুর দেবতা আমার সে পূজা গ্রহণ ক'রলেন না। আজ যাচ্ছি আমি পরের ঘরে। নইলে বাবা-মা বড় দুঃখ পান, তাই এ কাজ ক'রতে হ'চ্ছে।

"আজ জন্মের শোধ একটি বার আপনাকে ব'লতে ইচ্ছে হচ্ছে যে, এতগুলি বছর ধ'রে আমি প্রাণে-প্রাণে কামনা ক'রেছিলাম আপনাকেই। —পেলাম না, দুর্ভাগ্য আমার!

"যাক, অদৃষ্টে যা ছিল হ'য়েছে। এখন যাচ্ছি পরের ঘরে। দয়া ক'রে আর চিঠি লিখবেন না, চিঠির প্রত্যাশাও ক'রবেন না। এখন তো আর আমাদের চিঠি লেখা উচিত হবে না।"

যেদিন রবীন এই চিঠি পেয়েছিল সেদিন সে লুটোপুটি খেয়ে কেঁদেছিল। আজও এ চিঠি প'ড়ে তার চোখ জলে ভেসে গেল।

সে ভাবতে লাগলো, এখন তড়িৎ কোথায়? তার স্বামী কি করে? কতকগুলি ছেলেপিলে হ'য়েছে তার? জানতে ভারী কৌতূহল হ'ল।

অনেকক্ষণ পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চিঠিগুলো সে তুলে রাখলে। তার পর সে সব গুটিয়ে রেখে পায়-পায় চ'ললো ভুবনবাবুর বাড়ী দাবা খেলতে।

৮

আর এক বছর কেটে গেল। বলা বাহুল্য রবীন মাষ্টার নিজ হাতে চাষ-আবাদের চেষ্টা ছেড়ে দিলে, ঠিক যেমন সে আর সব চেষ্টাই ছেড়েছিল মা থেয়ে। রণু এতে আপত্তি ক'রেছিল। তার সঙ্গে রফা হ'ল এই যে, সে ঢাকায় গিয়ে ফার্মে কৃষি-বিদ্যা শিখবে—শিখে এলে সে হাতে-কলমে চাষ ক'রবে।

হেড মাষ্টারের কাছে তাড়ার পর তাড়া খেয়ে রবীন মাষ্টার স্কুলের কোনও কথার সাতে-পাঁচে থাকতো না। সে সময় মত স্কুলে যেতো, রুটীন বেঁধে পাঁচ ঘণ্টা পড়াত, তারপর সে বাড়ী ফিরে আসতো। স্কুলে কোথায় কি হ'চ্ছে, কে কি ব'লছে, তার কোনও খবরই রাখতো না সে।

একদিন বাড়ী ফিরছে সে—ষষ্ঠ শ্রেণীর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে দেখতে পেলে যে, মাষ্টার ম'শায় টেবিলের উপর কয়েকটা মেটে গেলাস আর গোটাকয়েক গাছপালা নিয়ে বই থেকে প'ড়ছেন আর সেই সব জিনিষ নেড়েচেড়ে মাঝে মাঝে ছেলেদের দেখাচ্ছেন। ছেলেরা যে-যার বেঞ্চিতে ব'সে আছে। কৌতূহলী হ'য়ে রবীন দোরের কাছে দাঁড়িয়ে গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ সে শুনলে মাষ্টারের পড়ান। খুব

ছোট ছোট ছেলেদের ক্লাসে উঁকি মেরে সে দেখতে পেলে যে, ছেলেরা লাল-সবুজ কাগজ কেটে সেগুলো ভাঁজ ক'রছে।

স্কুলের ছুটির পর রবীন মাষ্টার সেই দুই ক্লাসের মাষ্টারকে ডেকে জিজ্ঞেস ক'রলে তারা কি ক'রছিলো। একজন ব'ললে, Nature study হ'চ্ছিল, আর একজন ব'ললে, Paper folding।

রবীন ব'ললে, "তোমারা যে এই সব কর, হেডমাষ্টার জানেন?" মাষ্টার দু'টি ছেলে মানুষ, রবীনের পুরোনো ছাত্র।

"কেন জানবেন না? তিনিই তো ব'লে দিয়েছেন।"

অবাক হ'য়ে রবীন মাষ্টার ব'ললে, "তিনি ব'লে দিয়েছেন? বল কি? তিনি যে এ সবের ওপর ভারি চটা।"

একজন ব'ললে, "কই না! তিনিই তো আমাকে Teachers' Manual দিয়ে এ সব পড়াতে ব'লে দিয়েছিলেন।"

রবীন ব'ললে, "বটে, বটে, ভারি আশ্চর্য্য তো!"

আর একজন ব'ললে, "আশ্চর্য্য হবার কিছুই নয় স্যর। হেডমাষ্টার কি আর অমনি ক'রেছেন এ সব? ইনস্পেক্টারের সার্কুলার এসেছে, Nature study, Manual training—এ সব শেখাতে হবে।"

রবীন ব'ললে, "তাই না কি? বেশ তো। দেখ—কিন্তু তুমি ওই যা কর'ছিল ওকে কিন্তু Nature study বলে না। সে কেমন ক'রে ক'রতে হয় তার বই আছে আমার কাছে। দেখতে চাও তো যেও আমার বাড়ী। আর তুমিও গিয়ে দেখে এসো না, কাগজ কাটা, কাগজ ভাঁজ ক'রবার কত প্যাটার্ণ আছে।"

মাষ্টার দু'টি তার বাড়ীতে এলে রবীন মাষ্টার তাদের বই খুলে অনেকক্ষণ অনেক কথা বোঝালে, অনেক ছবি দেখালে, শিক্ষার থিওরী নিয়ে অনেক বক্তৃতা ক'রলে। তারা দু'খানা বই বগলে ক'রে যখন

বেরিয়ে গেল, রবীন মাষ্টার তখন তার ঘরে ব'সে ভাবতে লাগলো আর কেবলি হাসতে লাগলো।

তার মনে হ'ল ঠিক পোনেরো বছর আগে সে ছেলেদের নিয়ে Nature study করাত, হাতের কাজ শেখাত। তখন হেডমাষ্টার এসে তার উপর কি রাগ। তার সে কাজ বন্ধ ক'রতে হয়েছিল। আজ পোনেরো বছর পরে প্রভুরা শিখেছেন সবে এইসব জিনিষের কথা। বিশ বছর আগে সে যা ক'রতো আর পোনেরো বছর আগে জোর ক'রে যা বন্ধ করা হ'য়েছিল, আজ হেডমাষ্টারবাবু একেবারে নতুন আমদানী ব'লে সে জিনিষ চালাতে আরম্ভ ক'রেছেন! কি বেকুব দুনিয়ার লোক, কি অজ্ঞ! ভাবতে তার হাসি পেল।

আর যদি বা এই সব শেখানোর হুকুম এলো তখন হেড্‌মাষ্টার তো জানতেন যে, এ সব বিষয় রবীন মাষ্টার বেশ ভাল ক'রেই জানে, আর অন্য কেউ জানে না কিছু। কিন্তু রবীন মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত না ক'রে তিনি ভার দিলেন দুই ছোকরাকে, যারা এ সম্বন্ধে কিছুই জানে না, কোন দিন শেখেও নি। রবীন মাষ্টার হাসতে হাসতে ভাবলে "কোন্ মুখে আর ডাকবে সে আমায়? তা হ'লে যে নাক কাটা যায়, জব্দ হ'তে আর বাকী থাকে না।"

কথাটা তার আর অন্তরকে পীড়া দিল না, মনে হ'ল মহা হাস্যকর একটা ব্যাপার। সে চুপ-চাপ ব'সে হাসতে লাগলো।

নিস্তারিণী তখন সেই ঘরে এসে স্বামীকে অমনি একলা ব'সে হাসতে দেখে পেয়ে গেল মহা ভয়। স্বামী পাগল হ'য়ে গেছেন তাই ভেবে সে বাড়ীর ভিতর ছুটে গিয়ে লোক ডাকা-ডাকি সুরু ক'রলে।

অনেকে এলো, সবাই এসে এসে তফাৎ থেকে রবীন মাষ্টারকে দেখে, আর সরে গিয়ে জটলা করে। শেষে ক'বরেজ ম'শায় এলেন।

যখন ক'বরেজ ম'শায় এলেন তখন রবীন মাষ্টার উঠেছে। উঠে সে চ'লেছে ভুবনবাবুর কাছে।

ক'বরেজ ম'শায় ব'ললেন, "কোথায় যান মাষ্টার ম'শায় আমি যে আপনাকে দেখতে এসেছি? খবর পেলাম আপনার না কি অসুখ!"

"আমার অসুখ! পাগল হ'য়েছেন ক'বরেজ ম'শায়? আমার অসুখ দেখেছেন কোনও দিন?"

"আচ্ছা, দেখি একবার নাড়ীটা তবু।"

হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে দিযে রবীন মাষ্টার ব'ললে, "দেখুন, মন খুসী ক'রে দেখুন।"

ক'বরেজ ম'শায় অনেকক্ষণ নাড়ী টিপে থেকে ব'ললেন, "হু।"

রবীন মাষ্টার ব'ললে, "হুঁ কি ম'শায়?"

"না বিশেষ কিছু নয়, যা ভেবেছিলাম তাই। বায়ু কুপিত। তা কোনও চিন্তা নেই, কয়েকদিন নারায়ণ তেল মাখলে আর একটু ওষুধ খেলেই সেরে যাবে। এর জন্য চিন্তা ক'রবেন না।"

হেসে রবীন ব'ললে, "চিন্তা তো আমার নয় ম'শায়, চিন্তা দেখছি আপনারই।"

ব'লে সে হাসতে হাসতে চ'ললো ভুবনবাবুর কাছে।

ক'বরেজ ম'শায় সাধারণ গ্রাম্য ক'বরেজ। কতকগুলি ওষুধ তৈরী ক'রতে জানেন আর তার মোটা-মুটি ব্যবহার জানেন। যা জানেন তাতে মোটা-মুটি জ্বরটা, আমাশয়টার চিকিৎসা তিনি মন্দ করেন না। তার চেয়ে শক্ত কোনও ব্যারামের অভিজ্ঞতা তাঁর কিছুই নেই, নাড়ী-জ্ঞানও তাঁর ব'লতে গেলে কিছুই নেই।

রবীন মাষ্টার চ'লে গেলে, ক'বরেজ ম'শায় নিস্তারিণীর কাছে রোগের অবস্থা শুনলেন। ঘাড় নেড়ে ব'ললেন, "উন্মাদেরই লক্ষণ বটে, তবে

ভাবনা ক'রবেন না বউ-মা, এক সপ্তাহ ওষুধ খেলেই বোধ হয় সেরে যাবে—একটু সাবধানে থাকবেন, আর ওঁকে একটু তোয়াজে রাখবেন, রাগাবেন না ওঁকে। একে বায়ু কুপিত তার উপর ক্রোধ হ'লে ঘোর অনিষ্ট হ'তে পারে।"

ক'বরেজ ম'শায়ের কাছে উন্মাদ রোগের ওষুধ তৈরী ছিল না, থাকবার কথাও নয়। খানিকটা নারায়ণ তেল ছিল আর সাধারণ যে ওষুধ ছিল তারই মধ্যে দু'একটা বেছে অনুপানের লম্বা ফর্দ্দ দিয়ে তিনি ওষুধ পাঠিয়ে দিলেন নিস্তারিণীকে।

দাবা খেলে আজ রবীন মাষ্টার ভুবনবাবুকে তিনবার মাৎ ক'রে মহা উল্লাসে তার আজকের খেলার চালগুলো মনে মনে পুনরাবৃত্তি ক'রতে ক'রতে বাড়ী এল। এসে সে দেখে, নিস্তারিণী তার অপেক্ষায় বাইরে এসে ব'সে আছে।

রবীন মাষ্টারের প্রাণ কেঁপে উঠলো। তার দাবা খেলে ফিরতে রাত হয় ব'লে নিস্তারিণী রোজ সবাইকে খাইয়ে-দাইয়ে তার ভাত ঘরে চাপা দিয়ে শুয়ে থাকে। রবীন মাষ্টার এলে কোনও দিন ওঠে—সে দিন হয় তীব্র তিরস্কার—কোনও দিন ওঠেও না। আজ নিস্তারিণী না শুয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছে তার জন্যে, দেখে রবীনের বুকের রক্ত শুকিয়ে গেল। সে ভাবলে, আজ বুঝি কুরুক্ষেত্র!

নিস্তারিণী তাকে দেখে হেসে ব'ললে, "যা হ'ক, এতক্ষণে আসবার বেলা হ'ল বাবুর। আমি দু'ঘণ্টা এখানে ব'সে আছি।"

রবীন মাষ্টার অবাক হ'য়ে ব'ললে, "কেন? শোও নি তুমি আজ?"

"কেন? শোব কেন? রোজই আমি শুয়ে থাকি না কি? সারাদিনের খাটুনীর পর একটু গা গড়াই বই তো নয়!"

"না, না, তা ক'রবে বই কি? বেশ তো বেশ তো।"

ব'লতে ব'লতে সে নিস্তারিণীর সঙ্গে অন্তঃপুরে তার শোবার ঘরে গেল।

রোজ রাত্রে তার ভাত এখানে ঢাকা থাকে। আজ নেই দেখে সে ব'ললে, "এ কি?—ভাত?"

হেসে নিস্তারিণী ব'ললে, "হাঁ, হাঁ, আছে ভাত, পাবে। মুখ হাত ধুয়ে নাও।"

রবীনের ভারী আশ্চর্য্য লাগলো নিস্তারিণীর এই হাসি আর এই সদয় ব্যবহার। এটা এতই অদ্ভুত যে, সে কিছুক্ষণ মূঢ়ের মত চেয়ে রইল শূন্য দৃষ্টিতে নিস্তারিণীর দিকে। সেই দৃষ্টির ভাব দেখে নিস্তারিণীর বুক কেঁপে উঠলো—মনে হ'ল বুঝি এ আসন্ন উন্মাদের লক্ষণ।

মুখ হাত ধুয়ে এলে নিস্তারিণী হেঁসেল থেকে বেড়ে নিয়ে এলো গরম ভাত।

গরম ভাত—রাত্রে রবীন মাষ্টার আজ দশ-বিশ বছর খেয়েছে ব'লে মনে প'ড়লো না। ভাতে হাত দিয়েই সে হাঁ ক'রে নিস্তারিণীর দিকে চেয়ে রইলো অবাক হ'য়ে।

স্বামীর এই দৃষ্টিতে নিস্তারিণীকে আরও ভয় খাইয়ে দিলে, সে ব'ললে, "কি দেখছো? খাও।"

রবীন মাষ্টার ব'ললে, "ভাত যে গরম।"

"গরম তাই কি? নেড়ে-চেড়ে ঠাণ্ডা ক'রে দেব?"

"না, না, ব'লছিলাম, ভাত গরম হ'ল কেমন ক'রে?"

নিস্তারিণী ভাবলে, এ পাগলের কথা! নইলে রবীন কি জানে না, ভাত গরম হয় কেমন ক'রে! নিস্তারিণী মনে মনে একটু ব্যস্ত হ'ল, সে ব'ললে "আর রঙ্গ ক'রতে হবে না, খাও!"

খেলে রবীন মাষ্টার পরম তৃপ্তির সঙ্গে। তারপর নিস্তারিণী নিজ

হাতে পান সেজে দিলে। সে শুলে নিস্তারিণী তাকে পাখা দিয়ে বাতাস ক'রতে লাগলো।

রবীন মাষ্টার কেবলি ভাবতে লাগলো, এ হ'ল কি !

ক'বরেজ ম'শায় যেমন ক'রে যে সব কথা ব'লে গেলেন, তাতে নিস্তারিণী যথেষ্ট ভয় খেয়ে গেলো। কিন্তু তার চেয়ে বেশী ভয় হ'লো রণুর।

ক'বরেজ ম'শায় চ'লে গেলে সে তার মাকে এমন বকুনি দিলে, যা নিস্তারিণী জন্মে কখনও খায় নি। ব'কতে ব'কতে রণু কেঁদে ফেললে। সে ব'ললে, "পাগল যদি হয় বাবা সে তোমারই জন্যে। তুমিই বাবাকে ক্ষেপিয়ে তুলবে—মেরেই ফেলবে।" মনের দুঃখে রণুর আর মুখের কোনও পরদা রইলো না। বাপের উপর মার অত্যাচার ও অনাদরের অনেক পরিচয় সে অনেক দিন চোখে দেখেছে, দেখে দুঃখ পেয়েছে, কিন্তু সঙ্কোচে মুখ ফুটে বলে নি সে কোনও দিন। আজ তার বাপ পাগল হ'য়ে যেতে পারেন শুনে সে প্রাণ খুলে সেই সব কথা একটি একটি ক'রে দৃষ্টান্ত দিয়ে ব'লতে লাগলো; আর বার বার ব'ললে, "তুমিই বাবাকে মেরে ফেলবে।"

ছেলের কথা শুনে নিস্তারিণীর মনে ভারী দুঃখ হ'ল। রাগও হ'ল, কিন্তু রাগটা প'ড়ে যেতে তার মনে হ'ল ছেলে যা ব'লছে তার একটি কথাও মিথ্যে নয়। সে স্বামীর উপর যতখানি চটা-চটি করে, যতটা অনাদর করে তাঁকে, সে সত্যিই তার অন্যায়। আর সেই জন্যই যে স্বামীর এই ব্যাধি, এও হওয়া খুবই সম্ভব। তা ছাড়া ক'বরেজ ম'শায় বিশেষ ক'রে ব'লে গেছেন যে, এখন তার

স্বামীকে বিশেষ যত্ন না ক'রলে আর মেজাজটা খুসী না রাখলে অনিষ্ট হ'তে পারে।

তাই নিস্তারিণী ছেলের কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রলে যে, এখন থেকে সে স্বামীর উপর আর কোনও রাগ ক'রবে না। তাই সে আজ রাত্রে নিজে গিয়ে রেঁধে, আঁচ টেনে উনানের উপর ভাতের হাঁড়ি বসিয়ে রেখে, রবীন মাষ্টারের প্রতীক্ষায় ব'সেছিল। তাই আজ তার এ আদর-যত্ন।

এর পর প্রতিদিনই এমনি তোয়াজ চ'লতে লাগলো। এ সবে রবীন মাষ্টার এতই অনভ্যস্ত যে, সে ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না ব্যাপারখানা কি? কিন্তু এতদিন পরে দাম্পত্য জীবনের আরামের আস্বাদ পেয়ে সে ভারী তৃপ্ত হ'ল।

মাসখানেক পর ক'বরেজ ম'শায রবীন মাষ্টারকে পরীক্ষা ক'রে ব'ললেন যে, বায়ু শান্ত হ'য়ে গেছে—আর কোনও ভয় নেই। কিন্তু ওষুধ এখনো কিছুদিন খেতে হবে। আর যত্নটা ক'রতে হবে।

নিস্তারিণীর মনের ভয়টা কেটে গেল। কিন্তু তবু তার পুরোনো উগ্রমূর্ত্তি ফুটে উঠলো না। তোয়াজটা রীতিমতই চ'লতে লাগলো।

এতে রবীন মাষ্টারের যেন একটা নবজীবন লাভ হ'ল। ঘরে শান্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তার পড়ার উৎসাহ বেড়ে গেল, কাজেই উৎসাহ এলো।

সে ভাবলে যে, এতদিন পর হেডমাষ্টার জানতে পেরেছেন যে, রবীন মাষ্টার Nature study সম্বন্ধে যা ব'লেছিলেন সে-কথাটা ঠিক, আর তাঁর কথাটা ভুল—যদিও রবীন মাষ্টারের কাছে সে-

কথাটা স্বীকার করেন নি তিনি, তবু রবীনের মনে হ'ল যে, এখন হেডমাষ্টার রবীনকে নিশ্চয় একটু শ্রদ্ধার চক্ষে দেখবেন। তাই সে আবার সাহস ক'রে নিজের মতামত প্রকাশ ক'রতে লাগলো। এতদূর তার সাহস বেড়ে গেল যে, সে ক্লাশে ম্যাপ নিয়ে তার নিজের মনের মতন ক'রে হিষ্টরী পড়াতে আরম্ভ ক'রলে। এমন কি একদিন materialistic interpretation of history-র একটা সংক্ষিপ্ত আভাস দিয়ে ফেললে।

সেদিন তার বক্তব্য শেষ ক'রে সে ব'ললে, "এমনি ক'রে যুগে যুগে ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ দল বেঁধে পরস্পর আড়া-আড়ি ক'রতে ক'রতে ইতিহাস সৃষ্টি ক'রেছে। মানব সমাজের এই ক্রম-পরিণতির স্বরূপটাকে ফুটিয়ে তোলাই হ'ল ইতিহাসের সার্থকতা—এতেই ইতিহাস হয় একটা science বা ফিলসফি।"

পেছনে পদশব্দ শুনে রবীন মাষ্টার ফিরে তাকিয়ে দেখে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে একজন ইংরেজ!

তড়্-বড়্ ক'রে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে রবীন মাষ্টার চেয়ারটাকে ফেললে উল্টে, চাদর গেল তার কাঁধ থেকে প'ড়ে। সে কোনও মতে দাঁড়িয়ে সাহেবকে সেলাম ক'রতে ক'রতে বাঁ হাতে চেয়ার সোজা ক'রে বসিয়ে চাদরটা টেনে কাঁধের উপর দিলে।

সাহেব এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিলেন—কাঁপতে কাঁপতে হাত বাড়িয়ে রবীন তার সঙ্গে করমর্দ্দন ক'রলে।

সাহেব ব'ললেন, "God morning। আমি ব্ল্যাক্—স্কুলের ইনস্পেক্টর।"

স্কুল-ইনস্পেক্টার! রবীন মাষ্টার ভয়ানক ঘামতে সুরু ক'রলে। হায় রে অদৃষ্ট! অনেক দিন বাদে আজ সে প্রথম প্রাণ খুলে

স্কুলের পাঠ্যের বাইরে গিয়ে মার্কসের তত্ত্ব বোঝাতে গিয়েছিল, আর আজই কি না ঠিক সেই সময় এসে প'ড়লো ইনস্পেক্টার। বরাতে দুঃখ থাকলে এমনি হয়।

ব্ল্যাক সাহেব বছর পাঁচেক হ'ল বিলেত থেকে এসে, এখানে কয়েকদিন কলেজে প্রফেসরী ক'রে অস্থায়ী ভাবে সম্প্রতি এ-দিক্‌কার ইনস্পেক্টার নিযুক্ত হ'য়ে এসেছেন। ইতিমধ্যেই তাঁর খ্যাতি র'টে গেছে তিনি একটা ভয়াবহ জন্তু ব'লে। অন্য ইনস্পেক্টারের মত ইনি কোনও স্কুল দেখতে আসবার আগে নোটিশ দিয়ে আসেন না। তিনি পৌছবার বড়-জোর আধঘণ্টা আগে হেডমাষ্টার খবর পান। এমনি হঠাৎ অপ্রস্তুত ভাবে এসে প'ড়ে তিনি স্কুলের যা দোষ-ত্রুটি দেখতে পান তার জন্য না কি যার পর নাই গালিগালাজ করেন, এমনি ছিল প্রসিদ্ধি।

মাত্র পোনেরো মিনিট আগে হেডমাষ্টার খবর পেয়ে সাহেবের সন্ধানে লোক পাঠিয়েছিলেন ঘাটে, আর নিজে তাড়াতাড়ি চাপকান চোগা প'রতে বাড়ী গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে ইনস্পেক্টার বাইসিকেল চ'ড়ে স্কুলে এসে সামনেই দেখলেন ফার্ষ্ট ক্লাশে হিষ্টরী পড়াচ্ছে রবীন মাষ্টার। দরজায় দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ তিনি শুনলেন, তার পর ক্লাশে ঢুকে প'ড়লেন।

ক্লাশে ঢুকেই তিনি একটি ছেলেকে ব'ললেন মাষ্টার ম'শায় যা ব'লছিলেন তার একটা চুম্বক ক'রতে। ছেলেটি ভারী মেধাবী। রবীন মাষ্টার যা ব'লেছিল সে তো হুবহু বুঝিয়ে দিলে।

রবীন মাষ্টার এতক্ষণ আশা ক'রছিল যে, সে যা ব'লেছে তা সাহেব শুনতে পায় নি, শুনলেও হালের ইংরেজ, বাঙ্গালা বোঝে নি কিছুই। কিন্তু ছেলেটিকে যখন সে পরিষ্কার বাঙ্গলায় প্রশ্ন ক'রলে আর ছেলেটির

বাঙ্গালা উত্তর শুনে বেশ বুঝলে দেখা গেল, তখন আর রবীন মাষ্টারের আশা-ভরসা বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট রইলো না। সে হাত-পা ছেড়ে অসাড় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

বোর্ডের উপর ম্যাপ টাঙ্গান ছিল। সাহেব জিজ্ঞেস ক'রলেন, "এখন কি জিওগ্রাফী পড়ান হবে?"

শুষ্ককণ্ঠে রবীন মাষ্টার শুধু ব'ললেন, "আজ্ঞে না, হিষ্টরী—রিভিশন।"

সাহেব ছেলেদের পাশে বেঞ্চে ব'সে ব'ললেন, "আচ্ছা আপনি পড়ান, শুনি।"

কি পড়াবে মাথা-মুণ্ডু সে? ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে রবীন ম্যাপের কাছে দাঁড়িয়ে সে ব'ললে—"এই জায়গাটা কি?"

একটি ছেলে ব'ললে, "পাঞ্জাব।"

"এই পাঞ্জাবে প্রথম আর্য্য-সভ্যতার বিকাশ। কিন্তু সে সভ্যতাটা সমস্ত পাঞ্জাবে ছড়িয়ে প'ড়বার আগে আরও পশ্চিম থেকে এসেছিল, তার পরিচয় আমরা পাই কতকটা বেদে, কতক অন্যান্য জায়গায়। পাঞ্জাবের পশ্চিমে এই আফগানিস্তানে, এই পারস্যে এবং তার চেয়েও দূরে—এই যে দেখছো জায়গাটা এইখানে—মিটানী ব'লে একটা রাজ্য ছিল—এখানে, এই আর্য্য-সভ্যতার বিস্তার হ'য়ে ছিল।"

ব'লেই রবীন মাষ্টার মিটানী রাজের সঙ্গে হিটাইটদের সন্ধির যে লিপি পাওয়া গিয়াছে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে গেল।

তার মুখ খুলে গিয়েছিল। তার বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ ক'রতেই সে তার আবেষ্টন ভুলে গেল, ছেলেদের মাঝখানে যে ব'সে আছেন ইনস্পেক্টার, সে কথা ভুলে গেল। সে সহজ ভাবে ব'লে গেল।

সে ব'ললে, "যে জাতি এই আর্য্য-সভ্যতা ভারতে এনেছিল, তাদের আগে এ দেশে কি লোক ছিল না? ছিল। তাদের এঁরা ব'লতেন অনার্য্য! সে অনার্য্য কিন্তু এক জাত নয়, অনেক জাতের লোক ছিল তারা। তাদের ভিতর কেউ কেউ ছিল দারুণ অসভ্য—কাঁচা মাংস খেতো—আবার অনেকে ছিল খুব বেশী সভ্য। এটা খুবই সম্ভব যে, এদেশের অনেকটা স্থানে ছিল একটা মহা সভ্যজাতি। সম্প্রতি এই বেলুচিস্থানে মহেঞ্জোদারো এবং হারাপ্পা নামক দুই জায়গার মাটি খুঁড়ে দেখা গেছে, এমন সব বস্তু যাতে বোঝা যায় যে, এইখানে বৈদিক সভ্যতার আগে বাস ক'রতো এক মহা সভ্যজাতি—যারা আর্য্য নয়।"

ইনস্পেক্টার লাফিয়ে উঠলেন।

রবীন মাষ্টারকে তিনি ব'ললেন, "আপনার স্কুলের কাজ হ'য়ে গেলে আমি আপনার সঙ্গে কথা কইতে চাই। আপনার নামটা কি?"

রবীন ব'ললে।

সাহেব ব'ললেন, "আপনি কি হেড মাষ্টার?"

"আজ্ঞে না, থার্ড মাষ্টার।"

"হুঁ" ব'লে সাহেব সব তাঁর নোট বইয়ে লিখলেন। তারপর জিজ্ঞেস ক'রলেন, "এম-এ আপনি?"

"আজ্ঞে না, আমি বি-এ পাশ ক'রতে পারি নি।"

সাহেব ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে ব'ললেন "silly!" শুনে রবীন মাষ্টারের পিলে চ'মকে গেল। সে বুঝলে ভারী একটা অপরাধ হ'য়েছে তার—কিন্তু কি সে অপরাধ? বি-এ পাশ ক'ত্তে পারে নি, কিন্তু সেটা 'silly' কিসে? শেষে ভাবলে, বি-এ পাশ না ক'রে সে থার্ড মাষ্টারি ক'রছে, সাহেবের মতে বোধ হয় এইটে silly।

ভারী ঘামতে লাগলো সে। এদিকে ততক্ষণ হেড মাষ্টার খবর

পেয়েছেন যে, ইনস্পেক্টার সাহেব এসে রবীন মাষ্টরের ক্লাসে ঢুকেছেন।

মাথায় হাত দিয়ে হেড মাষ্টার ব'ললেন, "এই খেয়েছে! রবীন-বাবুর চেহারা দেখেই তো সাহেবের মেজাজ যাবে খিঁচড়ে।" মনে মনে প্রমাদ গ'ণে হেড মাষ্টার তাঁর মাথায় পাগড়ী প'রতে প'রতে ছুটলেন ফার্ষ্ট ক্লাসে।

ক্লাসে ক্লাসে গিয়ে ব্ল্যাক সাহেব ছোট ছোট খুটিনাটি ধ'রে মাষ্টার-দেরকে তিরস্কার ক'রলেন। হেড মাষ্টারকে দু'তিনটা ধমক লাগালেন।

যে ক্লাসে Nature study হ'চ্ছিল সে ক্লাসে গিয়ে তিনি থ'মকে দাঁড়ালেন। খানিকক্ষণ দেখে তিনি মাষ্টারকে ব'ললেন, "ইনস্পেক্টারের সার্কুলারে কি এমনি করে শেখাবার বিধান আছে?"

মাষ্টার কাঁপতে কাঁপতে ব'ললে, "আজ্ঞে না, ঠিক এমন নেই।"

"তবে তুমি এ প্রণালী পেলে কোথায়?"

কাঁপতে কাঁপতে মাষ্টার তার টেবিল থেকে একখানা জীর্ণ বই তুলে সাহেবের হাতে দিলে।

বইখানার নাম প'ড়ে সাহেব জিজ্ঞেস ক'রলেন, "এই বই কি লাইব্রেরীর, না তোমার নিজের?"

ব'লতে ব'লতেই তিনি পাতা উল্টে দেখলেন, বইয়ে নাম লেখা আছে রবীন মাষ্টারের।

ব'ললেন, "তা হ'লে রবীন মাষ্টারের উপদেশেই তুমি এমনি শিক্ষা দিচ্ছ?"

স্বীকার ক'রতেই হ'ল। মাষ্টার প্রমাদ গণলো। হেড মাষ্টার তাড়াতাড়ি ব'ললেন, "আমি ভারী দুঃখিত স্যর। উনি যে আমাকে গোপন ক'রে ইনস্পেক্টারের সার্কুলারের বাইরে—"

ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে ইনস্পেক্টার ব'ললেন, "That was

stupid. It was neither nature study nor anything !"

হেড মাষ্টার থ' হ'য়ে গেলেন। কি যে 'ষ্টুপিড' ঠিক বোঝা গেল না।

তারপর অফিসে গিয়ে সাহেব কাগজ-পত্র দেখতে লাগলেন। ধমকে ধমকে হেড মাষ্টারের পিলে একদম চ'মকে দিলেন।

মাষ্টারদের 'লিষ্ট' নিয়ে ইনস্পেক্টার প্রথমেই রবীন মাষ্টারের নাম বের ক'রে দেখলেন তার মাইনে চল্লিশ টাকা। সাহেবের মুখে বিরক্তিপূর্ণ ভাব দেখে হেড মাষ্টার বললেন, "এই—অনেক কাল আছেন উনি তাই চল্লিশ টাকা পাচ্ছেন, নইলে আগে তিরিশ টাকাই ছিল।"

একটা আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট মাষ্টারকে চল্লিশ টাকা দেওয়াটা বড় বাড়াবাড়ি বলে সাহেব মনে করেছেন—এই ভেবে হেড মাষ্টার এই ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন।

সাহেব কিন্তু বললেন, "What a shame ! একে অন্ততঃ এক'শো টাকা দেওয়া উচিত।"

হেড মাষ্টার আকাশ থেকে পড়লেন। বিস্ময়টা যখন তার হজম হ'ল তখনি তিনি বললেন, "উনি আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট—"

"Silly ! এ স্কুলে একটি মাত্র শিক্ষক আছে—সে রবীন।"

হেড মাষ্টার তো থ' !

আফিসের কাজ সেরে ইনস্পেক্টার সাহেব বেরিয়ে দেখলেন রবীন মাষ্টার দাঁড়িয়ে আছে, নিতান্ত ভীত, সঙ্কুচিত ভাবে। ইনস্পেক্টার তার দুষ্কার্য্য হাতে-নাতে ধ'রে ফেলে তার নাম টুকে নিয়েছেন, ব'লেছেন "silly !" তারপর আবার সে খবর পেয়েছে যে, Nature study class-এ গিয়ে ইনস্পেক্টারের আইন অমান্য করার সম্পর্কে তার নাম উঠেছে, সেখানে বলেছেন "Stupid !" তার আর সন্দেহ ছিল না যে, তাকে আজই বরখাস্ত ক'রবার জন্যেই সাহেব তাকে দেখা করতে বলেছেন।

সে থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে সাহেবের প্রতীক্ষা ক'রছিল। ব্ল্যাক সাহেব হেসে ব'ললেন, "এই যে আপনি? আপনি এখন বাড়ী যাবেন কি?"

একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে রবীন মাষ্টার ব'ললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, মানে—হুজুরের হুকুম পেলে।"

সাহেব তার বাইসিকেল টেনে নিয়ে ব'ললেন, "চলুন, পথে চ'লতে চ'লতে আপনার সঙ্গে কথা হবে।"

সাহেবের ভাব চরিত্র দেখে রবীনের একটু ভরসা হ'ল। সে ভাবলে, "বরখাস্ত বোধ হয় ক'রবেন না।"

সাহেব তার সঙ্গে কথা কইতে কইতে একেবারে রবীনের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সাহেবের মুখে একটি কথা শুনে রবীন শুধু আশ্বস্ত নয়, উল্লসিত হয়ে উঠলো। সাহেব ব'ললেন যে, রবীনের প্রবর্ত্তিত Nature study-র প্রণালীটাই ঠিক প্রণালী; ইনস্পেক্টারের সার্কুলারের প্রণালী stupid! এ সার্কলে আর কোনও স্কুলেই সত্যিকারের প্রকৃতি পরিচয় হয়ই না, এখানে ছাড়া।

এইবারে রবীন মাষ্টার একেবারে ভীষণ বিব্রত হ'য়ে পড়লো।

তাকে বাড়ীতে ঢুকতে দেখেই রবীন মাষ্টার ব'ললে, "আপনি আমার বাড়ীতে আসবেন?"

সাহেব ব'ললেন, "হ্যাঁ, কোনও আপত্তি আছে কি?"

রবীন ব'ললে, "না, না, আপত্তি কেন থাকবে?—সৌভাগ্য আমার।" কিন্তু মনে মনে সে ভাবতে লাগলো, কি বিভ্রাটেই পড়া গেল—কোথায় বা বসায় সাহেবকে সে, কিই-বা কেমন ক'রে করে।

সাহেব ব'ললেন, "আপনার study কোথায়?"

অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে তাঁর বাইরের ঘর দেখিয়ে রবীন মাষ্টার ব'ললে, "এইখানে।"

সাহেব গট্ গট্ ক'রে ঢুকে অবাক্ হ'য়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন।

যাচ্ছে তাই মলিন সে ঘর। তার ভিতর আছে শুধু একটা ময়লা ফরাস, তার সমস্তটা জুড়ে ব'সেছে পাজা পাজা বই—আর তার চারদিকে মেঝের ওপর তক্তা পেতে কাঁড়ি করা র'য়েছে শুধু বই।

ফরাসের মাঝে যেটুকু ফাঁকা জায়গা ছিল সেখানে ব'সে ব্ল্যাক সাহেব জিজ্ঞেস ক'রলেন, "আচ্ছা মহেঞ্জোদারোর খবর আপনি পেলেন কোথা থেকে? সে তো বেশী দিন বেরোয় নি।"

তখনো মহেঞ্জোদারোর কথা স্কুলের বইয়ে ওঠে নি, সে সম্বন্ধে কোনও বইও লেখা হয় নি।

রবীন দারুণ অস্বস্তি বোধ ক'রছিল প্রবলপ্রতাপ ইনস্পেক্টার সাহেবকে এই দীন আবেষ্টনের মাঝখানে তার মলিন ফরাসে ব'সতে দেখে। কোনও কথা না ব'লে সে অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে তার বইয়ের একটা তাড়া নেড়ে-চেড়ে তার ভিতর থেকে টেনে বের ক'রলে একখানা Illustrated London News—যাতে বেরিয়েছিল স্যর জন মার্শালের এ বিষয়ে প্রবন্ধ।

সাহেব জিজ্ঞেস ক'রে জানলেন যে, এ কাগজ পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে কেনা।

তারপর অনেক কথা জিজ্ঞেস ক'রে ব'ললেন, "মার্কসের সব বই আপনি প'ড়েছেন?"

যা প'ড়েছিল, রবীন মাষ্টার ব'ললে।

সাহেব তখন তার সঙ্গে মার্কসের মতামত নিয়ে তর্ক ক'রতে লাগলেন।

ক্রমে রবীনের আড়ষ্টতা কেটে গেল। এই আলোচনার মাঝখানে এসে সে ভুলে গেল যে, সে ভুবনমোহন স্কুলের থার্ড মাষ্টার আর সাহেব স্বয়ং প্রবল প্রতাপ ইনস্পেক্টার বাহাদুর। সে প্রবল বেগে তর্ক ক'রতে লাগলো।

রবীন মাষ্টারের কথাটা খেয়াল থাকবার কথা নয়, কিন্তু তার বাড়ীতে ইনস্পেক্টার এসেছেন স্কুলের পরে—এ-খবরে অনেকের চাঞ্চল্য হ'য়েছিল। নিস্তারিণীরও হ'য়েছিল। সে তাড়াতাড়ি জমীদার বাড়ী পাঠিয়ে সেখান থেকে চায়ের সরঞ্জাম আর কিছু খাবার আনিয়ে আর নিজের ঘরের তৈরী কিছু জিনিষ দিয়ে চা সাজিয়ে সাহেবের জন্য পাঠিয়ে দিলে রণুর হাতে।

চা পান ক'রতে ক'রতে সাহেব ব'ললেন, "আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে ভারী খুসী হ'লাম। Marxism সম্বন্ধে এমন পরিষ্কার ধারণা আমি খুব কম লোকের দেখেছি।"

প্রসঙ্গক্রমে সাহেব ব'ললেন যে, তিনি ইকনমিক্সের ফার্ষ্টক্লাশ অনার্স পেয়ে বিলেত থেকে পাশ ক'রে এসেছেন এবং তিনি সোস্তালিজমে বিশ্বাসী।

রবীন মাষ্টার তখন যেন হাতে স্বর্গ পেলো। মার্কসের value তত্ত্বের যে সমস্যা সে সমাধান ক'রতে পারে নি, সেই সমস্যাটা সাহেবের কাছে তুলে সে তাকে বোঝাতে ব'সলে। এই নিয়ে আর খানিকক্ষণ আলোচনা ক'রে শেষে সাহেব বইগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগলেন। তার ভিতর চারখানা বই বেছে নিয়ে তিনি ব'ললেন, "এ-বই ক'খানা আমি নিতে পারি কয়েকদিনের জন্যে?"

রবীন হিসেব ক'রলে না যে, কত কষ্টে সে ঐ বই সংগ্রহ ক'রেছে। সে কৃতার্থ হ'য়ে ব'ললে, "নিশ্চয়।" বরং বইগুলি যে জীর্ণ মলিন,

তাইতে সে বড় কুণ্ঠা বোধ ক'রলো। যাবার সময় ইনস্পেক্টার ব'ললেন "আপনি এখানে নিজেকে অপচয় ক'রছেন। আপনি ক'লকাতায় যান না কেন?" মুখ মলিন ক'রে রবীন মাষ্টার ব'ললে, "চেষ্টা ক'রেছিলাম স্যর, সেখানে কোনও চাকরি পেলাম না।" ইনস্পেক্টার ব'ললেন, "আচ্ছা আমি দেখি কিছু ক'রতে পারি কি না আপনার জন্যে। আর দেখুন, হেড মাষ্টারকেও ব'লেছি আমার রিপোর্টেও লিখেছি আপনার মাইনে বাড়াবার জন্যে। যদি ওরা না দেয়, কি অন্ততঃ আশি টাকার চেয়ে কম দেয়, তবে আমাকে জানাবেন।"

ব'লে সাহেব বাইকে ক'রে চ'লে গেলেন।

ইনস্পেক্টার যে সবাইকে গালাগালি দিয়ে রবীন মাষ্টারকে এমন সমাদর ক'রে গেছেন, তাতে সবার চোখ টাটিয়ে উঠলো। ইনস্পেক্টার চ'লে যাবার পর হেড মাষ্টার ব'ললেন, "সালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর। পাগল সাহেব, পাগল না হ'লে তাঁর চোখে লাগে?"

এই কথাই সবাই ব'লতে লাগলো।

কিছুদিন পর ক'লকাতা থেকে এক প্যাকেট বই এলো রবীনের নামে—ব্ল্যাক সাহেবের অর্ডার মোতাবেক—রবীন লোভীর মত সেই বইগুলো খুলে নিয়ে মনের আনন্দে তা প'ড়তে লাগলো।

তার মাইনে বাড়াবার কথা নিয়ে কমিটিতে গবেষণা হ'তে লাগলো। মাস দুই গবেষণার পর কমিটি সিদ্ধান্ত ক'রলেন দশ টাকা বাড়ান যেতে পারে। কিন্তু ব্ল্যাক সাহেব তার পরই বদলী হ'য়ে যাওয়ায় সে সিদ্ধান্ত আর কাজে এলো না।

কিন্তু রবীন মাষ্টারের সে দিকে খেয়াল ছিল না। জীবনে প্রথম সে একটা সত্য সত্য পণ্ডিত লোকের কাছে সমাদর পেয়ে এতটা উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছিল, কৃতার্থতায় তার অন্তর এত পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছিল যে, তারপর

আর তার কোনও জ্ঞানই ছিল না। এই উৎসাহ পেয়ে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বারো খানা চকচকে নূতন বই পেয়ে মনের আনন্দে সে প'ড়ে যেতে লাগলো।

তারপর যখন ব্ল্যাক সাহেব তাকে চিঠি লিখলেন, আর মাসে দু'মাসে একখানা ক'রে চিঠি লিখে তার সঙ্গে ইকনমিক্স ও সোসিয়লজির সমস্যা আলোচনা ক'রতে লাগলেন, তখন আর তার তৃপ্তির সীমা রইলো না।

তার এতদিনের অসার্থকতার বোঝা যেন অঙ্গ থেকে ঝ'রে প'ড়ে গেল, যৌবনের উৎসাহ যেন আবার তার অন্তর ভ'রে দিল।

৯

তারপর পূজোর ছুটিতে যখন সে ক'লকাতা গেল, তখন একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটে' গেল।

'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী'তে ব'সে সে প'ড়ছিল আর নোট ক'রছিল।

যখন শেষ ক'রে সে মুখ তুলে চাইলে তখন সে দেখতে পেল যে, তার সামনে ব'সে একটি মহিলা ঠিক তারই মত কতকগুলি বই নিয়ে প'ড়ছেন —ইকনমিক্সেরই সে সব বই।

কৌতূহলী দৃষ্টিতে মহিলাটির দিকে সে চাইলে। বোধ হয় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বয়স হবে তাঁর—মাথার সামনের চুলগুলো পেকে গেছে। খুব শীর্ণ মুখ। মহিলাটি চোখ তুলে একবার চাইলেন—তাঁর চোখ দেখে মনে হ'ল চেনা-চেনা।

ট্রামে উঠতে গিয়ে রবীন দেখে, মহিলাটি এবং তাঁর সঙ্গী একটি পুরুষ সেই ট্রামেই উঠলেন।

এতক্ষণে একটা কথা খেয়াল হ'ল তার। সেই মহিলা যেখানে

নেমে গেলেন রবীন সেখানে তাঁর পিছন পিছন নামলে। তাঁর সঙ্গী ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে ব'ললে, "একটা কথা জিজ্ঞেস ক'রতে পারি ম'শায় ?"

লোকটি ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে ফিরে চাইলে, ভাবলে, রবীন মাষ্টার এখনি ব'লবে যে, সম্প্রতি তার চাকরি গেছে, কিম্বা দেশে ফিরে যাবার পয়সা নেই, কিম্বা তিন দিন অনাহারে আছে, যেমন ক'লকাতায় প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় পথে ঘাটে এমনি চেহারার লোকেদের কাছে।

রবীন যখন সে কথা না জিজ্ঞেস ক'রে জিজ্ঞেস ক'রলে, "আপনার সঙ্গের মহিলাটির নাম জানতে পারি কি ?" তখন যদিও ভদ্রলোকটির একটা উদ্বেগ কাটলো তবু এ প্রশ্নের স্পর্দ্ধায় সে অবাক হ'য়ে উগ্রস্বরে ব'ললে, "তাতে তোমার কি দরকার ?"

অত্যন্ত অপ্রস্তুত হ'য়ে রবীন মাষ্টার নিতান্ত কাঁচুমাচু হ'য়ে ব'ললে, "ঠিক, বড্ড অপরাধ হ'য়ে গেছে, মাপ ক'রবেন—আমি ভেবেছিলাম, আমি একটি মেয়েকে চিনতাম—মানে পড়াতাম "

মহিলাটি এতক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে শুনছিল, এখন সে হঠাৎ ব'লে উঠলো, "আপনি কি রবিবাবু ?"

রবীন মাষ্টার হেসে ব'ললে, "হ্যাঁ, তা হ'লে আপনিই তড়িৎ !"

মহিলাটি এগিয়ে এসে রবীন মাষ্টারের হাত ধ'রে উৎফুল্ল নয়নে তার মুখের দিকে চেয়ে ব'ললে, "কি সৌভাগ্য ! আপনি এখানে কোথায় আছেন ? কতদিন আছেন ?"

রবীন উত্তরে হড়বড় ক'রে অনেক কথা ব'ললে, তার রক্তে তখন নাচন লেগেছে।

তড়িতের স্বামী তখন ব'ললে, "আমার বেয়াদবীর জন্যে আমায় মাপ ক'রবেন। আমি চিনতে পারি নি।"

রবীন হো-হো ক'রে হেসে ব'ললে, "এ আর বেয়াদবী কি? কথা নেই, বার্ত্তা নেই রাস্তার একটা লোক আপনার স্ত্রীর নাম জানতে চাইলে আপনি তাকে একটা চড় মেরে ব'সলেও কেউ দোষ দিতে পারতো না আপনাকে। আর আপনি চিনবেনই বা কি ক'রে? আমার সঙ্গে তো দেখা হয় নি আপনার কোনো দিন।"

হেসে সুকেশ ব'ললে, "দেখা হয় নি বটে, কিন্তু আমি আপনাকে বড্ড বেশী চিনি, ওঁর কাছে মুখে মুখে আপনার কথা এত বেশী শুনেছি যে, চোখে দেখে আপনার ভিতর নূতন কিছু পাব ব'লে আশা ক'রছি নে—শুধু চেহারা ছাড়া।"

তারা রবীন মাষ্টারকে টেনে নিয়ে গেল তাদের বাসায়। খাইয়ে দাইয়ে গল্পগুজোব ক'রে রাত বারোটায় যখন তড়িৎ নেমে এসে তাকে সদর দরজা থেকে বিদায় দিলে, সেখানে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কথা হ'ল তখন তাদের। শেষে তড়িৎ ব'ললে, "কাল সকালেই আসবেন কিন্তু বাক্স-বিছানা নিয়ে। মাত্র তো আর পোনেরোটা দিন থাকবেন—এর ভিতর এক দণ্ডও আপনাকে ছাড়ছি নে।"

আনন্দে রবীন মাষ্টারের মাথাটা যেন ঘুরপাক খেতে লাগলো। যে পথ দিয়ে সে চ'লতে লাগলো সেটা ক'লকাতার, না দিল্লীর, না লণ্ডনের জিজ্ঞেস ক'রলে তা সে ব'লতে পারতো না। কেন না তার মন চ'লছিল যে পথে তার চারদিকে শুধুই ছিল তড়িৎ—আর কিছুই ছিল না।

সুধু পথ বা বাড়ী ঘর নয়, অনেক কিছুই তার মনের ভিতর থেকে লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল। তার বয়স যে বাহান্ন, আর তড়িতের ছেচল্লিশ তার যে একটি স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যা আছে এবং তড়িতের একটি স্বামী এবং পুত্র-কন্যা আছে—সে সব পুঁছে গেল মন থেকে। তার মনে সুধু নাচতে লাগলো এই কথা যে, সে আর তড়িৎ আবার মিলেছে—

তড়িৎ তাকে মহা সমাদর ক'রেছে। সেই ধ্যানে একেবারে মশগুল হ'য়ে সে হাওয়ার উপর চ'লতে লাগলো।

তড়িৎ তাকে বলেছিল যে, সে এবং তার স্বামী দু'জনেই দিল্লীতে চাকরী করে। সুকেশ ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টে কাজ করে। তড়িৎ সেখানকার মেয়েদের কলেজের অধ্যাপক। তারা কয়েকমাসের ছুটি নিয়ে ক'লকাতায় এসেছে। বড ছেলে সঙ্গে আছে আর সব ছেলে-পিলেরা দেশে গেছে তড়িতের বাপ-মার সঙ্গে।

তড়িৎ পড়ায় ইকনমিক্স। শুনে রবীন মাষ্টার ভারী আশ্চর্য্য হ'যে গেল—সে ব'ললে, "আশ্চর্য্য তো—আপনিও ইকনমিক্স চর্চ্চা করেন আমারই মত!"

তড়িৎ সে কথার উত্তরে যা ব'লেছিল তা অনেক দিন পর্য্যন্ত রবীন মাষ্টারের মনে কিন্নরের সঙ্গীতের মত মধুরস্বরে ঝঙ্কারিত হ'য়েছিল, তড়িৎ হেসে ব'লেছিল, "আমার মনের গতি যে আপনার মতই হবে সে আর এত আশ্চর্য্য কি? আমার মনের সুর যে আপনিই বেঁধে দিয়েছিলেন। তার পর যেই সে যন্ত্র বাজাক্ তাতে ফুটবে আপনারই সুর!"

ওঃ। এত আদর কি সহ্য করা যায়?

পরের দিন রবীন তল্পী-তল্পা নিয়ে তড়িতের অতিথি হ'ল। সেদিন কথায় কথায় যুদ্ধের পর থেকে জগতে যে অর্থ-সমস্যা উপস্থিত হ'য়েছে সে কথা উঠেছিল। আলোচনাটা আরম্ভ হ'ল সুকেশের একটা কথায়। রবীন তাতে কথায় কথায় এমন গোটা কযেক কথা ব'ললে তাতে বোঝা গেল যে, এ সম্বন্ধে আধুনিক যত আলোচনা হ'য়েছে রবীন তার সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত। তারপর সেই সব আলোচনা ক'রতে ক'রতে রবীন তার নিজের আইডিয়া অনেকখানি ব'লে ফেললে। Planned

Economy-র একটা আভাস দিলে। আর সে তার গ্রামের ভিতর ছোট-খাট ক'রে নিয়ত ধন-সৃষ্টির যে একটা স্কীম ক'রেছিল তার পরিচয় দিয়ে গেল।

তার কথা শুনে সুকেশ বুঝলে রবীন পণ্ডিত এবং তার পাণ্ডিত্য সব ধার করা নয়, নিজে ভাববার এবং নূতন সৃষ্টি ক'রবার শক্তি তার আছে। আর তড়িৎ যেন আনন্দে, গর্ব্বে একেবারে ফেটে প'ড়তে লাগলো।

তড়িৎ ব'ললে, "বলি নি আমি তোমায় যে, ওঁর মত পরিষ্কার মাথা আমি কারও দেখি নি? আপনি ঠিক সেই আছেন—wonder-ful!"

মনোজ্ঞ লজ্জায় রবীন অধোবদন হ'য়ে গেল।

সুকেশ ব'ললে, "আপনি ক'রছেন এই স্কীম অনুসারে কাজ? কেমন কাজ হ'চ্ছে?"

মুখ অন্ধকার ক'রে রবীন ব'ললে, "কাজ কিছুই ক'রতে পারি নি। বরং গ্রামের লোকে সবাই আমাকে পাগলা গারদে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রছিল।"

সুকেশ হো হো ক'রে হেসে উঠল, কিন্তু তড়িৎ করুণ সহৃদয়তার সহিত ব'ললে, "আহা! আপনার বড্ড দুঃখ হ'য়েছিল নিশ্চয়।"

ম্লান হাসি হেসে রবীন উত্তর ক'রলে, "ও সব আমার গা-সওয়া হ'য়ে গেছে।"

তড়িৎ একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে ব'ললে, "আপনি তবু কেন ঐ এঁদো গাঁয়ে প'ড়ে থাকেন মিছে?"

রবীন ব'ললে, "কোথায় যাব? ক'লকাতায় একটা চাকরির চেষ্টা ক'রেছিলাম। কিন্তু এখানে আমার মত বি-এ ফেলের অন্ন জোটা ভার।"

সুকেশ ব'ললে, "ঠিক আপনার মত বি-এ ফেল আছে কি কোথাও? আমার তো মনে হয় না।"

তড়িৎ ব'ললে, "তা ছাড়া কেমন ক'রে আসবেন আপনি? আপনার স্কুল আছে সেখানে। সে স্কুল যে আপনার প্রাণ। এখন কেমন চ'লছে সে স্কুল?"

আর একটা বড় ব্যথার জায়গায় ঘা প'ড়লো রবীনের। তড়িতের কাছে সে-কালে রবীন যে চিঠি লিখতো তার ভিতর স্কুলের কথা বোঝাই থাকতো। কেমন ক'রে স্কুলের প্রতিষ্ঠা হ'ল, কত কষ্ট ক'রে তোড-জোড় সংগ্রহ হ'ল, কবে কত ছেলে এলো; কি আদর্শ, কি স্বপ্ন তখন রবীনের মাথায় খেলতো স্কুল সম্বন্ধে, শিক্ষার নূতন নূতন পদ্ধতি সম্বন্ধে রবীন কবে কি ক'রেছে—এ সব কথা তড়িৎ তন্ন তন্ন ক'রে জানতে পেরেছিল রবীনের চিঠি ঘেঁটে, তাই তড়িৎ জানতো যে, রবীনের এ স্কুল সাধারণ স্কুলের মত নয়। রবীন বড় বড় আদর্শ নিয়ে নূতন প্রণালীতে তার গাঁয়ে গ'ড়ে তুলবে এক নতুন Rugby, টমাস আর্ণল্ডের মত। সে সব আদর্শ যে কোথায় উড়ে গেছে, সে স্কুল যে আর এখন রবীনের স্কুল মোটেই নয়, সে শুধু তার থার্ড মাষ্টার—হিষ্টরী আর হাইজিন পড়ায়—সে সব কথা মুখ ফুটে ব'লতে রবীনের লজ্জা হ'ল।

সে ব'ললে, "বেশ চ'লছে।"

"এখন কত ছেলে আছে সেখানে?"

"তিন শোর উপর?"

"আচ্ছা—নীচু ক্লাসে এখন কোন্ প্রণালীতে পড়াচ্ছেন? Dalton planএ না আপনার ফ্রেবেলের সেই সাবেক প্রণালীতে?"

সুকেশ ব'ললে, "তোমরা ব'সে গল্প কর, আমি একবার শ্যামবাজার ঘুরে আসি।"—ব'লে সে চ'লে গেল।

সুকেশ চ'লে যাওয়ায় রবীনের সঙ্কোচটা একটু ক'মে গেল। সে তখন মলিন মুখে ব'ললে, "ফ্রেবেলও নয়, মন্টেসরীও নয়, ডালটন তো নয়ই। আমাদের প্রণালীটি একটি অদ্ভুত খিচুড়ী—আমাদের ইনস্পেক্টার প্রভুর অপূর্ব্ব সৃষ্টি।"

তড়িৎ অবাক হ'য়ে গেল। রবীনের আদর্শ থেকে এতটা পতনের কথা শুনে সে এতগুলো প্রশ্ন ক'রে গেল যে, শেষ পর্য্যন্ত রবীনের প্রকাশ ক'রতেই হ'ল যে, স্কুলের কার্য্য-প্রণালীর উপর তার কোনও হাত নেই, সে শুধু পড়িয়ে যায় যথানির্দ্দিষ্ট।

কথাটা তড়িতের বুকে শেলের মত বাধলো। তার কাছে রবীন প্রাণ খুলে তার সব স্বপ্নের কথা, সব আশা-ভরসার কথা লিখেছিল। এই স্কুলটাকে কেন্দ্র ক'রে কত স্বপ্ন যে রবীনের মনে ছিল তা সে জানতো, আর জানতো যে, সেই সব স্বপ্নের সঙ্গে রবীনের সুখ-দুঃখ কত নিবিড়ভাবে জড়িত। তাই সে এ সংবাদ শুনে একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। কোনও কথা ব'লতে তার সাহস হ'ল না। সে অন্য কথা পাড়লো।

বেলা হ'ল দেখে তড়িৎ রবীনকে স্নান ক'রতে ব'লে, ব'ললে, "আপনার ব্যাগের চাবীটা আমায় দিন।"

রবীন ব'ললে, "চাবী তো নেই ব্যাগের।"

"তাই না কি!"—ব'লে তড়িৎ ব্যাগটা খুলতে গেল।

মহা আপত্তি ক'রে রবীন তাকে বাধা দিতে গেল। তড়িৎ ব'ললে "সরুন ব'লছি, নইলে ভাল হবে না কিন্তু।"

ব্যাগ খুলে তড়িৎ দেখলে তাতে আছে কয়েকখানা পুরোনো বই—

এগুলো রবীন কিনেছে, আর তার কয়েকটা নোটের খাতা, আর—একখানি ময়লা কাপড় ও একটা ফরসা জামা।

রবীনের দিকে চেয়ে সে ব'ললে, "এই না কি আপনার সব কাপড়-চোপড়!"

রবীন লজ্জায় মাথা নীচু ক'রে রইলো।

রবীনের থলি খুলে তড়িৎ দু'টো টাকা বের ক'রে নিয়ে তক্ষণি বড় ছেলেকে ডেকে তার হাতে লুকিয়ে পাঁচটা টাকা দিয়ে বাইরে পাঠালে। ছেলে বাইকে চ'ড়ে বেরিয়ে গেল। মিনিট পনেরোর ভিতর সে একজোড়া ধোয়া মিলের ধুতি, একজোড়া তোয়ালে, একজোড়া গেঞ্জি আরও সব জিনিষ নিয়ে এলো। সেই কাপড় ও গেঞ্জি এবং ব্যাগের ভিতরকার সেই ফরসা জামাটা নিয়ে তড়িৎ রবীনকে বাথরুমের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল এবং নিজে সেখানে সেই জামা কাপড় রেখে এলো।

এর পর তড়িৎ রবীনকে তাড়িয়ে বেড়াতে লাগলো। নাপিত ডেকে সে তার মাথার চুল কাটালে; দাড়ি ছাঁটালে; চেয়েছিল একেবারে কামিয়ে ফেলতে, কিন্তু ভেবে দেখলে অতটা সইবে না। স্নানের পর চিরুণী-বুরুশ এনে তাকে সে দিলে চুল আঁচড়াতে। রবীন অমনি যেমন তেমন ক'রে আঁচড়ে রাখে দেখে, একদিন সে নিজেই তার চুল-দাড়ি আঁচড়ে রীতিমত সুসভ্য চেহারা ক'রে দিলে। এতে রবীন এতই কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হ'য়ে প'ড়েছিল যে, তার পর, পাছে আবার তড়িৎ এসে আঁচড়াতে বসে, তাই সে নিজেই ভাল ক'রে আঁচড়াতে লাগলো।

দরজির দোকানে তাগাদা অর্ডার দিয়ে তৈরী হ'ল রবীনের ছ'টা পাঞ্জাবী, আর এল একজোড়া ধুতি। তার দাম তড়িৎ বের ক'রলে রবীনের মণিব্যাগ থেকেই কিন্তু তার সঙ্গে তড়িতের যে কতটাকা

গেল তা রবীন জানলো না। তাতে সে ব্যাগের গর্ভ এত ক্ষীণ হ'য়ে উঠলো যে, রবীনের বুক কেঁপে উঠলো। চল্লিশটে টাকা সে বহু কষ্টে সঞ্চয় ক'রে এনেছিল। এসেছিল সে থার্ড ক্লাশে, থাকতো একটা হোটেলে যেখানে দিন ছ'আনায় চলে। বাকী টাকা সে রেখেছিল বই কিনবে ব'লে। এই সব অপব্যয়ের ফলে সে বুঝতে পারলে যে, বই কেনা আর হবে না।

তাতে বুক কাঁপলো বটে রবীনের, কিন্তু অপূর্ব্ব কৃতার্থতায় ভ'রে উঠলো তার চিত্ত। তড়িতের এই সেবা পেয়ে তার বার বারই মনে হ'ল নিস্তারিণীর কথা। নিস্তারিণী না হ'য়ে তড়িৎ যদি তার স্ত্রী হ'ত, তবে তার জীবনে কি না হ'তে পারতো!

দুপুর বেলায় খেয়ে দেয়ে তড়িৎ তাকে নিয়ে 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী'তে যেতো। রবীন সঙ্গে যায় দেখে, সুকেশ আর তড়িতের সঙ্গে যায় না। তার যেতে হ'ত সুধু তড়িৎ একলা বেরুতে পারে না ব'লে। লাইব্রেরীতে সারাদিন কাজ ক'রে তারা বাড়ী ফেরবার বেলায় ঘুরে-ফিরে আসতো। রবীন তড়িৎকে দীক্ষিত ক'রে ফেল্‌লে পুরোনো বইয়ের দোকানে বই ঘাঁটার মন্ত্রে। সেখানে অনেক সময় এত ভাল ভাল বই এত সস্তায় পাওয়া যায় দেখে অবাক্ হ'য়ে গেল তড়িৎ। অনেকগুলো বই কিনে ফেল্‌লে সে, নতুন বইও কতক কিনলে।

বাড়ী ফিরে তড়িৎ নিজে রান্না করে। তার পর ব'সে গল্প-গুজব করে। রাত্রে খাওয়ার পর অনেক রাত পর্য্যন্ত তাদের গল্প-সল্প হয়!

রবীনের অন্তর যেন আনন্দে লাফাতে লাগলো। জীবনে যে এত সুখ, এত সৌভাগ্য, এত আরাম, এত আনন্দ সম্ভব তা সে কোন দিনও জানতো না।

একটি একটি ক'রে তার এ-কয় বৎসরের জীবনের সবগুলি কথা রবীন প্রকাশ ক'রে ফেললে তড়িতের কাছে।

একদিন গভীর রাত্রে রবীনের দুঃখের জীবনের কাহিনী শুনতে শুনতে তড়িতের চোখ ভ'রে গেল জলে!

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে ব'ললে, "এ সবের জন্য দায়ী আপনি।"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রবীন তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

তড়িৎ তিরস্কার ক'রে ব'ললে, "আমি তো আপনার কাছে কোনো কথা লুকোই নি কোনো দিন, মনের ভাব প্রকাশ ক'রতে কিছুই বাকী রাখি নি। শেষে বি-এ পাশ ক'রবার পর যে চিঠি লিখেছিলাম মনে আছে? সে চিঠির কি জবাব দিয়েছিলেন আপনি?"

কি জবাব সে দিয়েছিল সে-কথা রবীনের খুব মনে ছিল। এ-কয়-দিন ব'সে ব'সে সে শুধু সেই কথাই ভাবছিল। যদি সে সেই জবাব না দিয়ে অন্য জবাব লিখতো! যদি লিখতো 'আমি তোমাকে বিয়ে ক'রতে চাই।' তবে, তার জীবন কি ধন্যই হ'য়ে যেতো!

আমতা আমতা ক'রে রবীন ব'ললে, "আর কি জবাব দেব?"

বেশী তীব্রতার সহিত তড়িৎ ব'ললে, "কি জবাব দেব? আপনি সত্যি বুঝতে পারেন নি যে, আমি কি জবাবের আশা ক'রেছিলাম? বোঝেন নি আমি ভাবছিলাম—কাকে পেলে আমার জীবন সার্থক হবে?"

রবীন ব'ললে, "হ্যাঁ, তা না, ঠিক বুঝি নি—কিন্তু ভেবেছিলাম তাই।"

"তবে? তবে, ঐ উত্তর দিলেন আপনি—আপনি কোন্ প্রাণে? জানেন, আপনার সেই চিঠি প'ড়ে আমি সাত দিন ধ'রে কেঁদেছিলাম।"

রবীন মাষ্টারের মনে যেন সহস্র বৃশ্চিক দংশন ক'রে গেল।

সে সুধু ব'ললে, "আমার অদৃষ্ট!" তার পর ব'ললে, "সত্যি কথা ব'লবো? আপনার বি-এ পাশ ক'রবার আগে অনেকবার ভেবেছিলাম আপনার কথা··· বিয়ে ক'রবার সঙ্গতি তখন ছিল না, কিন্তু ভেবেছিলাম যদি সঙ্গতি হয় তবে আপনাকে সে-কথা লিখবো। আপনি বি-এ পাশ ক'রবার পর ভাবলাম, এটা আমার পক্ষে ভয়ানক স্পর্দ্ধার কথা হবে।"

চোখের উপর রুমাল চেপে ধ'রে তড়িৎ উঠে শুতে গেল।

রবীন বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো এই সব কথা। দুঃখ তার হ'ল খুবই, কিন্তু সব দুঃখ ছাপিয়ে তার একটা অদ্ভুত আনন্দ হ'ল যে' আজ এতদিন পরেও তড়িৎ তাকে ভালবাসে, আর সে কথা সে যত স্পষ্ট ক'রে পারে প্রকাশ ক'রেছে।

কোনও লাভ নেই তাতে। তাদের কারও জীবন এতে ঢেলে সাজা যাবে না। এখন তারা তাদের জীবনের দু'দিকে যত বন্ধন আছে সব ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিয়ে এ ভালবাসা সম্ভোগ ক'রতে পারবে না—সে সম্ভোগের কল্পনা মাত্রও রবীনের মনে এলো না, তবু একটা অপূর্ব্ব তৃপ্তি, একটা লোকাতীত আনন্দে তার সমস্ত অন্তর আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল এ অনুভূতিতে। রবীন ভাবলে এই সত্যি ভালবাসা। অথচ সমাজের ইতিহাসে এই ভালবাসাটাকে একেবারে বাতিল ক'রে দিয়ে গ'ড়ে তুলেছে—বিবাহ।

পরের দিন রবীনের ফিরবার কথা। দু'দিন বাদে ভাই ফোঁটা, ভাই ফোঁটার পরের দিন স্কুল খুলবে। তাই ভাই ফোঁটার আগের দিন যেতেই হয়। যেতে তার মন স'রতে চাইলো না, কিন্তু যেতে যে হবেই!

তড়িৎ কিন্তু বাগড়া দিলে যে, ভাই কোঁটার আগে তার কিছুতেই যাওয়া হবে না। সে ব'ললে, "একদিন ছুটি নিন।"

এ কথা ভাবতে রবীনের ভব হ'ল। একটি দিন ছুটি চাইলেও যে হেড মাষ্টার তাকে কি নাকাল ক'রবেন তার ভয়ে সে অস্থির হ'য়ে উঠলো।

তারপর তড়িৎ ব'সলো টাইম-টেবল নিয়ে হিসেব ক'রতে। হিসেবে দেখা গেল যে, ভাই কোঁটার দিন বিকেলের দিকে একটা ট্রেণে গিয়ে তিন জায়গায় চেঞ্জ ক'রে বাকী রাস্তাটা মোটরে গেলে রবীন গিয়ে বাড়ী পৌঁছুতে পারে, টায়টোয় স্কুলের টাইমের এক ঘণ্টা আগে।

এর পর আর আপত্তি চ'ললো না।

মহা আড়ম্বর ক'রে তড়িৎ রবীনকে ভাই কোঁটা দিলে। আর কোঁটার সঙ্গে সঙ্গে দিলে দু'জোড়া ধুতি' দু'টো পাঞ্জাবী, আর দু'খানা চাদর।

খাওয়া-দাওয়ার পর যখন রওনা হবে তখন রবীন ব'লল, "এইবার আমার ব্যাগটা—"

তড়িৎ ব'ললে, "সেটা পাবেন না। ওটা থাকবে আমার কাছে। রবীন দেখতে পেলো যে, তার সঙ্গে গাড়ীতে উঠছে ঝক্‌ঝকে চামড়ার নূতন দু'টো স্যুটকেশ। একখানার ভিতর আছে তার কাপড়-চোপড় এবং একখানার ভিতর, তার স্ত্রী ও ছেলেপিলের জন্য কাপড়-চোপড়, আর এতদিন তড়িৎ তার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে যত কিনেছিল—সে সব বই।

দেখে রবীনের চোখের জল উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো।

তড়িৎ তাকে গড় হ'য়ে প্রণাম ক'রে উঠে কেবল চোখের জল মুছতে লাগলো।

খুব মৃদুস্বরে সে ব'ললে, "কোনও দিন ভাবি নি যে, আপনার সঙ্গে

দেখা হ'লে এত দুঃখ পাব। এত দুঃখে আছেন আপনি স্বপ্নেও ভাবি নি—ভাবতে বুক ফেটে যায় আমার।"

চোখ মুছতে মুছতে রবীন গিয়ে গাড়ীতে উঠলো।

১০

রবীন মাষ্টার যখন গাঁয়ে ফিরে এলো তখন লোকে দেখলে, তাকে চেনাই দায়। বেশ দুরস্ত চুল-দাড়ি তার, পরণে সেই ছেঁড়া-ময়লা ছিটের কোট আর তার চেয়ে ময়লা ধুতির বদলে পরিষ্কার সাদা ধুতি, পাঞ্জাবী ও চাদর—দেখে সবাই অবাক্ হ'য়ে গেল।

কিন্তু বাইরে তার যা পরিবর্ত্তন, তার ভিতরের পরিবর্ত্তনের কাছে সে কিছুই নয়। তার জীবন এত দিন ছিল পুঞ্জীভূত ব্যর্থতার বোঝা; —প্রথমে ব্ল্যাক্ সাহেব এবং তার পর, তার চেয়েও বেশী—স্বয়ং তড়িৎ ও তার স্বামী তার পাণ্ডিত্যের আদর ক'রে তার আত্মাদর, সাহস ও স্ফূর্ত্তি এতটা বাড়িয়ে দিয়েছিল যে, তাতে যেন রবীন মাষ্টারের মনে নব-জীবনের সঞ্চার হ'য়েছিল। সব ব্যর্থতা তার ধুয়ে-পুঁছে গেল, তার এই পরম সার্থকতার আনন্দে।

ঊষর মরুভূমির মত নীরস, তপ্ত, জ্বালাময় ছিল তার জীবন। একদিন যে এই মরুর বুকের উপর দিয়ে স্নিগ্ধ প্রেম-স্রোত ব'য়ে গিয়েছিল, তার স্মৃতিটুকুও বুঝি ছিল না তার। সে ভেবেছিল, বাহান্ন বছর কেটে গেছে তার এমনি শুকনো কাঠের মত, আর বাকী ক'টা দিনও এমনি জ্বালা স'য়ে স'য়েই কেটে যাবে। মাঝে মাঝে তার বুকের ভিতর হু হু ক'রে উঠতো—মরুভূমিতে বালির ঝড়ের মত—এই চিন্তা যে, জীবনে সে স্নেহ পেল না কারও কাছে, শুধু

গাধার খাটুনি খেটে গেল। কিন্তু বেশীর ভাগ সময় তার মনে থাকতো স্মধু একটা স্থির, স্তব্ধ, শুষ্ক, উগ্র তাপ যা তার অন্তরের তলা পর্য্যন্ত ঝাঁজরা ক'রে দিত।

কিন্তু আজ তার জীবনের চেহারা বদলে গেছে এই ভেবে যে, একজন তাকে এত ভালবাসে। হোক্ সে দূরে—হোক্ সে পরের—কোনও প্রকাশ সে ভালবাসার নাই থাকুক—তবু যৌবনের গোড়ায় যে ভালবাসায় তার প্রাণ শীতল হ'য়েছিল, সে ভালবাসা এখনো তেমনি সরস হ'য়ে তার অলক্ষ্যে তার ধ্যান ক'রছে—এ কথা ভাবতে পুলকে তার সারা অন্তর কেঁপে উঠলো,—আনন্দের একটা লঘু হিল্লোল ব'য়ে গেল তার প্রাণের ভিতর দিয়ে।

কি অপূর্ব্ব সে ভালবাসা তড়িতের। তার ভিতর ফেনা নেই, ক্লেদ নেই—স্নিগ্ধ পবিত্র নির্ম্মল সে—কোন গ্লানিও তাতে নেই!

রবীন বিবাহ ক'রে সুখ পায় নি, কিন্তু পনেরো দিন তড়িতের সঙ্গে বাস ক'রে এসে রবীন বুঝতে পেরেছে, তড়িৎ সুখ পেয়েছে সুপ্রচুর। দেবতার মত স্বামী তার, চাঁদের মত ছেলে-পিলে, অভাবের চিহ্ন নেই তার সংসারে, ছবির মত পরিচ্ছন্ন সুন্দর তার গৃহস্থালী—সুখের উপাদানের অভাবই নেই তার। শুধু তাই নয়, স্বামীকে সে ভালবাসে। ছেলে-পিলেদের নিয়ে সে তন্ময়! তবু—তবু তড়িৎ তাকে ভালবাসে। এমন ভাল সে বাসে যাতে স্বামীর প্রতি ভালবাসায় কোনও বাধা হয় না। এ একটা পবিত্র স্বর্গীয় প্রীতি যার গরীমার সীমা নেই, যার ভিতর ভাগাভাগি নিয়ে মারামারি হ'তে পারে না, কেন না সাগরের জলের মত তার সে স্নেহের অন্ত নেই, লক্ষ লোক তাতে ভাগ বসালেও তার এক কোঁটা ক'মে যায় না।

তড়িতের ভালবাসার এই অপূর্ব্বত্ব মুগ্ধ তন্ময় হ'য়ে সে ধ্যান ক'রে,

ধ্যান ক'রতে ক'রতে রসে ভরে যান তার চিত্ত, মরুভূমির সিকতা ভেদ ক'রে ফুলে ওঠে মন্দাকিনীর ধারা, আর তার শীর্ণ উপোষিত যৌবন তার বাহান্ন বছরের শুষ্কতা ভেদ ক'রে পত্র-পুষ্পে ভ'রে দেয় তার চিত্ত!

জীবনের একটা মানে হ'য়েছে তার, সার্থকতার স্বাদ সে পেয়েছে—পেয়ে সে কৃতার্থ হ'য়ে গেছে। নূতন উৎসাহ, নূতন উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ হ'য়ে গেছে তার চিত্ত, সাহসে ভরে গেছে তার প্রাণ। আশাশূন্য যে নিরর্থক জীবন সে বহন ক'রে এসেছে এতদিন—সে যেন কোথায় লুকিয়ে গেল; তিরিশ বছর আগের সেই রবীন মাষ্টার আবার যেন চাঙ্গা হ'য়ে কাজে লেগে গেল।

নতুন কিছু করবার কল্পনা তার মনে বরাবরই জেগে উঠতো কিন্তু তার চেষ্টা সে ছেড়ে দিয়েছিল বহুদিন। ভাবতো সে, কি হবে ছটফট্ ক'রে? হবে না তো কিছুই, তবে কেন এ ধড়ফড়ানি। ক'টা দিনই বা আছে তার বাকী, এতদিন যেমন কেটেছে এ কয় বছরও তেমনি কেটে যাবে।

কিন্তু তার এ নবজীবন লাভের সঙ্গে সঙ্গে নতুন সঙ্কল্পগুলো আবার মাথা খাড়া ক'রে উঠলো। তড়িতের সংসারে পনেরো দিন বাস ক'রে এসে তার মনে হ'য়েছিল যে, অতটা স্বচ্ছলতার সংসার তার হবে না কোনও দিন, কিন্তু তার যে সামান্য সম্বল তা' দিয়েও সে যেমন থাকে তার চেয়ে অনেক পরিচ্ছন্ন হ'য়ে বাস ক'রতে পারে। তড়িৎ তাকে এ সম্বন্ধে অনেক উপদেশও দিয়েছিল, রবীন যখন কাপড়-জামা ছাড়তো, তড়িৎ তখনি তা' নিয়ে সাবান দিয়ে কেচে শুকোতে দিত। কাজেই এক বিন্দু ময়লা তার কাপড়ে থাকতো না কোন দিন। বাড়ীর দরজা-জানালা, তৈজসপত্র যা কিছু ছিল,

তড়িৎ নিজে এবং তার স্বামী নিজহাতে রোজ ঝাড়ন দিয়ে ঝেড়ে পুঁছে নির্ম্মল ক'রতো। দেখে রবীনের মনে হ'ল এই সামান্য কাজ ক'রে পরিচ্ছন্ন ভাবে থাকা তো তার পক্ষেও সম্ভব। শুধু সম্ভব নয়, তার মনে হ'ল এ তার কর্ত্তব্য। নইলে তড়িতের ভালবাসার যোগ্য সে হবে না কিছুতেই। তার জীবনের, তার দেহ-সৌষ্ঠবের, তার সঙ্কল্পে, তার চেষ্টায়, সবারই একটা নতুন দাম হ'য়ে গেল আজ!

তা' ছাড়া তড়িৎ ব'লেছিল Dalton Plan-এর কথা। শিক্ষার প্রণালী নিয়ে অনেক কথা হ'য়েছিল তার সঙ্গে। মনে হ'ল, কেন সে ছেলেদের নিয়ে সেই প্রণালীতে কাজ ক'রতে চেষ্টা ক'রবে না? হেড মাষ্টারের এক ধমকী খেয়ে সে কেনই বা স্কুলের হিত চিন্তা ছেড়ে দিয়ে হাত-পা গুটিয়ে ব'সে আছে? এ স্কুল তো তারই কল্পনা, সে কেন একে গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা ক'রবে না নিজের মনের মত ক'রে? মনে প'ড়লো তার যে' একদিন সে দু'টি শিক্ষককে সামান্য দু'টো কথা ব'লে দিয়েছিল। তাতেই তাদের শিক্ষার রকম ব'দলে গেছে এত, যে ব্ল্যাক সাহেব তাদের কাজের তারিফ ক'রে গেছেন। এমনি ক'রে সে কেন সব শিক্ষককে শিক্ষা দিয়ে ছেলেদের উন্নতির চেষ্টা ক'রবে না?

এও তার মনে হ'ল যে, গ্রামের আর্থিক উন্নতির জন্যে যে প্ল্যান সে ক'রেছিল সেটা ভয় পেয়ে ছেড়ে দিয়ে সে অন্যায় ক'রেছে।

রেলে যেতে যেতেই এমনি সব নানা কথা তার মনে হ'তে লাগলো, অনেকগুলো সঙ্কল্প গ'ড়ে নিয়ে সে বাড়ী ফিরে এলো।

রাস্তায় যে তাকে দেখলে, সে-ই তার চেহারার পরিবর্ত্তনের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো এক দৃষ্টে। কেউ কেউ তা' নিয়ে দু'টো রসিকতাও ক'রলে।

বাড়ীতে এসে তার চেহারা দেখে নিস্তারিণী চ'মকে গেল প্রথম, তারপর হেসে উঠে ব'ললে, "ইস্, এবার যে ক'লকাতা গিয়ে বাবু হ'য়ে এসেছ দেখছি।"

হেসে রবীন মাষ্টার উত্তর ক'রলে, "হ্যাঁ গো, আর তোমাকেও বাবু ক'ববাব জোগাড় নিয়ে এসেছি।"

তারপর দু'টো স্যুটকেশ আসতে দেখে নিস্তারিণী ব'ললে, "এ গুলো কার ?"

হাসিমুখে বিজয়-গর্ব্বে রবীন মাষ্টার ব'ললে, "আমারই।"

নিস্তারিণীর মুখে উদ্বেগের ছায়া প'ড়লো। সে ভাবলে রবীন মাষ্টারের ক'লকাতা গিয়ে কি পাগলামীর ঝোঁক হ'য়েছিল না-কি ?—টাকাগুলো না-জানি কি তছ্‌নছ্‌ ক'রে এসেছে। সে জিজ্ঞেস ক'রলে "কত হ'য়েছে এ দু'টো ?"

খুব হেসে রবীন মাষ্টার ব'ললে, "কিছুই না, এ দু'টো প্রেজেন্ট পেয়েছি।"

"প্রেজেন্ট ! সে কি ?"

"উপহার !—ব'লছি সব, আগে খুলে দেখাই।"

ভুল ক'রে সে খুলে ব'সলো প্রথমে বইয়ের বাক্সটা। সে বাক্স ঠাসা বই দেখে নিস্তারিণী চোখ কপালে তুলে ব'ললে, "এত বই তুমি কিনেছ ? কতগুলো টাকা জলে ফেলেছ শুনি।"

"এক পয়সাও নয়, এ সবই প্রেজেন্ট।"

তারপর কাপড়ের বাক্স খোলা হ'ল। তা' থেকে রবীনের নিজের কতকগুলো কাপড়-জামা-চাদর বের হ'ল, নিস্তারিণী একটু শ্লেষের সুরে ব'ললে, "এও কি 'প্রেজেন্ট' না-কি ?"

রবীন একটু ঢোঁক গিলে ব'ললে, "প্রায়।"

তারপর বের হ'ল নিস্তারিণীর জন্যে শাড়ী, সেমিজ, ব্লাউজ, আর ছেলেদের প্রত্যেকের জন্যে কাপড় বা জামা।

শান্তিপুরে শাড়ীখানা এবং সেমিজ-ব্লাউজ দেখে নিস্তারিণী হাসিমুখে ব'ললে, "এ সব কার জন্যে?"

রবীন ব'ললে, "তোমার জন্যে।"

হেসে গ'লে প'ড়ে নিস্তারিণী ব'ললে, "দূর। পাগল না-কি তুমি? এ সব পরবার বয়েস আছে আমার?"

"যথেষ্ট আছে। যে এ সব দিয়েছে সে তোমার চেয়ে বড়, আর সে এর চেয়ে ঢের জমকাল শাড়ী-জামা পরে।"

"কে সে?"

কথাটা ব'লতে হঠাৎ রবীনের একটু বাধ বাধ ঠেকলো, যথাসম্ভব নির্ব্বিকার চেহারা ক'রে সে ব'ললে, "একটি মেয়েকে ছেলেবেলায় আমি পড়াতাম। সে এখন মস্ত বড়লোক হ'য়েছে। আমার সঙ্গে ক'লকাতায় হঠাৎ দেখা হ'ল। সে তোমাদের জন্য পূজোর কাপড় আর আমাকে 'ভাই-ফোঁটা'র উপহার দিয়েছে।"

হঠাৎ নিস্তারিণী গম্ভীর হ'য়ে ব'ললে, "বুঝেছি, সেই তড়িৎ না? যাকে তুমি ভালবাসতে?"

রবীন মাষ্টার একেবারে যেন কেঁচো হ'য়ে গেলো। তার মনেই হয় নি যে, তড়িতের কথা নিস্তারিণী জানে। এখন ধূ ধূ মনে প'ড়লো যে, তার বিবাহিত জীবনের প্রথম উন্মাদনার সময় সে মত্ততার আতিশয্যে নিস্তারিণীকে তার প্রথম প্রেমের কথা অনেক কিছু ব'লেছিল। সে আজ বিশ পঁচিশ বছরের কথা—ভুলেই গিয়েছিল রবীন। সেই বিশ বছরের পুরোনো কথা যে নিস্তারিণী মনের ভিতর গেঁথে রেখেছে, যার তড়িতের নামটা

শুদ্ধ, এ দেখে রবীন মাষ্টার প্রমাদ গ'ণলো। কি ব'লবে সে তা' ভেবেই পেলো না।

রবীন মাষ্টারের শিক্ষা ও চরিত্রের একটা প্রকাণ্ড ত্রুটি এই যে, মিথ্যা উদ্ভাবন করবার অত্যাবশ্যক শক্তিটি তার মোটেই ছিল না। তাই কিছুক্ষণ নিরুত্তরে মাথা নীচু ক'রে থেকে সে ব'ললে, "হ্যাঁ সেই—কিন্তু তা' —তার এখন বিয়ে হ'য়েছে, ছেলের বয়স আঠার বচ্ছর তার।"

"তোমারই বা বয়সটা কোন্ কচি খোকার মত!—তাই বলি, বছর বছর ক'লকাতা যাবার এত গরজ কেন?"—ব'লে নিস্তারিণী মুখ ভেঙচে শাড়ীখানা হাত থেকে ফেলে দিলে।

বলা বাহুল্য, নিস্তারিণী অনায়াসে স্থির সিদ্ধান্ত ক'রে ফেললে যে, প্রতি বৎসর রবীন মাষ্টার ক'লকাতা যায় স্বধু তড়িতের প্রেমের টানে।

রবীন মাষ্টার খুব জোর প্রতিবাদ ক'রে ব'ললে যে, তড়িৎ ক'লকাতায় থাকে না মোটে, এর আগে কখনও তার সঙ্গে দেখা হয় নি। কিন্তু কার কথা কে শোনে? নিস্তারিণী সে কথা নির্জ্জলা মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দিয়ে ব'ললে, "ভাই-ফোঁটা দিয়েছে সে, ব'ললে না?"

একটু আশান্বিত হ'য়ে রবীন ব'ললে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাই-ফোঁটা—আর কিছু নয়—বড় ভাই ব'লে—"

"মরণ! ভাই-ফোঁটা! ভাই-ফোঁটা না বর-ফোঁটা। পোড়া কপাল! তাই তো বলি, হঠাৎ বুড়ো বয়সে চেহারার এত চেকনাই কিসে? যৌবনের দেখি জোয়ার ব'য়েছে! আ মরি মরি কি শোভাই হয়েছে!"

ভ্রূকুটি ক'রে সে মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেল। আবার ফিরে এসে ব'ললে, "মরণের দিন ঘনিয়ে এলো তবু বিট্‌কেলপণা ঘুচলো না। বলি, লজ্জা করে না? লজ্জা করে না—এই বয়সে ঢলাঢলি ক'রতে? কোন্

লজ্জায় সেজেগুজে ছোকরাটি হ'য়ে এয়েছ সেই নষ্টা মাগীর ভালবাসার উপহার নিয়ে ঢলাঢলি ক'রতে ? ছিঃ ছিঃ, ছিঃ। আমরা হ'লে গলায় দড়ি দিতাম।—দড়ি-কলসীর পয়সা জুটলো না ক'লকাতায় যে, এই বয়সে সেই মাগীর দোরে ম'রতে গেলে ?”—

ইত্যাকার লম্বা বক্তৃতার পর নিস্তারিণী খুব তেজের সঙ্গে ব'লে দিলে যে, এ-সবের এক কণা জিনিষও তার ঘরে থাকতে পারবে না। রবীনের লজ্জা না থাকে, ঢলাঢলি ক'রতে ইচ্ছা করে, সে নিয়ে যাক্ এ-সব তার বাইরের ঘরে। লোক ডেকে যেন সেখানে দেখায় সে তার পেয়ারের মেয়েমানষের 'প্রেজেণ্ট'!

ক'বরেজ ম'শায় সেই সেদিন ভয় দেখাবার পর থেকে নিস্তারিণী ভারী ঠাণ্ডা মেরে গিয়েছিল। সোয়ামীর উপর চোটপাট করা সে ছেড়ে দিয়েছিল। রাগ হ'লে সে চেপে রাখতো। মিষ্টি কথায় আদরে-তোয়াজে সে রবীনকে রাখতো। কিন্তু মানুষের শরীর তো তার, এত কি সয় ? এই বুড়ো বয়সে সোমত্ত ছেলের সামনে রবীন এমনি ঢলাঢলি ক'রে এসে তার জের ব'য়ে নিয়ে এসেছে একেবারে নিস্তারিণীর ঘরের ভিতর, এ কি সইতে পারে কেউ কোনও দিন ?

রবীন মাষ্টার এ বকুনি খেয়ে প্রথমে থ' মেরে গিয়েছিল। তার অভিযানের এই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত পরিণতিতে সে থই না পেয়ে হাবুডুবু খেলো কিছুক্ষণ। কিন্তু নিস্তারিণী যখন বড়ই বাড়াবাড়ি আরম্ভ ক'রলে, তড়িৎকে ব'ললে 'নষ্টা মাগী' আর তার নাম নিয়ে যা-নয় তাই ব'লতে লাগলো রবীনকে, তখন তার হ'ল রাগ। আর শেষে যখন এসব জিনিষ বের ক'রে নিতে ব'লে নিস্তারিণী মারলে সেই স্যুটকেসে এক লাথি, তখন রবীন একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে উঠলো।

রেগে-তেড়ে উঠে রবীন মাষ্টার ব'ললে, “মুখ সাম্‌লে কথা ক'য়ো

বলছি, নইলে জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেব। প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে বড় বেড়ে গেছ—যার নামে খুশী, যা-নয় তাই ব'লতে লেগেছ।"

নিস্তারিণী একেবারে সংহার-মূর্ত্তি ধ'রে এসে যখন গর্জ্জন ক'রতে যাবে তখন রবীন এসে তার হাত চেপে ধ'রে ব'ললে "খবরদার বলছি। ঐ সব নোংরা কথা যদি তুমি মুখ দিয়ে ফের বের ক'রবে তবে তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন।"

স্বামীর এই ভাব দেখে নিস্তারিণী সত্যি সত্যিই ভয় খেয়ে গেল। সে একেবারে থ' হ'য়ে গেল—ভাবলে, স্বভাব নষ্ট হ'লে মানুষ না পারে এমন কাজ নেই! নইলে রবীন তোলে স্ত্রীর গায় হাত! এ-সব সেই হারামজাদী মাগীর শিক্ষা!

তার হাত ছেড়ে দিয়ে রবীন রাগে কাঁপতে কাঁপতে কাপড়ের স্যুট-কেসটা তুলে রাখলে একটা সিন্দুকের উপর। আর বইয়ের স্যুটকেসটা হাতে ক'রে সে শাসিয়ে ব'ললে, "এই এখানে রাখলাম স্যুটকেস, দেখি তুমি কেমন ওতে হাত দেও। খবরদার ছুঁয়ো না ব'লছি।"—

ব'লে গট্ গট্ ক'রে রবীন চ'লে গেল বাইরে। বইয়ের স্যুটকেশটা বাইরের ঘরে রেখে রবীন মাষ্টার হন হন ক'রে ছুটে গেল স্কুলে। স্কুলের বেলা তখন ব'য়ে যায়, কাজেই ব'সবার বা খাবার সময় নেই তার।

যাবার সময় তার মগজটা রাগে টগ্‌বগ্ ক'রে ফুটছিল।

নিস্তারিণীর অত্যাচারে সে অভ্যস্ত, সমস্ত পৃথিবীর অনাদরে, অত্যা-চারে সে অভ্যস্ত। সে অপমান-অত্যাচার শুধু মাথা পেতে নেওয়া ছাড়া আর কিছু ক'রবার চিন্তা কোনোদিনই তার মনে আসে নি। কেন-না সে জানতো সে হীনাতিহীন, দীনাতিদীন। পথের ক্রিমিকে লোকে মাড়িয়েই যাবে, লোকের পায়ের তলায় প'ড়ে থাকার জন্যেই তার জন্ম। সে জানতো যে, পৃথিবীতে এমন কোনো আশ্রয় নেই, যেখানে দাঁড়িয়ে

কারও সঙ্গে সংগ্রাম ক'রতে পারে, তাই বুক ভেঙ্গে যেতো তার, তবু সে চুপ ক'রে স'য়ে যেতো, ক্রোধ হ'ত তার, কিন্তু সে ক্রোধে নিপীড়িত ক'রতো সে শুধু আপনাকেই।

কিন্তু আজ তার ভিতর একটা নূতন আত্মাদর জন্মেছে। ব্ল্যাক সাহেব তার বোধন ক'রেছিলেন, আর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ক'রেছে তার তড়িৎ। সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পেরেছে যে, সে একেবারে পরিপূর্ণরূপে অসহায় নয়। সমস্ত জগৎ যদি ত্যাগ করে তবু সে আশ্রয় পাবে। বুক-ভরা ভালবাসা নিয়ে তড়িৎ তাকে বরণ ক'রে নেবে—আর ব্ল্যাক সাহেব, তিনিও তো প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তার একটা উন্নতির ব্যবস্থা ক'রবার। সে যে নিরাশ্রয় নয়, এমন লোক জগতে আছে যে, তার পাশে যে-কোনো অবস্থাতেই দাঁড়াবে—এই অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তরে এসেছিল একটা শক্তি-বোধ। তাই আজ সে নিস্তারিণীর কাছে ঘা খেয়ে শুধু মুষড়েই গেল না, তার এই নবজাত শক্তির গায়ে ঠোকা খেয়ে নিস্তারিণীর ক্রোধ সৃষ্টি ক'রলে আগুন।

নিস্তারিণীকে শাস্তি দেবার নানা উদ্ভট কল্পনা তার মাথার ভিতর উঠতে লাগলো, ফুটতে লাগলো। রাগে গর গর ক'রতে ক'রতে সে স্কুলে গিয়ে পৌঁছুল।

১১

রবীন মাষ্টারের নব কলেবর দেখে ছেলেরা কাণাকাণি ক'রতে লাগলো, মাষ্টারেরা এক-আধটুকু রসিকতা আরম্ভ ক'রলেন। রসিকতা শোনবার বা গ্রাহ্য ক'রবার মত মনের অবস্থা তার ছিল না। তাই

হেড্‌পণ্ডিত ম'শায় যখন একটা উদ্ভট শ্লোক আউড়ে তাকে ব'ললেন, "রবিদা সবই তো ক'রলে, একশিশি কলপ নিয়ে এলে না কেন ?" তখন সে তার অভ্যস্ত ভীরুতার সঙ্গে পাশ কাটিয়েও গেল না, রসিকতাটা স্বধু রসিকতা ব'লেও নিতে পারলে না। সে ব'ললে, "যা-ই ক'রে থাকি পণ্ডিত ম'শায়, কারো ঘরে চুরি ক'রে করি নি। তবে আপনাদের এত মাথা ব্যথা কেন ?"

সে দম দম ক'রে চ'লে গেল নিজের ক্লাশে। কোনও কথা না ক'য়ে সে বই হাতে ক'রে পড়াতে লাগলো, এতটা একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও শক্তির সঙ্গে যা সে আগে কখনও দেখায় নি।

টিফিনের ঘণ্টায় যখন সে আফিসে গেল তখন খবর পেল যে, হেড্‌মাষ্টার তাকে ডেকেছেন। অমনি তার মনে হ'ল যে, হেড্‌পণ্ডিত হেড্‌মাষ্টারের কাছে গিয়ে নালিশ ক'রেছে, তাই এ ডাক। রুক্ষ-মেজাজে উগ্র-মূর্ত্তিতে সে গিয়ে হেডমাষ্টারের কাছে উপস্থিত হ'ল, 'যুদ্ধং দেহি'-র মত ভাব ক'রে।

গিয়ে সে দেখলে ব্যাপার অন্যরূপ।

ব্ল্যাক্ সাহেব তাঁর ইন্‌স্পেক্‌শন-রিপোর্টে স্কুলের খুব বিরুদ্ধ সমালোচনা ক'রেছিলেন, গেল দশ বছরের মধ্যে স্কুলের ছাত্রদের পরীক্ষার ফল যে ক্রমশঃই খারাপ হ'তে হ'তে এখন একেবারে যাচ্ছেতাই হ'য়ে গেছে তা দেখিয়ে তিনি তার কারণ নির্দ্দেশ ক'রে তাঁর নির্দ্দিষ্ট বহু দোষ-ত্রুটির আমূল সংস্কারের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেই রিপোর্টে তিনি রবীন মাষ্টারের বহু সুখ্যাতি ক'রে ব'লেছিলেন যে, রবীন মাষ্টারকে স্কুলের কর্ত্তৃত্বের সকল ভার থেকে সরান হওয়াতেই স্কুলের এই অধোগতি হ'য়েছে। তাঁর প্রস্তাবগুলির মধ্যে একটি প্রস্তাব এই যে, রবীন মাষ্টারকে একশো টাকা বেতনে অ্যাসিষ্টাণ্ট হেড্‌-মাষ্টার নিযুক্ত ক'রে

স্কুলের সব শ্রেণীর শিক্ষা পরিদর্শনের ভার প্রধানতঃ তার হাতেই দেওঁয়া কর্ত্তব্য।

ব্ল্যাক্ সাহেব ইন্‌স্পেক্টার থাকতে থাকতেই হেড্-মাষ্টার এ রিপোর্টের একটা উত্তর দিয়ে ব'লেছিলেন যে, ইন্‌স্পেক্টারের সমস্ত প্রস্তাবই কার্য্যে পরিণত করা হবে—সে বিষয়ে ব্যবস্থা হ'চ্চে, আর রবীন মাষ্টারের মাইনে বাড়ান-সম্বন্ধেও কমিটি বিবেচনা ক'রছেন। অনেক টাল-বাহানা ক'রে কমিটি রবীন মাষ্টারের পঞ্চাশ টাকা বেতন ধার্য্য ক'রেছিলেন, কিন্তু সেই সময়ে ব্ল্যাক্ সাহেব বদলী হ'য়ে যাওয়ায় সে প্রস্তাব উল্টে গিয়েছিল, ব্ল্যাক্ সাহেবের অন্য প্রস্তাবগুলির সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু করা হয় নি। সবাই ভেবেছিলেন ব্ল্যাক্ সাহেব একটা বদ্ধ পাগল, তাঁর ঐ সব পাগলামীর কথা তাঁর পরের স্থায়ী ইন্‌স্পেক্টার ধ'রবেন না।

ব্ল্যাক্ সাহেবের স্থানে এলেন একজন নিরীহ ভালমানুষ ইন্‌স্পেক্টার।

রবীন মাষ্টার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তার মাইনে-সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ কি করেন তা সে ব্ল্যাক্ সাহেবকে জানাবে। সে তাই ক'রেছিল। ব্ল্যাক্ সাহেব তখন সিমলায় স্পেশাল ডিউটিতে, সুতরাং তাঁকে জানিয়ে বিশেষ কিছু কাজ হবে তা তার মনে হয় নি, তবু প্রতিশ্রুতি-রক্ষার জন্য রবীন মাষ্টার কথাটা জানিয়েছিল।

ব্ল্যাক্ সাহেব সে চিঠি পেয়েই তেলে-বেগুনে জ্ব'লে উঠলেন। তিনি তখনি ডিরেক্টারের কাছে একখানা বিস্তারিত পত্র লিখে দিলেন। ডিরেক্টার সে পত্র পাঠালেন ইনস্পেক্টারকে খুব কড়া হবার উপদেশ দিয়ে।

তাই ইন্‌স্পেক্টার খুব একখানা কড়া চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে, ব্ল্যাক সাহেবের রিপোর্টে যে সব সংস্কারের কথা বলা হ'য়েছে সেগুলি এখনও কার্য্যে পরিণত করা না হওয়ায় একটা গুরুতর ত্রুটি হ'য়েছে,

এবং একমাসের মধ্যে সমস্ত সংস্কার করবার রিপোর্ট না পেলে সরকারী সাহায্যের টাকা দেওয়া হবে না।

এই চিঠি পেয়ে হেড্‌মাষ্টার এবং স্কুল-কমিটি একেবারে এলিয়ে প'ড়লেন। সরকারী সাহায্যের টাকা না পেলে তাঁদের চ'লবে না। অথচ তা পেতে হ'লে যে সব সংস্কার ক'রতে হবে তাও দুরূহ। আর সব বিষয় এক রকম তালি-জোড়া দিয়ে চলে, কিন্তু সব চেয়ে বেশী শক্ত কথা সেকেণ্ড মাষ্টারকে ডিঙ্গিয়ে রবীন মাষ্টারকে এসিষ্টাণ্ট হেড্‌মাষ্টার করা।

তাই হেড্‌মাষ্টার ডেকে পাঠালেন রবীন মাষ্টারকে।

রবীন মাষ্টার আসতেই তিনি সৌজন্যের আতিশয্যে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা ক'রে আর একখানা চেয়ারে বসালেন।

"মহা বিপদে প'ড়েছি রবিবাবু, তাই আপনার শরণ নিতে হ'চ্ছে। এই দেখুন ইনস্পেক্টারের চিঠি, আর এই আপনার ব্ল্যাক সাহেবের রিপোর্ট! প'ড়ে দেখুন।"

সে চিঠি ও রিপোর্ট প'ড়ে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে রবীন মাষ্টার ব'ললে, "তা আমি এর কি ক'রবো?"

হেসে হেড্‌মাষ্টার ব'ললেন, "সে কি কথা? আপনারই তো সব ক'রবার কথা। আপনারই তো এই স্কুল—এটা থাকলে আপনার অমর কীর্ত্তি থাকবে, উঠে গেলে আপনার একটা কীর্ত্তি লোপ পাবে। এখন যা বিপদ, তাতে তো স্কুল না থাকবার দাখিল! একে বসিয়েছেন আপনি, এর উপায়ও আপনাকে ক'রতে হবে।"

কথাগুলি বেশ তৃপ্তিদায়ক। এই হেড্‌মাষ্টার, যিনি রবীন মাষ্টারকে তাড়াবার জন্যে না ক'রছেন এমন কাজ নেই, আর কেড়ে নিয়েছেন

তার হাত থেকে সব কাজ করবার শক্তি—তিনিও আজ বিপদে প'ড়ে যে স্বীকার ক'রতে বাধ্য হ'চ্ছেন যে, রবীন মাষ্টারই স্কুলের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ক'রেছিল আর একে রক্ষা ক'রতে হ'লেও তাকে ছাড়া গতি নেই, রবীন এ কথায় অন্তরে বেশ জয়ের উল্লাস অনুভব ক'রলো।

সে ব'ললে, "বলুন, আমায় কি ক'রতে হবে?"

হেড্‌মাষ্টার ব'ললেন, "আপনি যদি ব্ল্যাক সাহেবকে একখানা চিঠি লিখে দেন, তবে তাঁর অনুরোধে ইনস্পেক্টার আমাদের অন্ততঃ বছর-খানেক সময় দেবেন নিশ্চয়।"

রবীন মাষ্টার ব'ললে, "বাপ রে! ব্ল্যাক সাহেবকে আমি এত বড় স্পর্দ্ধার কথা লিখতে পারবো না। তা ছাড়া, তিনি বোধ হয় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এখন কোথায় আছেন তাও জানি না আমি।"

হেড্‌মাষ্টার ব'ললেন, "তা হ'লে আপনিই বলুন, কি ক'রে এ বিপদে রক্ষা পাই আমরা।"

রবীন মাষ্টার সব বিষয়েই পরামর্শ দিলে। যেমন ক'রে যথাসম্ভব সহজে এবং সংক্ষেপে ব্ল্যাক সাহেবের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা যায়, সে সম্বন্ধে সদুপদেশ দিলে। প্রত্যেকটা কথা শুনে হেড্‌মাষ্টার ব'ললেন, "ঠিক! ঠিক! চমৎকার কথা! এইটে আমাদের খেয়াল হয় নি।"

তারপর এলো দু'টো বড় কথা। লাইব্রেরী আর রবীন্ মাষ্টারের পদবৃদ্ধির কথা। হেড্‌মাষ্টার ব'ললেন, "এ দু'টোর সম্বন্ধে কি উপায়? এই দেখুন আমাদের টাকা-পয়সার অবস্থা। এমনিই দু'-তিনশো টাকা ঘাটতি হয়, এর উপর এ খরচা করি কেমন ক'রে?"

রবীন মাষ্টার লাইব্রেরীর নূতন বইয়ের প্রস্তাবিত ফর্দ্দের উপর চোখ বুলিয়ে ব'ললে, "এর মধ্যে বেশীর ভাগ বই-ই আমার কাছে আছে

বোধ হয়। আমার এখন সেগুলোর বেশী দরকার নেই, আপনারা সেগুলো এনে রাখতে পারেন।"

"বাস, তবে আর চাই কি? অমনি কি ব'লেছিলাম ম'শায় যে, আপনি ছাড়া আর কে রক্ষা ক'রতে পারবে? তারপর আপনার প্রমোশনের কথাটা—এ সম্বন্ধে কি করা যায়?"

"ও সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই না।"

"সে কি কথা রবীনবাবু, এত ক'রে আপনি এইটুকুর জন্যে নির্দ্দয় হবেন? এ সম্বন্ধে আপনি ছাড়া কেউ কিছু বলতেই পারে না। ব্ল্যাক সাহেব যা ব'লেছেন সে তো অতি অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনাকে একশো টাকা কেন দু'শো টাকা দিলেও আপনার উপযুক্ত হয় না। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের আর্থিক অবস্থা—উপায় নেই। এখন, এক আপনি দয়া ক'রে ছেড়ে দিলে এর উপায় হয়। ধরুন, আপনি যদি একখানা চিঠি লেখেন যে, স্কুল আপনার, এর ক্ষতি-বৃদ্ধিতে আপনার অন্তরের যোগ আছে। সেই দিকে দৃষ্টি রেখে আপনি এখন কোনও বেতন বৃদ্ধি চান না, তবেই সব গোল মিটে যায়।"

রবীনের অন্তর একবার বিদ্রোহী হ'য়ে উঠলো। সে মনে মনে ভাবলে, সব দিক্ রক্ষার আরও তো সহজ উপায় আছে। হেড্‌মাষ্টার তাঁর দেড়শো টাকা মাইনে থেকে পঞ্চাশ টাকা ছেড়ে দিলেই তো পারেন। কিন্তু হেড্‌মাষ্টারের মুখের উপর এমন কথা সে ব'লতে পারলে না। সে শুধু ঘাড় নেড়ে ব'ললে, "দেখুন সে কথাটা তো সত্যি হবে না। স্কুল আমার নয়, আপনাদের কমিটির। এর কাজ পরিচালনায় আমার কোনও হাত নেই। আমি শুধু থার্ড মাষ্টার—আপনার হুকুমে ছেলেদের হিষ্টরী-হাইজিন পড়াই, এত বড় লম্বা কথা বলার স্পর্দ্ধা আমার নেই!"

হেড্‌মাষ্টার দেখলেন যে, খুব সহজে এ কাজটা হাসিল হবে না। তিনি তাড়াতাড়ি ব'ললেন, "সে কথা নয়! আপনি ভুল বুঝবেন না। সে বিষয়ে আমাদের এতদিনকার ত্রুটি নিশ্চয় সংশোধন ক'রবো। আপনাকে স্কুল-কমিটির মেম্বার ক'রে নিচ্ছি, আর সমস্ত স্কুলের পরিদর্শনের ভার এখনি দিচ্ছি—আর যদি আপনি চান তবে আপনার নাম অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেড্‌মাষ্টার ক'রতেও আমাদের আপত্তি নেই—যদি আপনি দয়া ক'রে বেতন বৃদ্ধিটা স্কুলকে ভিক্ষা দেন।"

রবীন মাষ্টার এতে খুসী হ'য়ে গেল। টাকা দু'-দশটা নাই-বা পেল, কিন্তু এই অধিকার তার হ'লে সে স্কুলটা নিজের মত ক'রে চলাতে পারবে। কাজের মত কাজ দেখিয়ে যেতে পারবে।

সে তক্ষণি সম্মত হ'য়ে হেড মাষ্টারের নির্দ্দেশ-অনুযায়ী স্কুলের হিতের জন্য বেতন -বৃদ্ধি ইচ্ছা করে না ব'লে চিঠি লিখে দিলে।

খুব উৎফুল্ল হৃদয়ে সে বাড়ী ফিরলো।

সেইদিন কমিটি থেকে সব পাশ হ'য়ে গেল। যোগেশ হেসে ব'ললে, "কেমন ক'রে বাগালেন এ চিঠি?"

হেড্‌মাষ্টার হেসে ব'ললেন, "রবীন মাষ্টারকে ডেকে তোয়াজ ক'রে ল্যাজ মোটা ক'রে দিতেই সে একেবারে চিৎ—যা ব'ললাম তাই ক'রলে। পাগল মানুষ, ওকে একটু খোসামোদ ক'রলে কি না করানো যায়!"

রবীন মাষ্টার দেখলে, চারিদিক দিয়েই যেন তার অদৃষ্ট খুলে যাচ্ছে এতদিনে। স্কুলে মাইনে না-ই বাড়ুক, তার কাজ ক'রবার ক্ষমতা বেড়ে যাবে এখন, আধিপত্য হবে একটা, যার ফলে সে তার আদর্শগুলো কাজে পরিণত ক'রতে পারবে। বাড়ীতে নিস্তারিণীর কাছে সেই রাগ দেখাবার পর, সে কয়েকদিন ধ'রে কাঁদলে, কিন্তু তার পর ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল, তবে স্বামীর সঙ্গে সে কথাও বন্ধ ক'রে দিলে। এতে হ'ল এই যে, সে আর রবীনকে ঘাঁটায় না, সময়ে অসময়ে তার হুকুম নিয়ে হাজির হয় না, রবীন নিজের মত নিজে তার বাইরের ঘরে ব'সে যা ইচ্ছে তাই ক'রতে পারে। তাই সে বাইরের ঘরের বইগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে বেশ ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন ক'রে ফে'ললো; এমন কি ছেলের সাহায্যে তার ঘরের তক্তাগুলো দিয়ে গোটা কয়েক শেল্‌ফ তৈরী ক'রে বইগুলোকে বেশ ভদ্রভাবে সাজিয়ে রাখলে। এর পর তার ছেলেদের একটা মহা উৎসাহ লেগে গেল, সেই ঘরখানা ঝাড়া-পোঁছা ক'রতে।

আবার এ-দিকে চাষীরা তার কাছে খুব আসতে লাগলো। পাটের দর এবার এত প'ড়ে গেছে যে, পাট জন্মাবার খরচাও পোষায় নি কারও। তাই চাষীরা মাথায় হাত দিয়ে ব'সে প'ড়েছে সবাই। তারা ভেবে দেখলে যে, এর চেয়ে পাটের জমীগুলো যদি তারা ফেলেও রাখতো, তবু তাদের লোকসান কম হ'ত। কারও কারও তখন মনে হ'ল যে, রবীন মাষ্টার যখন পাগল হ'য়ে গিয়েছিল তখন সে ব'লেছিল পাটের জমী কমিয়ে অন্য ফসল বুনতে! হোক মাষ্টার পাগল, কিন্তু সে ব'লেছিল ঠিক—আর সে জানে অনেক কথা!

তাই চাষীরা একে একে এবং দলে দলে তার কাছে আসতে লাগলো পরামর্শের জন্যে। উৎসাহে রবীন মাষ্টারের অন্তর ভ'রে উঠলো। এতদিনে বুঝি তার স্বপ্ন সফল হবে, তার আইডিয়া কার্য্যকরী হ'য়ে উঠবে।

দিনের পর দিন তার বাড়ীতে বৈঠক ব'সতে লাগলো, প্রতিজনের কাছে একই কথা ব'লতে ব'লতে তার মুখে ফেনা বেরিয়ে গেল, কিন্তু উৎসাহ তার ক'মলো না।

পূর্ব্ব বাঙ্গলার চাষী আলস্যের অবতার। তারা জমীতে দু'বার চাষ দিয়ে দু'টো বীচি ছড়িয়ে আসে, দু'-একবার নিড়ানি দেয়, তার পর ফসল হ'লে কেটে ঘরে তোলে। পাট ক'রতে তাদের খাটতে হয়, কিন্তু মাত্র ক'টা দিন। এর বেশী তাদের ক'রতে হয় না কিছুই। বাকী বছরটা তারা কাটিয়ে দেয় দারুণ আলস্যে। কথা কয় তারা প্রচুর, কিন্তু তেড়ে ফুঁড়ে কোনও কাজ করা বা কোনও একটা সিদ্ধান্ত করা তাদের ধাতে আসে না। কোনও বিষয়েই তাদের কোনও তাড়া নেই—কেন না তাড়ার দরকার হয় না তাদের কিছুই।

তাই এ-সব আলোচনা দিনের পর দিন চ'লতেই থাকলো। একই লোক, একই কথা হয়তো হাজার বার জিজ্ঞেস ক'রেছে, হাজার বার জবাব পেয়েছে, তার পর আবার ফিরে সে-ই সে-কথা জিজ্ঞেস ক'রেছে।

এমনি ধীরে-সুস্থে, টেনে, লম্বা হ'য়ে চ'লতে লাগলো চাষীদের সঙ্গে আলোচনা চট্-পট্ একটা সিদ্ধান্ত হবার কোন সম্ভাবনাই দেখা গেল না। একদিন যদি-বা দশজনে মিলে একটা ঠিক করে, তার পরের দিন আর দু'জনা এসে দেয় সেটা ভণ্ডুল করে, আবার যদি নতুন লোক রাজী হয়, তবে পুরোনো যারা তারা যায় বিগড়ে।

এই সব গবেষণা হ'তে হ'তে বুনানীর সময় এসে প'ড়লো। সেই

সময় হঠাৎ পাটের দাম বাড়তে থাকলো বড্ড। চাষীরা চট্-পট্ যে যার জমীতে বুনানী ক'রলে—একটু বেশী ক'রে পাট, আর বাকী ধান। তার পর তাদের রবীন মাষ্টারের কাছে আনাগোনা বন্ধ হ'য়ে গেল।

রবীন মাষ্টার নিরাশ হ'য়ে অখণ্ড মনোযোগ দিতে গেল স্কুলে। স্কুলের শিক্ষা-পদ্ধতির কি কি উন্নতি করা দরকার সে কথা ভাবতে আরম্ভ ক'রলে। এ-বিষয়ের চর্চ্চা সে অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছিল; তাই কোনও কিছু ক'রবার আগে সে তার পুরোনো বইগুলো ঝাড়া-ঝুড়ি ক'রে আবার একবার প'ড়ে নিলে। তারপর তার যখন ছুটি থাকে তখন সে ক্লাশে ক্লাশে ঘুরে পড়ান দেখতে লাগলো, মতলবটা এই যে, দেখেশুনে তবে তার পদ্ধতি স্থির ক'রবে।

সেকেণ্ডমাষ্টার গিয়ে হেড্‌মাষ্টারকে ব'ললেন, "পাগলের জ্বালায় অতিষ্ঠ হ'লাম।"

হেড্‌মাষ্টার ব'ললেন, "কেন? কি হচ্ছে?"

"আরে ম'শায় ক্লাশে পড়াই, দু'-চারদিন অন্তর দেখি, ও দাঁড়িয়ে শুনছে দোর গোড়া থেকে। তারপর সেদিন আমায় জিওমেট্রি আর এরিথমেটিক পড়াবার নতুন নিয়ম শেখাতে এসেছিল। কি উদ্ভট খেয়ালও ওর মাথায় হ'তে পারে! ললিতবাবুকে ও-নাকি ব'লেছে যে, যদি ২৫৩৬ দিয়ে কোন সংখ্যাকে গুণ ক'রতে হয়, তবে আমরা যেমন করি তেমন না ক'রে প্রথমে ২০০০, তার পর ৫০০, তার পর ৩০, তার পর ৬ দিয়ে গুণ ক'রতে হবে। চুলোয় যাক গে, ওর কোম্পানী নিয়ে ও থাক—আমাদের জ্বালাতন ক'রে যে মারলে।"

বলা বাহুল্য, সেকেণ্ডমাষ্টার ম'শায় জানতেন না যে, রবীন মাষ্টার যে সব কথা ব'লেছিল সেগুলো গণিত-শিক্ষার আধুনিক পদ্ধতির কথা,

বিলেতে অনেক পরীক্ষা ক'রে সে সব গ্রহণ ক'রেছে ; তিনি এগুলো সব রবীন মাষ্টারের উদ্ভট খেয়াল ব'লেই ধ'রে নিয়েছেন।

হেড্‌মাষ্টার শুনে ব'ললেন, "তাই না-কি ? আচ্ছা, আমি ওকে ডেকে ধ'মকে দিচ্ছি।"

রবীন মাষ্টারকে ডেকে পাঠান হ'ল। সেকেণ্ড-মাষ্টার চ'লে গেলেন।

রবীন মাষ্টার আসতে হেড্‌মাষ্টারবাবু তাকে ব'ললেন, "এ-সব কি শুনছি রবীনবাবু, আপনি সব টীচারের কাজে থামকা interfere ক'রছেন ? 'আপনার চরকায় তেল দেবার' একটা কথা আছে জানেন তো ?"

রবীন মাষ্টার অবাক হ'য়ে ব'ললে, "কই না, আমি কার কাজে interfere ক'রেছি ?"

"করেন নি ? সবাই তো ব'লছে, আপনি তাদের পড়াবার সময় গিয়ে disturb করেন, তাদের পড়ান-সম্বন্ধে সব খামখেয়ালী উপদেশ দিতে যান। আপনি ভুলে যাবেন না যে, স্কুলটা পাগলা-গারদ নয়।"

অপমানে কাণ পর্য্যন্ত লাল হ'য়ে গেল রবীন মাষ্টারের। কিছুক্ষণ সে কোনও কথাই ব'লতে পারলে না। তারপর নিজেকে শান্ত ক'রে সে ব'ললে, "দেখুন, disturb করা, interfere করা সব মিথ্যে। আমি ক্লাশের বাইরে ওঁদের সঙ্গে method-সম্বন্ধে আলোচনা ক'রেছি— ক্লাশের ভিতরে কিছুই বলি নি। কেবল সেকেণ্ডমাষ্টার সেদিন ক্লাশে ব'সে খবরের কাগজ প'ড়ছিলেন আর ছেলেরা গোলমাল ক'রছিল, তাইতে বাইরে ডেকে খুব নরমভাবে তাঁকে ও-রকম ক'রতে বারণ ক'রেছিলাম।"

"তাই বা আপনি ক'রতে যান কেন ? সে দেখতে হয় আমি দেখবো—আপনার তা কাজ নয় ! আপনি সেকেণ্ড মাষ্টারের কাজের

উপর সর্দ্দারি ক'রতে যান কোন্ অধিকারে ?"—গর্জ্জন ক'রে হেড্মাষ্টার এই কথা ব'ললেন।"

রবীন মাষ্টার খাড়া জবাব দিলে, "অধিকার আমার আছে বই কি ? আপনারা আমাকে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেড্মাষ্টার নিযুক্ত ক'রেছেন স্কুলের শিক্ষা পরিদর্শন করবার জন্তই, সে কথাটা ভুলে যাবেন না।"

'হো হো' ক'রে হেড্মাষ্টার এমন ভাবে হেসে উঠলেন যাতে ভারী অপমান বোধ হ'ল রবীন মাষ্টারের।

হাসি থামলে হেড্মাষ্টার ব'ললেন, "তাই না-কি ? অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেড্মাষ্টার ? নিয়োগ-পত্র আছে আপনার কাছে ?"

"নিয়োগ-পত্র ! নিয়োগ-পত্র আবার কিসের ? আপনি মুখে ব'লে দিয়েছেন।"

হেড্মাষ্টার আবার উগ্রস্বরে ব'ললেন, "আমি ব'লেছি ? Nonsense। আপনি পাগল ব'লে আমিও তো পাগল হই নি যে, আপনাকে এই ভার দিতে যাব।"

ক্রোধে রবীনের সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে লাগলো।

কোনও সাক্ষী ছিল না হেড্মাষ্টারের সে কথার। সেই সাহসে, এত ছোটলোক সে, কথাটা অস্বীকার ক'রে রবীন মাষ্টারকেই মিথ্যাবাদী বানাতে চায়। মিথ্যাবাদী সে—জীবনে যে কোনও দিন মিথ্যা কথা বলে নি ? সে কেবল দাঁড়িয়ে থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে লাগলো।

যখন সে শান্ত হ'ল তখন সে ব'ললে, "মিথ্যে ব'লছি আমি ? আপনি নিযুক্ত করেন নি আমাকে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেড্মাষ্টার ? তাই ব'লে আমার কাছে মাইনে-বৃদ্ধি বাপ দিয়ে চিঠি লিখিয়ে নেন নি ?"

"মাইনের সম্বন্ধে আপনি যে চিঠি দিয়েছেন, তার 'কপি' তো

এখানেই আছে—দেখুন, এতে আপনি যে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেড্‌মাষ্টার এমন কোনও কথা আছে কি ?

আর কথা কইতে রবীনের ঘৃণা বোধ হ'ল। সে ব'ললে "বেশ, তবে তাই।"

বুক তার ফেটে যেতে লাগলো লজ্জায়, অপমানে, ঘৃণায়—পরিপূর্ণ অক্ষমতায়।

হেড্‌মাষ্টার রবীনকে স্তোক দিয়ে চিঠিখানা আদায় ক'রেছিলেন, আর তার পর দিনই লোক পাঠিয়ে তার দেওয়া বইগুলো আনিয়ে নিয়েছিলেন এবং কমিটির পক্ষ থেকে রবীনবাবুকে শুধু তাঁর চিঠি এবং বইয়ের জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে লিখেছিলেন। রবীন মাষ্টারের চিঠিখানা ইন্‌স্পেক্টার-অফিসে পাঠান হ'য়েছিল, কাজও হ'য়েছিল তাতে। সে-চিঠি পাবার পর ইন্‌স্পেক্টার একবার স্কুল দেখে গিয়ে সরকারী সাহায্যের টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন। তারপর ছ'মাস চ'লে গেছে।

অ্যাসিষ্টাণ্ট হেডমাষ্টার নিয়োগের কথা, স্কুলের শিক্ষা-পরিদর্শনের ভার দেবার কথা হেডমাষ্টার ব'লেছিলেন শুধু ঐ চিঠিখানা আদায় ক'রবার জন্যে। তারপর সে-সম্বন্ধে আর কোন কথাই ওঠে নি। কমিটিতেও সে-কথা উল্লেখ ক'রবার কোন দরকারও হয় নি। রবীন মাষ্টার স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি যে, এ-কথা আবার ওলটাতে পারে, আর কোনও একটা পাকা লেখা-পড়ার যে দরকার, তাও সে বিবেচনা করে নি। হেডমাষ্টারের কথায় নির্ভর ক'রে সে ধ'রে নিয়েছিল যে, অ্যাসিষ্টাণ্ট হেডমাষ্টার সে হ'য়ে গেছে।

ভদ্রলোক, এম্‌-এ পাশ, সে যে এমন নির্জ্জলা মিথ্যে ব'লতে পারে, সে-কথা শোনবার আগে রবীন মাষ্টার ভাবতেও পারতো না। এতক্ষণে সে বুঝতে পারলো যে, ঐ অ্যাসিষ্টাণ্ট হেডমাষ্টারীর কথাটা

মিথ্যা ভাঁওতা, শুধু তাকে বঞ্চনা ক'রে সে ঐ-চিঠি আদায় ক'রে নিয়েছে। ওঃ! এত বড় ছোট লোক, জোচ্চোর ঐ লোকটা, ছিঃ!

ঘৃণায়, ক্রোধে তার অন্তর ভ'রে গেল। সে গট্‌-গট্‌ ক'রে বাড়ী গেল স্কুল ছুটি হবার আগেই। এর পর সে শান্ত হ'য়ে ক্লাশে গিয়ে তার কাজ ক'রতে কিছুতেই পারলে না।

কোনও দিন সে কারও অনিষ্ট চিন্তা ক'রে নি, অপমানে নিজের মনকে পীড়া দেওয়া ছাড়া কোনও দিন আর কিছুই তার হয় নি। কিন্তু আজ তার আর সইলো না। রক্ত টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটতে লাগলো। মনে হ'ল এর একটা প্রতিকার ক'রতেই হবে।

ভাবলে ব্ল্যাক সাহেবকে সে একখানা চিঠি লিখবে। গেলও লিখতে, কিন্তু লিখতে তার দারুণ লজ্জা বোধ হ'ল। ব্ল্যাক সাহেব তার এত বড় হিতৈষী যে, এ-প্রদেশ ছেড়ে গিয়েও তার জন্যে এতখানি ক'রেছিলেন, যাতে মাইনে বাড়ে আর কাজ ক'রবার অধিকার সে পায়। সে-সুযোগ সে এমনি বোকামী ক'রে হারিয়েছে, এই কথাটা ব্ল্যাক্‌ সাহেবকে জানাতে সে লজ্জায় যেন ম'রে গেল। তাই তার আর চিঠি লেখা হ'ল না।

এর পর সে ভাবতে লাগলো, দোষ তো কারও নয়, দোষ তার নিজেরই। সে নিজে এত বড় বেকুব কেন হ'ল যে, হেডমাষ্টারের দু'টো মুখের কথায় নিজের স্বার্থ এমনি ক'রে ছেড়ে দিতে গেল! এ তাহা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। মূর্খেরা এমনি শাস্তি চিরদিনই পেয়ে এসেছে, পাবেও চিরদিন। এ আর নতুন কথা কি!

তার [illegible] জীবনটা আলোচনা ক'রে সে এখন দেখতে পেলে পদে পদে তার মূর্খতা। অদৃষ্টকে এতদিন নিন্দা ক'রে এসেছে সে,

অনুযোগ ক'রেছে অদৃষ্টের এই নির্ম্মম নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে। কিন্তু ভেবে দেখলে, অদৃষ্ট তো তার হাতের গোড়ায় এনে দিয়েছিল অনেক সুযোগ—প্রতি বারই বুদ্ধির ভুলে সে-সুযোগ সে হারিয়েছে। তড়িতের মত নারী জগতে যে দুর্লভ, অতুলনীয়, তাকে পত্নীরূপে লাভ ক'রবার সৌভাগ্য হাতের গোড়ায় এসেছিল তার। মূর্খের মত সে লিখলে তাকে এমনি একটা চিঠি, যাতে সে-সৌভাগ্য দূরে চ'লে গেল, যার জন্যে এতদিন পরে তড়িৎ নিজে তাকে তিরস্কার ক'রেছে।

এদিকে ক'রলে যখন সে মাইনার স্কুল, দিব্যি কেঁপে উঠলো তা—পরম আনন্দে সে কাজ ক'রতে লাগলো। থাকতো যদি তার মাইনার স্কুল, তবে আজও সে মনের সুখে কাজ ক'রে যেতে পারতো, ছোট ছেলেদের মানুষ ক'রতে পারতো, গরীবদের ভিতর শিক্ষা প্রসারিত ক'রতে পারতো তার নিজের আদর্শে, কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি হ'ল তার, হাই-স্কুল ক'রতে হবে। হায় রে, তখন সে কি জানতো যে, হাই-স্কুল হবার ফল এই হবে যে, তার ভিতরকার শক্তিমান্ শিক্ষাদাতা বাইরের চাপে এমনি ক'রে নিষ্পেষিত হ'যে কুঁকড়ে-দুমড়ে গিয়ে হবে শুধু হিষ্টরী-হাইজিনের বাঁধা পাঠ দেবার প্রাণহীন যন্ত্র!

তারপর যখন এলো তার সৌভাগ্য—ইন্‌স্পেক্টার হ'য়ে এলেন তারই মত একজন আদর্শবান্ পুরুষ ব্ল্যাক্ সাহেব। তাঁর অনুগ্রহের কথা স্মরণ হ'তেই রবীনের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে প'ড়তে লাগলো। ব্ল্যাক্ সাহেব পথ ক'রে দিলেন তার পুনর্জ্জন্ম লাভের। মূর্খ সে—সামান্য শিশুর মত তুচ্ছ বঞ্চনায় ভুলে সে-সৌভাগ্যকে ঠেলে ফেলে দিলে একেবারে অতল সাগরের তলায়।

তাই দোষ দেবে সে কাকে? দোষ তো তারই। নিজের হাতে গ'ড়ে তুলেছে সে তার জীবনের নিষ্ফলতা, জীবনের ভূমিতে সার

দিয়ে চাষ ক'রে স্ব-ইচ্ছায় সে বীজ বুনেছে এই নিষ্ফলতার। তার চারা গজান থেকে আজও পর্য্যন্ত তার হৃদয়ের রক্ত সেচন ক'রে সেই অঙ্কুরকে পত্রে-পুষ্পে শোভিত ক'রে তুলেছে। তবে আর দোষ দেবে সে কাকে?

জীবনে একটি বস্তুকে সে কোনও দিন ভাবে নি, কোনও দিন তার কর্ম্ম-তালিকায় তাকে স্থান দেয় নি—যাতে ক'রে দুনিয়া চ'লেছে—সে স্বার্থ। যখন যা' সে ক'রেছে বা সঙ্কল্প ক'রেছে, তাতে তার মনের ইচ্ছা চিরদিনই থেকেছে সমাজের উপকার করা। পৃথিবীর দিকে সে আজ নূতন চোখ দিয়ে চেয়ে দেখলে—দেখলে, এমন লোক যে বড় হবে, পৃথিবীর সে আইনই নয়। এতদিন সে যে দার্শনিকদের শ্রদ্ধা ক'রে এসেছে, তাদের মত এই যে, সমাজের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হয় নিছক মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থ-বুদ্ধি দিয়ে নয়, সে স্বার্থ-বুদ্ধিকে সমাজের মঙ্গল দিয়ে নিয়ন্ত্রিত ক'রে। আজ তার মনে হ'ল, সে সব ভুল—Laissez faire-এর মত-ই হ'ল আসল মত, যাতে বলে যে, মানুষ নিজ নিজ স্বার্থ-বুদ্ধির অনুসরণ ক'রে, পরস্পরের সঙ্গে লড়াই ক'রে সফলতা অর্জ্জন করে, আর সবাইকে স্বচ্ছন্দে তাই ক'রতে দিলেই, যারা শ্রেষ্ঠ তারা পায় সফলতা। তার নিজের ছোট্ট দুনিয়ার চারিদিকে সে চেয়ে দেখলে—জীবনে সফলতা লাভ ক'রেছে কারা? যারা স্বার্থ ছাড়া অন্য চিন্তা মনে স্থান দেয় নি কোন দিন। আর সমাজের কল্যাণ? পরিমাণ হিসাব ক'রলে দেখা যাবে যে, হয়তো তারাই ক'রে উঠতে পেরেছে বেশী। কেন না রবীন মাষ্টার হিসেব ক'রে দেখতে পেলে যে, তার গাঁয়ের মঙ্গলের জন্যে সে ভেবেছে সব চেয়ে বেশী, তার মাথায় এসেছে রাশি রাশি সঙ্কল্প, যার সিকি পরিমাণ কাজে পরিণত হ'লে গ্রামের চেহারা ফিরে

যেত। কিন্তু সে শুধু ভেবেই গেছে আর ছট-ফটিয়ে ম'রেছে তার সেই বড় বড় সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত ক'রবার জন্যে। কিন্তু যারা এত ভাবে নি, ভেবেছে শুধু স্বার্থের কথা, তারা তবু যতখানি উপকার ক'রেছে, তাও তো ক'রবার সাধ্য হয় নি রবীনের। সতীশ চৌধুরী একটা চমৎকার পুকুর কাটিয়েছে নিজের জন্যে, তার বাগানের শোভা আর জল-সেচের জন্যে, কিন্তু গাঁয়ের লোক আজ তার জল খেয়ে বাঁচছে, আগে চৈত্র-বৈশাখে জলের জন্য হাহাকার লেগে যেতো। ভুবনবাবু ক'রলেন প্রায়শ্চিত্ত—নিজের আধ্যাত্মিক স্বার্থের জন্য তুলাদান ক'ল। গ্রামের অনেক গরীব-দুঃখী তাতে বেঁচে গেল। রবীনের ছাত্র ইয়াসিন—স্বার্থপরের শিরোমণি, কেবল ধাপ্পা দিয়ে মুসলমান চাষীদের মাথায় হাত বুলিয়ে টাকা রোজগার তার ব্যবসা—সে-ও নিজের লাভের চেষ্টায় ক'রলে এক মক্তব। অনেক চাষীর ছেলে তাতে তবু সেই ধর্ম্মের গন্ধে প'ড়তে যাচ্ছে—যা হয়তো তারা ক'রতোই না এ ছাড়া।

আর রবীন, শুধু তার বড় বড় আইডিয়া নিয়ে ধড়-ফড়ানি ছাড়া কি-ই-বা সে ক'রেছে কার? রাশি রাশি বই প'ড়েছে সে, কার কি উপকার হ'য়েছে তাতে? অনেক শুভ-ইচ্ছা আছে তার—দরিদ্রের মনোরথ সে সব—মনের ভিতরই মিলিয়ে গেছে, কোনও উপকারই কারও হয় নি তাতে। ক'রেছে সে স্কুল—সবাই প্রায় ভুলে গেছে সে কথা—কেবল রবীন ভোলে নি। কিন্তু তাই বা সে ক'রেছে কতটুকু? আর সেই স্কুল যেমন ভাবে চ'লছে তাতে উপকার হ'চ্ছে, কি অপকার হ'চ্ছে, কে জানে? যদি এই স্কুল আর এমনি সব বাজে স্কুল না গজাত, তবে হয়তো এ ছেলেগুলো অন্য কোথাও ভাল স্কুলে লেখা-পড়া শিখতো, মানুষ হ'ত। এই সব সস্তা দোকানদারীর স্কুল ক'রে সত্যি সত্যি ভাল স্কুল হওয়া বা

চলা হয়েছে অসম্ভব। রবীন যে স্কুল গ'ড়ে তুলতে চেয়েছিল সে এ-স্কুল নয়। হেডমাষ্টার ম'শায়ের স্রেফ্ দোকানদারী বুদ্ধিতে স্কুলটা যা' হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে রবীনের মনে হ'ল, শিক্ষার নাম ক'রে ছেলেদের কাছ থেকে ঠকিয়ে মাইনে নিয়ে মাষ্টারদের পেট ভরানো হ'চ্ছে, শিক্ষা সত্যি সত্যি হ'চ্ছে না। তাই সে তার জীবনের লাভ-লোকসানের খতেনে এ-স্কুলটাকে লাভের অঙ্কে বসাতে পারলো না।

ভুল, ভুল সব—সারা জীবনটাই তার ভুলের ভিতর দিয়ে কেটে গেছে। এখন আর সে-ভুল শোধরাবার উপায় নেই। বাহান্ন বছর বয়েস তার, আর ক'টা দিনই বা আছে? এর ভিতর কি-ই-বা সে ক'রতে পারবে? আর ক'রবার শক্তিই বা কোথায়? না শরীরে, না মনে আছে তার সেই যৌবনের শক্তি, যা নিয়ে হাজার বাধা অতিক্রম ক'রে, অসাধ্য-সাধন ক'রে সে এই স্কুল প্রতিষ্ঠা ক'রেছিল। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথাটা এই যে, তার মনে সে-উৎসাহের নিশ্বাসটুকুও আর নেই, যাতে বাহুতে শক্তি হয়, মনে উর্বরতা আসে, অসাধ্যও সাধনীয় হ'য়ে ওঠে।

হতাশ হ'য়ে রবীন মাষ্টার শুয়ে প'ড়লো তার বইয়ের পাঁজার ভিতর।

শুয়ে শুয়ে তার মনে হ'ল, এই সব বই সে প'ড়েছে, তন্ন তন্ন ক'রে প'ড়েছে, ঠাস বোঝাই ক'রেছে এর সব বিদ্যা তার মাথায়। কি লাভ হ'য়েছে তাতে? কার কি উপকার হ'য়েছে? তার নিজের হয় নি, কেন না যতই সে পণ্ডিত হ'য়ে থাক, সেই বি-এ ফেলের ছাপ দিয়েই র'য়ে গেল তার সংসারে পরিচয়! আর বাইরের লোক—তাদের কাছে এ বিদ্যে পৌছবার সুযোগই তো হ'ল না কোনো দিন—সে শুধু পড়িয়ে গেল সেই ছাপমারা ছক-কাটা হিষ্টরী-হাইজিন।

দু'দিন বাদে হোক্, দশ দিন বাদে হোক্, তার এত কষ্টের অর্জ্জিত

এই বিদ্যা ধোঁয়া হ'য়ে উড়ে যাবে তার চিতা থেকে। এমন নয় যে, তার ছেলে এ বিদ্যা বাঁচিয়ে রাখবে—সে আশা তার নেই, আর সে ইচ্ছাও তার নেই। সে চায় না যে, তার ছেলেদের কেউ তার মত এমনিই নিরর্থক বিদ্যার বোঝা মাথায় ব'য়ে তারই মত অপদার্থ হ'য়ে দুঃখের জীবন কাটায়। বরং রঘু যা ক'রতে চায়—চাষ-বাস, তাই তারা করুক, সেও ভাল।

আগুনে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে তার বিদ্যা—যেমন আগুনে পুড়ে ছাই হবে এই মুহূর্তে এই বইয়ের পাঁজা, যদি ঐ দেশলাই জালিয়ে সে এর ভিতর ফেলে দেয়।

দেশলাই-জালার কথাটা মনে হ'তেই তার চোখ ব'সে গেল বইয়ের উপর। একটা উগ্র আকাঙ্ক্ষা হ'ল তার দেশলাইটা জেলে একবার ফেলে দিতে এখানে। দাউ দাউ ক'রে জলে উঠবে সবগুলো বই—জলে উঠবে তার এই সাধনার গৃহ—আর সঙ্গে সঙ্গে ছাই হ'য়ে যাবে সে তার সব অনাবশ্যক বিদ্যা নিয়ে! কেন যাবে না?

উঠলো সে ধেয়ে—তুলে নিলে দেশলাই, জাল্‌লে একটা কাটি, ফেলে দিলে বাইরে। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা—কাটি জালতেই লাগলো সে, আর ফেলে দিতে লাগলো সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ভাবে। আর ভাবতে লাগলো—সে যখন এমনি ক'রে তার বইগুলো নিয়ে পুড়ে মরবে, তখন গাঁয়ের লোক কি ব'লবে? কেউ একবার আহা ব'লবে কি? ব'য়ে গেছে তাদের! কার কি লোকসান হবে যে, তারা ভাববে তার কথা?

নিস্তারিণী?—সে হয়ত একটা সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলবে। ছেলেরা?—দুঃখ পাবে তারা, কিন্তু বেশী কিছু নয়। ছেলের জন্যে বাপ যত ভাবে, যত তার দরদ, বাপের জন্যে ছেলের তা' হয় না। দু'দিন

যেতেই স'য়ে যায় সব। তার মনে হ'ল কত লোকের বাপ ম'রেছে, ঘটা ক'রে শ্রাদ্ধ ক'রে ছেলেরা দু'দিন না-যেতে-যেতেই ফূর্ত্তি ক'রতে লেগে যায়। ভুবনবাবু আজ যদি মারা যান, যোগেশ তো কাল নাচতে থাকবে! তা' ছাড়া সে বেঁচে থেকে তার ছেলেদের কি-ই-বা ক'রতে পারবে যাতে তারা তার অভাব মনে ক'রবে বা ক্ষতি-বোধ ক'রবে?

কিছু নয়, কারো প্রাণে লাগবে না সে ম'লে—কেবল একজনের ছাড়া—সে তড়িৎ। তার কথা মনে হ'তে তার প্রাণের ভিতর ছাঁৎ ক'রে উঠলো! ফেলে দিলে সে তার দেশলাইয়ের বাক্স।

তড়িৎ আজও তাকে ভালবাসে। তার জীবনের দুঃখের পরিচয় পেয়ে তড়িৎ—এ বিশাল জগতের ভিতর একমাত্র সে-ই—কেঁদেছিল, আত্মহারা হ'য়ে কেঁদেছিল। এত ভালবাসে সে এই অপদার্থটাকে! যদি সে শুনতে পায় যে, রবীন এমনি ক'রে পুড়ে ম'রেছে, বড় দুঃখ পাবে সে! ভাবতে তার প্রাণের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠলো। দেশলাইর কাটি দিয়ে তার মারাত্মক খেলা ফেলে সে তখন ভাবতে লাগলো।

তড়িতের অ-সুন্দর প্রৌঢ় মূর্ত্তি অলোকসামান্য গৌরব ও শোভায় মণ্ডিত হ'য়ে তার চোখের উপর ভেসে উঠলো। সে তন্ময় হ'য়ে তার দিকে চেয়ে রইলো, অপূর্ব্ব আনন্দের ধারায় ধৌত হ'য়ে গেল তার অন্তর। তড়িৎ তাকে এমনি ভালবাসে, সে-কথা ভাবতে একটা কৃতার্থতার তৃপ্তিতে আপ্লুত হ'য়ে গেল তার চিত্ত, ভেসে গেল তার সারাজীবনের অসার্থকতার ব্যথা। বিভোর হ'য়ে সেই আনন্দ উপভোগ ক'রতে লাগলো।

তারপর সে যখন আবার নতুন ক'রে তার জীবনের কথা ভাবলে, তখন তার মনে হ'ল, এতে হতাশ হবার কোন হেতু নেই। এখনও তো আছে কিছুদিন তার কাজ ক'রবার—হয়তো আরও দশ বছর, কি বিশ

বছর সে বাঁচবে—এর ভিতর কত কাজই তো সে ক'রতে পারে। এই গ্রামখানিই তো বিশ্ব নয়। নাই-বা হ'ল তার আদর এখানে, বাইরে আছে সুধী সমাজ, সেখানে সে সমাদর পাবেই। তার মনে হ'ল তড়িৎ ও তার স্বামীর কথা—পণ্ডিত তারা, তাদের কাছে তার বিদ্যার সমাদর হ'য়েছে। তড়িৎ না হয় ভালবাসে ব'লে তাকে এত আদর ক'রেছে, কিন্তু তার স্বামী? আর ব্ল্যাক সাহেব? তারা তো কেউ নয় তার, তবু তারা তার পাণ্ডিত্যের সমাদর ক'রেছে। একবার যদি রবীন তার এই গ্রামের গণ্ডি ছাড়িয়ে বাইরে সুধী-সমাজে তার বিদ্যার পরিচয় দিতে পারে, তবে তার জীবন বা বিদ্যা অসার্থক হবে না।

তাই সে স্থির ক'রলে—থাক প'ড়ে তার গ্রাম, তাকে তোলা থাক তার গ্রামের হিত চিন্তা, বিশ্বের সেবায় সে নিযুক্ত ক'রবে তার বিদ্যা। এতদিন প'ড়ে প'ড়ে ভেবে চিন্তে যে বিদ্যা সে সংগ্রহ ক'রেছে, তা' সে একখানা বই লিখে চিরকালের জন্য রেখে যাবে। সে যখন ম'রে যাবে, তখন সে-বই থাকবে, তার ভিতর দিয়ে তার এতদিনের সমস্ত সাধনা সার্থক হবে, হয়তো কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে।

এই সিদ্ধান্ত ক'রে সে তক্ষুণি টেনে নিলে তার নোট লেখার একখানা খাতা। তার অৰ্দ্ধেক পাতা তখনও সাদা ছিল। সেই পাতাগুলো বের ক'রে সে চড়্ চড়্ ক'রে লিখে যেতে লাগলো—তার কল্পিত মহা-গ্রন্থের বিষয়ের একটা সংক্ষিপ্ত-সার।

ভেবে-চিন্তে খাতার উপর সে বইখানার নাম লিখলে, "বঙ্গদেশের অর্থনীতির সোস্তালিষ্ট পুনঃসংস্কার"। তার পরিচ্ছেদগুলি সে মোটা-মুটি ভাগ ক'রলে। তারপর দুই মাস খেটে সে প্রত্যেক পরিচ্ছেদের বিষয়ের মোটামুটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখে গেল।

১৩

এখন আর রবীন মাষ্টারকে খুঁজে পাওয়াই দায়। সে স্কুলে যায়-আসে, আর বাকী সময় সে ব'সে ব'সে লেখে। আর কোনও কাজ নেই তার, কোনও ব্যসন নেই। নিস্তারিণী সেই থেকে তার সঙ্গে কথা বন্ধ ক'রেছে, কাজেই তার নিষ্ঠায় কোনও ব্যাঘাত হয় না। তার কথা শোনবার মত ক'রে কেউ কোনও দিন শোনে নি, কিন্তু তবু তার সম্বন্ধে কৌতূহলের অন্ত ছিল না গ্রামের লোকের। এই অদ্ভুত পাগল মাষ্টার কখন কি করে, তার খোঁজের দরকার হ'ত সবার কেবল কৌতুকের খোরাক জোগাবার জন্যে। তাই রবীন মাষ্টারকে কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে দেখে সবাই ব্যস্ত হ'য়ে অনুসন্ধান ক'রতে লেগে গেল এবং কথাটা আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হ'য়ে গেল যে, রবীন মাষ্টার দিন-রাত ব'সে ব'সে লেখে। অমনি যারা 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প'ড়েছে বা গাঁয়ের সখের থিয়েটারে তার অভিনয় দেখেছে, তাদের মনে প'ড়ে গেল সেই প্রসিদ্ধ খাতার কথা।

হেডমাষ্টারকে এক দিন যোগেশ হেসে ব'ললে, "এইবার সাবধান স্যর, রবীন মাষ্টার লিখছেন।"

হেডমাষ্টার হেসে ব'ললে, "লিখুক গে। থোড়াই-কেয়ার করি তাতে। হতভাগা জানে না তো যে, ব্ল্যাক সাহেব ছুটি নিয়ে বিলেত গেছেন।"

হেডমাষ্টার ভেবেছিলেন রবীন মাষ্টার হয়তো আবার ব্ল্যাক সাহেবকে চিঠি লিখছে। সে কথা তিনি আগেই হিসেব ক'রেছিলেন, কিন্তু তাতে ভড়কান নি, কেন-না তার আগেই তিনি খবর পেয়েছিলেন যে, ব্ল্যাক সাহেব লম্বা ছুটি নিয়ে বিলেত গেছেন।

যোগেশ ব'ললে, "চিঠি লিখছেন না স্যর, লিখছেন তিনি 'বৈকুণ্ঠের খাতা'—আপনাকে শুনিয়ে ছাড়বেন।"

'হোঃ হোঃ' ক'রে হেসে উঠে হেডমাষ্টার সকৌতূহলে জিজ্ঞেস ক'রলেন, "ব্যাপারটা কি ?" শুনে তিনি আবার 'হোঃ হোঃ' করে হেসে ব'ললেন, "কি সব funny idea আসে পাগলদের মাথায়! ও লিখছে বই—তাই না-কি লোকে প'ড়বে। পয়সা খরচ ক'রে কিনবে। হাঃ—হাঃ—হাঃ! কি লিখছে ? নাটক না উপন্যাস ?"

যোগেশ ব'ললে, "না, আমার মনে হয় 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সঙ্গীত-শাস্ত্রের'—ইত্যাদি—বলুন না ছাই, অত-বড় টাইটেল্‌টা কি আমার মনে থাকে।"

আবার এক চোট হাসি হ'য়ে গেল।

রবীন মাষ্টার তখন এসে প'ড়লো সেই ঘরে। এরা দু'জন মুখ টিপে পরস্পরকে চোখ-ইসারা ক'রতে লাগলো।

রবীন মাষ্টার আজ বেরিয়ে এসেছে তার পাঠাগার থেকে ভুবনবাবুর ভারী ব্যারামের খবর পেয়ে।

ভুবনবাবুর ভারী ব্যারাম, আজ দশ দিন তিনি শয্যাগত, গ্রামের ডাক্তার-ক'বরেজ অনবরত হাজির আছে, সবাই অমঙ্গলের আশঙ্কা ক'রছে এবার বুঝি আর তাঁর রক্ষা নেই। এই খবর পেয়ে এসেছে রবীন মাষ্টার। এসে যোগেশের ঘরে শুনতে পেলো হাসির কলরোল। অবাক্ হ'য়ে সে এখানে ঢুকে প'ড়ে জিজ্ঞেস ক'রলে, "কর্ত্তা কেমন আছেন, যোগেশ ?"

"একই রকম। জর লেগেই আছে, আর বেশীর ভাগ সময় ঘুমের মত হ'য়ে থাকেন।"

আর তার মাঝখানে যোগেশের এই অট্টহাস্য।

একটা ঘা-খাওয়া গোছ হ'য়ে রবীন মাষ্টার ব'সে পড়লো। তারপর সে মনে মনে হাসলে, ভাবলে, না হবে কেন? এই তো হ'চ্ছে দুনিয়ার দিন-রাত!"

কোঁচা দিয়ে কপালের ঘাম মুছে সে আবার জিজ্ঞেস ক'রলে, "ক'দিন ধ'রে এমন চ'লছে?"

"দশ দিন হ'ল অসুখ হ'য়েছে, এমন ভাব চ'লছে আজ তিন দিন।"

ব্যস্ত হ'য়ে রবীন ব'ললে, "বাইরে থেকে একজন বড় ডাক্তার এনে দেখাও না।"

"সে কথা ব'লেছিলাম ওঁকে, উনি কিছুতেই আনতে দেবেন না। বলেন, মিথ্যে টাকা খরচ—"

উত্তেজিত ভাবে রবীন ব'ললে, "উনি ব'লতে পারেন সে কথা কিন্তু তোমার তা' শোনা উচিত নয়!"

ব'সে কিছুক্ষণ গুম্ হ'য়ে ব'সে রইলো রবীন মাষ্টার। শেষে ফিক্ ক'রে হেসে সে ব'ললে, "তা ঠিক ক'রেছ—বিষয়টা!"—ব'লে সে উঠে চ'লে গেল।

কথাটা শুনে যোগেশের ভারী রাগ হ'ল। রবীন মাষ্টারের কথার অর্থ সে ঠিকই বুঝলে—সে বুঝলে যে, তাড়াতাড়ি বিষয়ের মালিক হবার জন্যে যোগেশ বাপের চিকিৎসার সুব্যবস্থা ক'রছে না, এই ইঙ্গিত ক'রে গেল রবীন মাষ্টার। সে গুম্ হ'য়ে মুখ লাল ক'রে ব'সে রইলো।

হেডমাষ্টার কিন্তু রবীন মাষ্টার চ'লে যেতেই হেসে ব'ললে, "একেবারে পাগল হ'য়ে গেছে। ক্ষণে রাগ, ক্ষণে হাসি। ঘটে যদি এক কোঁটা বুদ্ধি অবশিষ্ট থাকতো তবে কি ও হাসে এ কথায়—আর এই সময়ে!"

তিনি নিজে যে কেবলি হাসছেন সেই থেকে, সেটা তাঁর মাথায় এলো না।

যোগেশ কথাটা শুনে একটু হাসলো। তারপর সে বিদায় হ'য়ে ভিতরে গেল। তার একটু পরেই লোক গেল টেলিগ্রাম ক'রতে সহর থেকে বড় ডাক্তার আনবার জন্যে।

সিভিল সার্জ্জেন ও অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জেন এলেন। তাঁরা রোগী পরীক্ষা ক'রে মুখ ভার ক'রে প্রেসক্রপশন দেখতে চাইলেন। প্রেসক্রপশন লেখা ছিল না, গাঁয়ের ডাক্তারবাবু মুখে মুখে তা ব'ললেন, শুনে তাঁরা চ'মকে উঠলেন। গ্রামের ডাক্তারবাবু এবং ক'বরাজ ম'হাশয় দু'জনে মিলে রোগ নির্ণয় ক'রেছিলেন, ডাক্তারবাবু ওষুধ দিয়েছিলেন, ক'বরাজ ম'শায়ও মাঝে মাঝে এটা-ওটা দিচ্ছিলেন। ডাক্তারেরা ব'ললেন, রোগ বুঝতে না পেরে চিকিৎসা করা হ'য়েছে আগাগোড়া ভুল। যে ওষুধ দেওয়া হ'য়েছে, তাতে রোগ অসাধ্য হ'য়ে উঠেছে। তবু এ অবস্থায় যা করা যেতে পারে, তার উপদেশ দিয়ে তাঁরা বিদায় হ'লেন।

গ্রামের ডাক্তার তখন মুখ বেঁকিয়ে ব'ললেন, "গেলেন খুব এক চাল চেলে। যখন হালে পানি পায় না, তখন দেখছি বড় ডাক্তারেরা ঠিক এই কথাই বলে—দোষ চাপায় অন্যের ঘাড়ে।"

ক'বরাজ ম'শায় ঘাড় নেড়ে ব'ললেন, "যা ব'ললে ভায়া। নাড়ীতে দেখ্ছি স্পষ্ট সান্নিপাত-ক্ষেত্রে জ্বর—তা নয় হ'য়েছে না-কি পেটের মধ্যে কোথায় ঘা—সব বাজে!"

যোগেশের কিন্তু কথাটা শুনে মনের ভিতর লাগলো বড্ড ঘা। তার মনে হ'ল রবীন মাষ্টারের সেই তিরস্কার—"বাবা ব'লতে পারেন, কিন্তু তোমার উচিত হয় নি তাঁর কথা শোনা।"

খানিকক্ষণ সে গম্ভীর হ'য়ে ব'সে রইলো শুধু। চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে প'ড়লো। আর কি-ই বা ক'রতে পারে সে!

দু'দিন বাদে ভুবনবাবু মারা গেলেন। এ দু'দিন রবীন মাষ্টারের লেখা-পড়া বন্ধ রইলো। বার বার সে ব্যস্ত হ'য়ে জমীদার বাড়ী ছুটাছুটি ক'রতে লাগলো।

যে লোক তাকে দেখতে পেলেই হয় পাশ কাটিয়া যায়, না হয় মাথা নীচু ক'রে চোখের জল ফেলে।

ভুবনবাবুর শবদেহ খুব ঘটা ক'রে সাজিয়ে সঙ্কীর্তন ক'রতে ক'রতে সবাই শ্মশানে নিয়ে গেল।

রবীন মাষ্টার তফাতে এক পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো— এক একবার সে হঠাৎ হেসে উঠলো।

তার হাসি যারা দেখলো, তার মধ্যে অনেকে গেল চ'টে কিন্তু যোগেশ একবার দেখে যেন লজ্জায় ম'রে গেল।

রবীন মাষ্টার ভাবছিল, পয়সা খরচের ভয়ে চিকিৎসা হ'ল না ভুবনবাবুর, আর তাঁকে সৎকার ক'রবার জন্যে আড়ম্বর কত! ভাবছিল, কি বোকামী মানুষের! মড়াটা—সে শুধু মড়াই, ইট-কাঠের সামিল, তবু তাকে নিয়ে কি আড়ম্বর! ভাবছিল, চোখ বুজলেই যেখানে সব শেষ, সেখানে মানুষ জীবন ভ'রে এত ছট্‌ফটায় কেন? জীবন ভ'রে মারামারি কাটাকাটি করে কেন? দু'টো টাকার জন্যে ছেলে বাপের মৃত্যু কামনা করে কেন? বিষম বুজরুকি এ দুনিয়া! ভাবতে হাসি পায়!

মনটা এই সব চিন্তায় এত ভ'রে গিয়েছিল তার যে, সে এর সবটাই নিজের মনের ভিতর আটকে রাখতে পারলে না।

একজন ব'লছিল, "ভুবনবাবু অত বড় লোক—তাঁকে শ্মশানে নিয়ে যাবে—এমনি না হ'লে কি মানায়!"

রবীন মাষ্টার ব'ললে, "কে ভুবনবাবু? ঐ মড়াটা? ক্ষেপেছ? দাবা খেলতে পারে ও?"

সে লোকটা অবাক্ হ'য়ে রবীন মাষ্টারের দিকে চাইলে, কিন্তু কিছু ব'ললে না, ভাবলে, "পাগল ও, ওর কথা শোনে কে?"

রবীন ব'ললে, "আচ্ছা আমি যদি বলি, তোমায় এর চেয়ে দশগুণ ঘটা ক'রে নিয়ে পোড়াব, তবে তুমি ম'রতে রাজী আছ?"

লোকটা স'রে দাঁড়াল, সে ভাবলে, ভুবনবাবুর শোকে রবীন মাষ্টারের বুদ্ধি-সুদ্ধি যা'ও বা ছিল, তা'ও গেছে। ওর কাছে থাকা নিরাপদ নয়, চাই কি এক্ষুণি হয়তো তাকে মেরে খাটিয়ায় চড়িয়ে ব'সবে, সমারোহ ক'রে ঘাটে নিয়ে যাবার জন্যে!

সদর নায়েব ম'শায়কে ডেকে সে জিজ্ঞেস ক'রলে, "ভুবনবাবুর সৎকার থেকে শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত খরচের বরাদ্দ হ'য়েছে কত?"

সদর নায়েব ব'ললে, "বরাদ্দ কিছুই হয় নি, কিন্তু খরচ হবে হয়তো হাজার দশেক টাকা।"

রবীন মনে মনে হিসাব ক'রে ব'ললে, "জোর হাজার টাকা খরচ ক'রলে চিকিৎসা হ'ত! কিন্তু, হাঁ—বিষয়টা!"

সদর নায়েব কিছুক্ষণ হাঁ ক'রে তার দিকে তাকিয়ে থেকে স'রে দাঁড়াল। ভাবলে সে, পাগলা মাষ্টার একদম ক্ষেপে গেছে!

* * * *

কয়েকদিন পরে ভুবনবাবুর বাক্স-পেটরা ঘাঁটতে ঘাঁটতে যোগেশ দেখলে এক উইল! যোগেশ চ'মকে উঠল। কাউকে কিছু না ব'লে সে উইলখানা নিয়ে নিজের ঘরে ব'সে প'ড়লে।

যোগেশেরা তিন ভাই। যোগেশ শুধু সাবালক, আর দু'টি নাবালক। তার মা অনেক দিন গত হ'য়েছেন; বোনেদের বিয়ে হ'য়ে গেছে।

উইলে ভুবনবাবু যোগেশকে দিযে গেছেন সম্পত্তির আট আনা, আর দু'-ভাইকে দিযে গেছেন চার আনা চার আনা ক'রে।

শুধু এইটুকু যদি থাকতো উইলে, তবে যোগেশ তখন নাচতে থাকতো, কিন্তু উইলে আরও কথা ছিল, তাতে তাকে ভ'ড়কে দিলে।

উইলে ভুবনবাবু বিধান ক'রেছেন যে, তাঁর ঠাকুরের যে দেবোত্তর সম্পত্তি তিনি ক'রেছেন, তার উপস্বত্ব থেকে বছরে পাঁচ শত টাকা গ্রামবাসীর শিক্ষা বা অন্যান্য বিষযে হিতসাধনের জন্য খরচ হবে, সে টাকাটা প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে রবীন মাষ্টারকে দিতে হবে, তিনি তাঁর ইচ্ছামত এই সবের মধ্যে যে-কোনও হিতকর-কার্য্যে খরচ ক'রতে পারবেন।

এর চেযেও মারাত্মক কথা এই যে, উইলের একমাত্র একজিকিউটার করা হ'যেছে রবীন মাষ্টারকে। সব ক'টি ছেলে সাবালক না হওযা পর্য্যন্ত উইল অনুসারে কাজ ক'রবে সে।

সর্ব্বনাশ! এ তো সম্পত্তি রবীন মাষ্টারের হাতে তুলে দিযে পথে ব'সবার কথা।

উইলখানা রেজেষ্ট্রী করা হয নি। ভুবনবাবু এটা ক'রেছিলেন দশ-বারো বছর আগে, এর সাক্ষীর ভিতর রাধানাথবাবু আছেন বিদেশে, আর দু'জন সাক্ষী মারা গেছেন—আর কেউ এর খোঁজ জানেন না। সুতরাং এটা চাপা দেওযা সম্ভব। কিন্তু ঐ যে আট আনা সম্পত্তি, যোগেশের তা'হলে সেটা হ'যে যায পাঁচ আনা ছ'গণ্ডা দু'কড়া দু'ক্রান্তি!

বিষম ফাঁপরে প'ড়ে গেল যোগেশ। কি করে কিছুই ভেবে উঠতে পারলো না। কারও সঙ্গে পরামর্শ ক'রতেও তার সাহস হ'ল না। চুপচাপ সে উইলখানা সিন্দুকে বন্ধ ক'রে রেখে দিলে।

তার পর শ্রাদ্ধ-শান্তি সব হ'যে গেলে পিতার অস্থি গঙ্গায দেবা'র উপলক্ষ ক'রে যোগেশ গেল ক'লকাতায। সেখানে খুব বড় একজন

উকীলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রলে। উকীলবাবু তাকে উপদেশ দিলেন, উইলখানা থাকুক তোলা। ভাইয়েরা বড় না হওয়া পর্য্যন্ত সম্পত্তি তো যোগেশের হাতেই থাকবে, সুতরাং সে-পর্য্যন্ত প্রোবেট নেবার কোনও দরকার নেই। এর ভিতর রবীন মাষ্টার মারা যাবেই বোধ হয়, তার পর প্রোবেট নিলে কোনও হাঙ্গামা থাকবে না।

যোগেশ নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী ফিরে গেল।

এর পর এক দিন রবীন মাষ্টার তাকে হঠাৎ ব'ললে, "হাঁ হে যোগেশ, তোমার বাবার কোনও উইল-টুইল ”

যোগেশের বুকটা কেঁপে উঠলো। সে শুষ্কমুখে ব'ললে, "না।"

রবীন মাষ্টার ব'ললে, "ভারী আশ্চর্য্য কিন্তু।"

যোগেশের বুকের ভিতর দুড়্-দুড়্ ক'রে উঠলো। তবে কি রবীন মাষ্টার সব জানে? সে কি জানে যে, সেই একৃজিকিউটার, আর তাকে পাঁচ-শো টাকা দিতে হবে বছরে? ভাবতে ভবে তার প্রাণ কেঁপে উঠলো। বড ভয়ে ভয়েই সে দিন কাটাতে লাগলো, আর প্রতিদিন রবীনের মৃত্যু-কামনা ক'রতে লাগলো।

অভাগা রবীন মাষ্টার! এমনি ক'রেই চিরদিন সৌভাগ্য তার দোর গোড়ায় এসে ফিরে গেছে। ওই পাঁচ-শো টাকা ক'রে যদি সে আজ হাতে পেতো, তবে তার জীবনের গতি ফিরে যেতো, নতুন উৎসাহে সে লেগে যেতো গ্রামের হিত-সাধনের চেষ্টায়। জীবনের তার একটা মানে হ'ত!

সে হ'ল না। সে প্রাণপণে তার বই লিখতে লাগলো।

রবীনের বইয়ের বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার, অনেক কাটাকুট যোগবিয়োগ ক'রে শেষ হ'ল। তার পর সে লিখতে আরম্ভ ক'রলে বইখানা। একটা পরিচ্ছেদ শেষ ক'রে সে ফিরে প'ড়লে—প'ড়ে ভালই লাগলো তার। মনে হ'ল একবার কোনও সমজদার লোক পেলে তাকে প'ড়ে শুনিয়ে নিলে সুবিধা হ'ত। ব্লাক সাহেব যদি থাকতো! কিম্বা—তড়িৎ যদি থাকতো!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ লিখছে যখন, তখন একদিন সে একটা 'তার' পেয়ে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। 'তার' ক'রেছে সুকেশ। তাতে যে সংবাদ ছিল তাতে রবীনের সমস্ত শরীর অসাড় ক'রে দিলে।

সুকেশ লিখেছে, "তড়িৎ মৃত্যু-শয্যায়, রবীনকে একবার দেখতে চায়।" 'তার' ক'রে টাকা পাঠিয়ে সুকেশ তাকে অবিলম্বে দিল্লী যেতে ব'লেছে।

আড়ষ্ট হ'য়ে কিছুক্ষণ ব'সে রইলো রবীন। তারপর তাড়াহুড়ো ক'রে উঠে সে তড়িতের-দেওয়া সেই সুটকেশ ও বিছানা বাঁধা-ছাদা ক'রে রওনা হ'ল। স্কুলে ছুটি নেবার কথা তার মনে হ'ল না, নিস্তারিণীকে খবর দেবার কথাও মনে জাগল না।

উদ্বেগের বোঝা মাথায় নিয়ে এ দীর্ঘ পথ যে সে কোথা দিয়ে কেমন ক'রে গেল, সে কথা সে জানলেই না, খেয়ালই হ'ল না।

চার দিনে সে দিল্লী পৌঁছল।

সুকেশের অফিসের এক চাপরাসী ষ্টেশন থেকে তাকে নিয়ে বাড়ী গেল। সেখানে পৌঁছতেই সুকেশ নেমে এসে সাশ্রু-নয়নে তাকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে গেল একটা ঘরে।

সেখানে শুয়ে ছিল তড়িৎ চিরনিদ্রায়।

আজ প্রত্যূষে তার শেষ নিশ্বাস প'ড়ে গেছে।

বেত্রাহতবৎ চমকিত হ'য়ে রবীন চাইলে সুকেশের দিকে—সুকেশ শুধু ইঙ্গিতে জানালে সব শেষ হ'য়ে গেছে।

ঘনঘটাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রে বন্ধুর কণ্টকাবৃত পথে চ'লেছিল রবীন ক্ষতবিক্ষত চরণে,—অভিযোগ করে নি সে কোনও দিন কারও কাছে। জীবনে সুখের স্বাদ যে সে পেয়েছে কোনও দিন, তাও সে ভুলে গিয়েছিল। জীবনের সায়াহ্নে হঠাৎ আকাশ ফেটে ভেঙ্গে প'ড়েছিল তার মাথার উপর আলো—তার সেই নষ্ট-স্বর্গের মধুর স্মৃতি হেসে উঠেছিল চারিদিকে, পত্র-পুষ্পে ভ'রে উঠেছিল তার পথ, শুধু এক মুহূর্ত্তের জন্য রঙ্গীন হ'যে উঠেছিল তার অন্তর। কি দরকার ছিল সে সুখের স্বাদে, যদি পরমুহূর্ত্তে এমনি ক'রে নিঃশেষে লুপ্ত হ'য়ে যাবে তার নয়নের সে আলো? কি প্রয়োজন ছিল সেই সুখের স্বাদ পেয়ে জীবনকে আরও বিষাক্ত ক'রবার? এই প্রশ্ন শুধুই তার মনে জেগে উঠলো তার নির্ব্বাক বেদনার স্তূপীকৃত নিঃশব্দতা ভেদ ক'রে। আর কোনও কথা মনে হ'ল না তার—সে শুধুই ক'রতে লাগলো তার অদৃষ্টের উপর এই ব্যর্থ অভিযোগ।

অনেকক্ষণ পরে সে উঠে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল তড়িতের সেই মৃত্যু-শয্যার পাশে সন্তর্পণে পা ফেলে—যেন পদশব্দে ঘুম ভেঙে যাবে তড়িতের।

বুভুক্ষু দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে সে তড়িতের শুষ্ক চক্ষের দিকে—মনে প'ড়লো তার এই সে দিন, কি করুণা, কি স্নেহ, কি অনুরাগ ফুটে উঠেছিল তার ঐ দু'টি অপরিমেয় চোখের দৃষ্টিতে। ধন্য ক'রে দিয়েছিল

তাকে ঐ দু'টি চোখের অপূর্ব্ব দীপ্তি। আজ কোথায় সে দীপ্তি, কই সে করুণা, সে অনুরাগ ?

ফুল দিয়ে ঢাকা হ'য়ে গেছে সারা দেহ তড়িতের, কিন্তু সেই ফুলশোভা কুসুম স্তবকের মাঝখানে—ও-কি! একটা জীর্ণ মলিন ক্যাম্বিসের ব্যাগ! তড়িতের বুকের কাছে—তারই সেই ব্যাগ, যেটা তড়িৎ রেখে দিয়েছিল তার স্মৃতি-চিহ্ন ব'লে!

সেই ক্যাম্বিসের ব্যাগ অনেক কথা ব'লে দিলে তাকে—একটা নিদারুণ হাহাকারে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলো তার চিত্ত—সে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ঝাঁপিয়ে প'ড়লো তড়িতের মৃত বক্ষে।

এই সে-দিন ভুবনবাবুর মৃতদেহ দেখে সে ব'লেছিল, "ও তো মড়া, কাঠ-পাথরের মত শুধু—ভুবনবাবু তো নয়।"

আজ তার সে কথা মনে হ'ল না মোটেই। তড়িৎ যে ম'রে গেছে, তড়িৎ যে নেই, কিছুতেই মনের ভিতর পৌঁছল না তার এ-কথা। মনেও হ'ল না একবার যে, তড়িৎ তার কেউ নয়—সে পরের স্ত্রী। আকুল হ'য়ে তার বুকের উপর প'ড়ে সে কাঁদতে লাগলো, নিবিড় ভাবে আলিঙ্গনে চেপে ধ'রলো তার দেহ, এই যেন তড়িৎ—তার তড়িৎ—তার অন্ধকার জীবনের একমাত্র আলো।

সৎকার শেষ ক'রে যখন ফিরে এলো তারা, তখন সুকেশ তার কাছে ব'ললে তড়িতের কথা।

কয়েকমাস হ'ল তার অসুখ হয়।

কিছুদিন হ'ল ডাক্তারেরা আবিষ্কার ক'রলেন যে, তার পেটের ভিতর ক্যানসার হ'য়েছে। সেই দিন সবাই জানলো, তড়িৎও জানলো যে, মৃত্যু তার নিশ্চয়—শুধু জানলো না কেউ কবে সে-মৃত্যু আসবে। সবারই আশা ছিল বিলম্ব আছে।

সেই দিন রাত্রে তার মৃত্যু নিশ্চয় জেনে তড়িৎ সুকেশকে ব'ললে, "একটা কথা ব'লবো ? রাগ ক'রবে না তুমি ?"

সুকেশ ব'ললে, "কি কথা মণি, বল, কোনও কথাতেই আমি রাগ ক'রবো না।"

কিন্তু অনেকক্ষণ বলি বলি ক'রেও সে ব'লতে পারলো না কথাটা।

সে ব'ললে, "দেখ, কুড়ি বছর হ'ল তোমার সঙ্গে বিয়ে হ'য়েছে। কুড়ি বছর একসঙ্গে কাটিয়েছি আমরা আনন্দে। এর ভিতর আমি তোমাকে কি ভালবাসায়, কি সেবায় কোনও ত্রুটি ক'রেছি কি ?"

সুকেশ ব'ললে, "না তড়িৎ, তুমি যে সমস্ত জীবন আমার ভ'রে দিয়েছ তোমার সেবা দিয়ে, স্নেহ দিয়ে। তোমার মত স্ত্রী পেয়েছি—এ যে আমার জন্ম-জন্ম তপস্যার ফল।"

তড়িৎ তবু কি যেন ব'লতে চায়, কিছুতেই পারে না ব'লতে। শেষে ব'ললে সে, "এখন আমি আর বাঁচবো না, ঠিক তো ?"

"কেন বাঁচবে না মণি? যত রকম চিকিৎসা সম্ভব সব আমি ক'রবো—আমার সর্ব্বস্ব গেলেও তোমায় বাঁচিয়ে তুলবো। কেন পারবো না ?"—ব'লতে সুকেশের চক্ষু জলে ভ'রে উঠলো।

ক্ষীণ বাহুতে তার মুখখানা বেষ্টন ক'রে তড়িৎ তাকে একটি চুমো খেয়ে ব'ললে, "তোমার যা ক'রবার তা তুমি ক'রবে, সে কি আবার ব'লতে হ'বে আমায়? কিন্তু এ হ'তে তো কেউ বাঁচে না। আমিও বাঁচবো না, কেমন ?"

সুকেশ কি আর ব'লবে, চোখ নীচু ক'রে রইলো।

"মরাই যদি আমার ঠিক হয়, না-ই যদি আমি বাঁচি, তবে যখন নিশ্চয় সে কথা জানবে—তখন একবার তাঁকে—মাষ্টার ম'শায়কে

দেখাবে আমার ম'রবার আগে? ম'রেই যখন যাচ্ছি, তখন—তখন এতে দোষ আছে কি?"

সুকেশ ব'লল, "এই কথা। এর জন্যে এত? তার জন্যে ম'রবার দরকার তো নেই তড়িৎ, আমি এখুনি টেলিগ্রাম ক'রে দিচ্ছি তাঁকে আসতে।"

"না, না, বেঁচে থাকলে হয়তো ব'লতাম না আমি। ক'লকাতায় তাঁকে দেখে অবধি আমার মনে হ'চ্ছিল যে, বুঝি তোমার কাছে অপরাধ ক'রছি। কিন্তু এখন—ম'রতে যখন যাচ্ছি তখন—তখন দোষ নেই তো, কি বল?"

সুকেশ তার মুখ-চুম্বন ক'রে ব'ললে, "না, কিসের দোষ? আমি এখনি তাঁকে টেলিগ্রাম ক'রে দিচ্ছি।"

টেলিগ্রাম গেল চ'লে। কিন্তু হঠাৎ ধাঁ-ধাঁ ক'রে তড়িতের অবস্থা এত খারাপ হ'তে লাগলো যে, ডাক্তারেরা কিছু ক'রেই কিছু সামলাতে পারলেন না।

নিদারুণ যন্ত্রণায় ছটফট্ ক'রছিল তড়িৎ। বার বার সে জিজ্ঞাসা ক'রলে রবীন মাষ্টার এসেছেন কি-না? উত্তরে যখন শুনলে তার আসবার সময় এখনও হয় নি, তখন সে ব'ললে, "আমার ড্রয়ারের ভিতর একটা ক্যানভাসের ব্যাগ আছে—নিয়ে এসো।" ক্যানভাসের ব্যাগটা বুকের কাছে জড়িয়ে ধ'রে সে শান্ত হ'য়ে চোখ বুজলে।

তারপর আবার চোখ মেলে সে সুকেশকে কাছে ডেকে তার পায়ের ধূলো নিয়ে ব'ললে, "সারা জীবন তুমি আমায় কি ভালই বেসেছ, কত সুখ দিয়েছ আমায়। আমার এ শেষ অপরাধ ক্ষমা ক'রো।"

তারপর সে আর কথা কইতে পারে নি, কিন্তু চোখ মেলে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়েছিল চারিদিক রবীনকে দেখবারই আশায়।

সব কথা শেষ ক'রে সুকেশ জলভরা চোখে ব'ললে, "বড় দুঃখ র'য়ে গেল প্রাণে, তার শেষ ইচ্ছাটা পূর্ণ ক'রতে পারলাম না।"

তারপর সে আবার ব'ললে, "এ জীবনে সে আমাকে কায়মনোবাক্যে সেবা ক'রেছে, ভালবেসেছে, পত্নী-সৌভাগ্য এমন কারো হ'য়েছে ব'লে জানি না, কিন্তু মরণের সময় সে চেয়ে গেছে আপনাকেই। তাতে কোনও দুঃখ নেই, কোনও অভিযোগ নেই আমার। আমি স্বচ্ছন্দচিত্তে আশীর্ব্বাদ ক'রে তাকে সব বন্ধন থেকে মুক্তি দিচ্ছি। এ জীবনে আমার মহাসৌভাগ্যের জোরে সে আমার হ'য়েছিল, কিন্তু পরলোকে সে আপনার। ভগবান করুন, পরলোকে যেন আপনাদের মিলন হয়।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রবীন ব'ললে, "পরলোক! কোথায় পরলোক? পরলোক তো নেই! এখানেই যে সব শেষ।"

আহত হ'য়ে সুকেশ তাকে ব'ললে, "পরলোক নেই? বলেন কি রবীনবাবু? বিশ্বাস করেন না আপনি পরলোক?"

শান্ত-গভীর বিষাদের সহিত রবীন ব'ললে, "না, পরলোক যদি থাকতো, তবে দুঃখ পেতাম না আমি। কিন্তু নেই। সব শেষ হ'য়ে গেছে, ঐ চিতার ধোঁয়ার সঙ্গে সব মিলিয়ে গেছে, আমার এ অভিশপ্ত জীবনের একমাত্র আলো নিভে গেছে সুকেশবাবু—আমি এখন একেবারে নিঃস্ব, রিক্ত! তাই তো আমার দুঃখ রাখবার ঠাঁই নেই।"

সুকেশ ব'ললে, "মাপ করবেন রবীনবাবু। আপনি বিশ্বাস না করেন না করুন, আমার বিশ্বাসটুকু কেড়ে নেবেন না। আমায় বিশ্বাস ক'রতে দিন, তিনি এখনো আছেন, এখানেই তিনি আছেন আমাদের কাছে। তাঁকে উদ্দেশ ক'রে আমি ব'লছি, আমার আর কোনও দাবী নেই তাঁর উপর—তিনি এখন সম্পূর্ণ আপনার।"

এর পর রবীন আর কিছু ব'ললে না।

দিল্লীতে থাকতে রবীনের যেন দম ফেটে যেতে লাগলো। তড়িতের শত স্মৃতি-চিহ্ন তার চারি দিকে তাকে যেন বৃশ্চিকের মত কামড়াতে লাগলো। সুকেশ তাকে একটি একটি ক'রে সব দেখালে। যে কলেজে তড়িৎ পড়াত, লাইব্রেরীতে যেখানে ব'সে সে প'ড়তো, যেখানে সে বেড়াতে ভালবাসতো—সব সুকেশ তাকে দেখালে—দেখে দেখে রবীনের চোখ জ্ব'লে যেতে লাগলো।

দু'দিন বাদে সে ব'ললে, "আমায় এখন বিদায় দিন সুকেশবাবু।"

সুকেশ এ কথা শুনে কেঁদে ফেল্‌লে, ব'ললে, "যাবেন আপনি—দু'দিন থাকুন না! আপনি যতক্ষণ আছেন, আমার মনে হ'চ্ছে সে-ও আমার কাছে আছে—আপনি গেলে হয়তো চ'লে যাবে।"

এই করুণ আত্ম-বঞ্চনার কথা শুনে রবীন কেঁদে ফেল্‌লে।

পরের দিন যাওয়া স্থির হ'ল।

উদাস হতাশ হৃদয়ে রবীন মাষ্টার বাড়ী ফিরে এলো।

বাড়ী ফিরে এসে সে তার ব'সবার ঘরে গিয়ে চিৎপাত হ'য়ে শুয়ে প'ড়ে রইলো। মনের ভিতর আগুন জ্বলছিল তার, চোখ দু'টো হ'য়েছিল মরুভূমির মত শুকনো জ্বালাময়।

রবীন মাষ্টার এসেছে—এসে ভিতরে আসে নি, বাইরের ঘরে প'ড়ে আছে শুনে নিস্তারিণীর পিত্ত জ্ব'লে গেল।

অনেকদিন সে স্বামীর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ ক'রেছিল, কিন্তু এখন এতটা সে চুপ ক'রে আর সইতে পারলে না।

* * * *

রবীন যখন চ'লে যায় তখন নিস্তারিণী জানতে পারে নি, সে

ঘুমিয়েছিল। পরে যখন শুনতে পেলে যে, রবীন তল্পী-তল্পা নিয়ে চুপচাপ বেরিয়ে গেছে, তখনই সে স্থির ক'রলে যে, নিশ্চয় সে গেছে তড়িতের কাছে। স্বামীর বুড়ো বয়সে এ প্রেম-রোগের কল্পনায় তার চিত্ত অধীর হ'য়ে গেল ক্রোধে—সে রাগে শুধুই ফুলতে লাগলো।

এর পর ক'দিন সে ছেলে-পিলেদের অনর্থক মেরে খুন ক'রলে, মাতঙ্গীকে একদিন ঝাঁটা-পেটা ক'রলে, আর, তিন দিনের ভিতর গ্রামের সবার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে নিলে।

রবীন যে দিন গেল, সেই দিনই হেড মাষ্টার তার বাড়ীতে চাপরাসী পাঠিয়েছিলেন রবীনের খোঁজ নিতে। তারপর রোজ খোঁজ নিয়েছেন তিনি। তিন দিন পরে হেড মাষ্টার রবীনের নামে একখানা চিঠি পাঠিয়ে জানালেন যে, ছুটি না নিয়ে রবীন মাষ্টার কামাই ক'রেছেন; তিনি যদি পরের দিন স্কুলে হাজির হ'য়ে তাঁর অনুপস্থিতির সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারেন, তবে তাঁকে ডিস্‌মিস্‌ করা হবে।

নিস্তারিণী চিঠিখানা পেয়ে একজনকে ডেকে সেটা পড়ালে। পত্রের মর্ম্ম শুনে নিস্তারিণী একেবারে আগুন হ'য়ে উঠলো। প্রথমে সে বাড়ীতে ব'সে গলা ফাটিয়ে খুব এক চোট গালি-গালাজ ক'রলে অনুপস্থিত রবীনকে লক্ষ্য ক'রে। তারপর বিকেলে সে মারমূর্ত্তি হ'য়ে ছুটলো হেডমাষ্টারের বাড়ী।

হেড মাষ্টার ব'সে খাবার খাচ্ছিলেন, তাঁর স্ত্রী সেখানে ব'সে ছিলেন। নিস্তারিণী এর আগে কখনো হেডমাষ্টারের সামনে বেরোয় নি, এবার সে একেবারে ঝড়ের মত তার সামনে এসে বললে, "হ্যাগা হেডমাষ্টার বাবু, ভারী যে হেডমাষ্টারী-চাল চালাতে এসেছ! আমার সোয়ামীকে না-কি ডিস্‌মিস্‌ ক'রতে চাও?"

হেড মাষ্টার তখন একটা সন্দেশে কামড় দিতে যাচ্ছিলেন, সন্দেশ

হাতে ধরাই রইল—এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের দিকে হাঁ ক'রে তিনি চেয়ে রইলেন।

নিস্তারিণীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বিরক্ত হ'য়ে বললেন, "কাল তিনি এসে না পৌছলে ডিস্‌মিস্ ক'রতেই হবে আমাকে—এই যে নিয়ম। না ব'লে, না ক'য়ে একদিন কামাই ক'রলে চাকরি যায়, জানেন ?"

"কাল এসে পৌছবে কোত্থেকে ? সে হঠাৎ জরুরী 'তার' পেয়ে তক্ষুনি চ'লে গেছে সেই হাবড়া না কাশী !" (এ বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ তার নিজের উদ্ভাবনী-শক্তি-উদ্ভূত—সে তারের কথা বিন্দু-বিসর্গও জানে না) "কাল এসে পৌছবে কোত্থেকে ?"

"তা' কি করবো ? না এলে ডিস্‌মিস্ হবেন।"

"ঈস্ ! বড় আমার ডিস্‌মিস্ করনেওয়ালা রে ! তুমি ডিস্‌মিস্ ক'রবার কে হে ? ও স্কুল কার ? কে ক'রেছে ? সাতখানা গাঁয়ের লোক জানে যে, ও আমার সোয়ামীর স্কুল। সেখান থেকে তাকে ডিস্‌মিস্ ক'রবার তুমি কে গো ? কে তুমি ? তোমায় এনে চাকরি দিলে কে ? তাকে যে বড় ডিসমিস্ ক'রতে যাচ্ছ ?"

হেডমাষ্টার এ কথায় রেগে উত্তর ক'রলেন, "ভারী জ্বালাতন ক'রলে দেখছি মাগী !"

আর কথা বলা হ'ল না তাঁর। কুরুক্ষেত্র লেগে গেল। লম্ফ-ঝম্ফ ক'রে রবীন্দ্র-গৃহিণী চীৎকারে গলা ফাটিয়ে হেডমাষ্টারের চতুর্দ্দশপুরুষ উৎসন্ন ক'রে এমন গালি-গালাজ আরম্ভ ক'রলে যে, তার কথার বন্যার ভিতর একটি কথা ঢোকায় কার সাধ্য ?

দেখতে দেখতে অন্দরের উঠোনে পাড়ার লোক জ'মে গেল। যখন হেড মাষ্টারের চতুর্দ্দশ পুরুষের সকল নারীকে 'মাগী' বলা হ'য়ে গেল, তারপর আরও নানারকমের মুখরোচক ও গ্লানিকর বিশেষণ রচনা

ক'রে সেই চতুর্দ্দশ পুরুষের প্রতি প্রয়োগ করা হ'য়ে গেল এবং হেড মাষ্টার বারবার তাঁর কণ্ঠ মুখর করবার ব্যর্থ প্রয়াস ক'রে হাল ছেড়ে দিলেন, তখন তাঁর অনুভব হ'ল যে, বোধ হয় এতে তাঁর অপমান হ'চ্ছে। তিনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন ক'রে একেবারে যোগেশের বৈঠকখানায় গিয়ে হাজির হ'লেন।

*　　*　　*　　*

এমনি ক'রে নিস্তারিণী সংহার-মূর্ত্তিতে কয়েকদিন কাটাবার পর যখন সে শুনতে পেলে যে, রবীন এসেও বাড়ীর ভিতর আসে নি, তখন সে উগ্রমূর্ত্তিতে ছুটে গেল বাইরের ঘরে।

রবীনের সঙ্গে চাক্ষুষ সাক্ষাৎ হবার আগেই সে গর্জ্জন আরম্ভ ক'রলে। তার বিবিধ বিশেষণ-বহুল বক্তৃতার স্থূল মর্ম্ম এই যে, সেই হতচ্ছাড়ী শতেক খোয়ারী মাগীর পেছনে বুড়ো বয়সে এমনি ক'রে ছুটো-ছুটি করায় রবীনের লজ্জা নেই, সে চুলোয় যাক্। কিন্তু চাকরি-খানা যে গেছে তার কি? সুতরাং নিস্তারিণী অবিলম্বে আদেশ ক'রলে যে, এক্ষুণি রবীন হেডমাষ্টারের কাছে গিয়ে হাতে পায়ে ধরুক, যাতে সে আবার চাকরিতে তাকে বহাল করে।

রবীন যখন শুনলে হেডমাষ্টার তাকে ডিস্‌মিস্ ক'রে চিঠি দিয়েছেন—তার চাকরি গেছে—সে তখন শুধু নির্লিপ্ত ভাবে বল্‌লে, "যা'ক্।"

"যা'ক্ মানে?"—নিস্তারিণী অবাক হ'য়ে গেল; ব'ললে, "যা'ক্ মানে কি? চাকরি ক'রবে না? তবে খাবে কি? দু'বেলা কার পিণ্ডি গিলবে? সে হারামজাদী মাগী কি তোমায় বসিয়ে খাওয়াবে না-কি? 'যা'ক্!'—যেন নবাব খাঞ্জে খাঁ—চল্লিশ টাকা মাসে আসে, সে ওঁর চোখে লাগলো না? ডাইনীর চোখ প'ড়েছে বুড়ো বয়সে, তা'

এমনি হ'বেই তো। পোড়ারমুখী নচ্ছার মাগী মরে না? যম কি তাকে ভুলে র'য়েছে?"

রবীন উঠে ব'সে তার মুখের দিকে চেয়ে শুধু ব'ললে, "না, ভোলে নি। সে ম'রেছে, তোমার কথা শুনেছে যম।"

এই কথাটায় নিস্তারিণী হঠাৎ যেন নিবে গেল।

মুখে মুখে তড়িতের ম'রবার কথা যতই বলুক সে, হঠাৎ অপ্রত্যাশিত-ভাবে এই নিদারুণ সত্য মৃত্যুর আঘাত খেয়ে সে যেন চ'মকে গেল।

আঁৎকে উঠে সে ব'ললে, "অ্যাঁ! ম'রেছে!"

আর কিছু বলতে পারলো না সে। নিজে সে এমন একটা লজ্জায় অভিভূত হ'য়ে গেল যে, সে আর কিছুই ব'লতে পারলে না।

বিভীষিকার মত মৃত্যু মানুষের জীবনটাকে ছায়াময় ক'রে রাখে, অতি নির্দ্ধারিত সত্য ব'লে সবাই তাকে জানে। কিন্তু তবু মানুষ মৃত্যুর কথা নিয়ে খেলা করে, যখন মৃত্যু থাকে দূরে। হঠাৎ সেই খেলার মাঝপথে মরণের সহসা আবির্ভাব বিকল ক'রে দেয় অতিবড় শক্তিমান মানুষকেও। কলকণ্ঠ নীরব হ'য়ে যায়, ভাব-স্রোত জমাট বেঁধে যায়, শত্রুর অস্ত্রও স্তব্ধ হ'য়ে যায়।

তাই তড়িৎ সত্য সত্যই ম'রেছে, এ সংবাদ শুনে নিস্তারিণী একেবারে স্তব্ধ বিমূঢ় হ'য়ে গেল।

এতক্ষণে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে সে দেখতে পেলো কি গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে তার চিত্ত। তার ভারী রাগ হ'তে লাগলো যে, না জেনেশুনে এমনি সময়ে সে রাগ ক'রে খেয়ে এসেছিল।

খুব অপ্রস্তুত ভাবে, মুখখানা ভার ক'রে সে অনেকক্ষণ সেইখানে ব'সে রইলো। তারপর সে ব'ললে, "কি হ'য়েছিল তার?"

সংক্ষেপে রবীন ব'ললে, "ক্যান্সার।"

"ও বাবা!"—ব'লে নিস্তারিণী আবার চুপ ক'রে গেল। তারপর আবার সে ব'ললে, "তুমি বুঝি ব্যারামের খবর পেয়ে ব্যস্ত হ'য়ে গিয়েছিলে?"

"হাঁ।"

"গিয়ে দেখতে পেয়েছিলে?"

রবীন শুধু ঘাড় নাড়লো।

সহৃদয়তার সহিত নিস্তারিণী ব'ললে, "আহা।"

চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে প'ড়লো, আঁচল দিয়ে সে চোখ মুছতে লাগলো।

তারপর নিস্তারিণী ব'ললে, "তা' কি আর ক'রবে? ভগবানের মার। এ তো আর মানুষের হাত নয়। চল, এখন ভেতরে চল, মুখ-হাত ধোও, কিছু খাও।"

নিস্তারিণী জোর ক'রে রবীনকে অন্দরে নিয়ে গেল। রবীন স্নানাহার ক'রলে নিস্তারিণী ব'ললে, "দেখ, চাকরিখানা গেলে বড় কষ্ট হবে। যাবে একবার হেড মাষ্টারের কাছে?"

রবীন ব'ললে, "না, আর যাব না। চাকরি ক'রবোই না আমি।"

* * * *

কিন্তু রবীন মাষ্টারের চাকরি সত্যি সত্যি যায় নি। হেড মাষ্টার চিঠি দিয়েছিলেন যে, পরের দিন হাজির না হ'লে তার চাকরি যাবে। পরের দিন রবীন যখন গরহাজির হ'ল তখন তিনি খুব জোর ক'রে কমিটির কাছে ব'ললেন যে, এবার রবীনকে ডিস্‌মিস্‌ ক'রতেই হবে। তাঁর খুবই ভরসা ছিল যে, এবার রবীনের চাকরি

না গিয়ে যায় না। কেন না, রবীনের প্রধান মুরুব্বী ভুবনবাবু যাঁর জন্যে এ পর্য্যন্ত তাকে তাড়ান সম্ভব হয় নি, তিনি এখন নেই। সতীশ চৌধুরী একটু গোলমাল ক'রতে পারতেন—তিনি অসুখ হ'য়ে চ'লে গেছেন, সুতরাং এবার আর রবীন ডিস্‌মিস্ না হ'য়ে যায় না।

কিন্তু হেডমাষ্টার দেখে অবাক্ হ'য়ে গেলেন যে, যোগেশ এমন তীব্রভাবে এ প্রস্তাবে আপত্তি ক'রলে যে, ভুবনবাবুও তেমন কোন দিন করেন নি। বাকী মেম্বার যে কয়জন ছিলেন তাঁদের কারও শক্তি ছিল না যে যোগেশের মতের বিরুদ্ধে ভোট দেন।

হেডমাষ্টার ভেবে দিশাই পেলেন না যে, যোগেশ হঠাৎ রবীন মাষ্টারের এত বড় ভক্ত হ'যে গেল কি ক'রে! তিনি দেখে-শুনে আরও অবাক্ হ'য়ে গেলেন যে, রবীন মাষ্টার এসেছে খবর পেয়েই যোগেশ তার বাড়ী গিয়ে তার খবরা-খবর নিয়ে এসেছে আর হেড-মাষ্টার যে রবীনের অনুপস্থিতিতে তাকে ডিস্‌মিস্ ক'রবার কথা জানিয়ে চিঠি লিখেছে, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে এসেছে।

যোগেশকে রবীন মাষ্টার ব'ললে, "না বাবা, আমি আর কাজ ক'রবো না। কাজ ক'রবার শক্তি আমার নেই।"

যোগেশ কিছুতেই ছাড়লো না। সে ব'ললে, "শক্তি না থাকে আপনার, সুধু স্কুলে গিয়ে ব'সে থাকবেন—আপনার কোন কাজ ক'রতে হবে না। আপনি বেঁচে থাকতে স্কুল ছাড়তে দেব না আমি কিছুতেই।"

যোগেশের মনে ভয় যে, রবীন মাষ্টার উইলের কথা সব জানে। যদি সে চটে তবে সে কি যে ক'রবে কে জানে? তাই তাকে যথাবিধি তোয়াজ ক'রে হাতে রাখা ছাড়া আর উপায় নেই।

সুতরাং প্রাণহীন শবের মত রবীন তার ভাঙ্গা দেহ টেনে স্কুলে যাওয়া-আসা ক'রতে লাগলো।

কয়েকদিন পর সে সুকেশের একখানা চিঠি পেলো। সুকেশ লিখেছে যে, তড়িতের ড্রয়ারে খুঁজে পাওয়া গেছে রবীনের নামে একখানা চিঠি। সেই চিঠি সুকেশ রবীনকে পাঠিয়েছে।

তড়িতের চিঠিখানা প'ড়লে রবীন, প'ড়তে প'ড়তে তার দু'চক্ষু জলে ভেসে গেল।

অসুখের আটদশ দিন পরে তড়িৎ এ চিঠি লিখেছিল। এই চিঠি আর তার স্বামীর নামে আর একখানা চিঠি লিখে সে তার ড্রয়ারে বন্ধ করে গিয়েছিল।

রবীনকে সে লিখেছে—

"শ্রীচরণেষু,

আমার বোধ হয় যাবার ডাক এসেছে। জানি না, মৃত্যুর আগে আপনার দেখা পাব কি-না, তাই এ চিঠিখানা লিখে যাচ্ছি।

ভগবানের চক্ষে আমি ছিলাম আপনার, কিন্তু আমি আপনাকে আমার সেবায় বঞ্চিত ক'রেছি চিরজীবন। যেদিন ক'লকাতায় আপনাকে দেখলাম সেই দিন থেকে এই ভেবে নিদারুণ মর্ম্মপীড়া অনুভব ক'রেছি যে, আমি আপনার ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত ক'রে অপরকে আত্মদান ক'রেছি, আর আপনার যে দুঃখ চোখে দেখলাম, কাণে শুনলাম, এ জীবনে তার প্রতিকার করবার অধিকার আমার নেই।

তাই আমার মৃত্যুর পর আমি দিয়ে যাচ্ছি আপনাকে যৎকিঞ্চিৎ

—শুধু প্রায়শ্চিত্তের জন্তে। দয়া ক'রে গ্রহণ ক'রবেন, নইলে আমার আত্মার শান্তি হবে না।

বেশী কিছুই নয়, আমার বই ক'খানা আর সামান্ত কিছু কোম্পানীর কাগজ, তাই আমি আপনাকে দিযে যাচ্ছি। আমার আর সব দিচ্ছি আমার স্বামীকে।

ইতি
সেবিকা—
তড়িং"

সুকেশকে যে চিঠি লিখেছিল, সেটাও সুকেশ তাকে পাঠিয়েছে, তাতে তার কাছে শত সহস্রবার ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে তড়িং লিখেছে যে, তার লাইব্রেরী আর পাঁচ হাজাব টাকার কোম্পানীর কাগজ যেন রবীনকে দিয়ে দেয।

উইল সে করে নি, পাছে কারো কাছে কথাটা জানাজানি হ'য়ে যায়। তার অগাধ বিশ্বাস ছিল সুকেশের উপর—আর একথাও সে ঠিক জানত যে, সুকেশ তার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ ক'রতে এতটুকু দ্বিধা ক'রবে না।

সুকেশ তার চিঠিতে আরও লিখেছে যে, তড়িতের দেওযা বই-গুলো সে দুই-এক দিনের মধ্যেই 'প্যাক্'. ক'রে পাঠাবে আর কোম্পানীর কাগজগুলো Succession Certificate নিয়ে নাম পাল্‌টে তার কাছে পাঠিয়ে দেবে।

চিঠিগুলি প'ড়ে রবীনের দুই গণ্ড বেয়ে দরদর ধারে ব'য়ে গেল অশ্রুর বন্তা—সব ঝাপ্সা হ'য়ে এলো চোখে, শুধু ভাসতে লাগলো তার মুগ্ধ-দৃষ্টির সামনে তড়িতের সঙ্গে সেই পনেরো দিন

থাকার সময়ের সহস্র মনোজ্ঞ চিত্র, আর কুসুম-শয্যায় তড়িতের জীবনের শেষ দৃশ্য !

এত ভাল বেসেছিল তড়িৎ তাকে—এত দিয়েছে সে তাকে ! আর রবীন—সে কি দিয়েছে তড়িৎকে ?—শুধু দুঃখ, শুধু ব্যথা ! তার মনে প'ড়লো যে, ক'লকাতায় তাকে দেখে বিদায়ের সময় তড়িৎ ব'লেছিল, "আপনাকে দেখে এত দুঃখ পাব, স্বপ্নেও জানতাম না ।"

এখন রবীনের মনে হ'ল, কেন সে গিয়েছিল তার দুঃখের বোঝা নিয়ে তড়িতের কাছে ? গিয়েছিল যদি, ব'লতে কেন গিয়েছিল তার কাছে নিজের দুঃখের কাহিনী ? সেই দুঃখে তড়িতের সুখ-শান্তির, গৌরবের জীবনের শেষ ক'টা দিন রবীন বিষাক্ত ক'রে দিয়েছিল !

তাই মনে ভাবলে যে, দুঃখই সে শুধু দিয়েছে তড়িৎকে, আর কিছুই দেয় নি। গরীব সে, অভাগ্য সে, কিন্তু তার দেবার শক্তি ছিল এমন দান, যা'কে তড়িৎ সমস্ত পৃথিবীর চেয়ে বেশী মূল্যবান মনে ক'রতো। যখন সে সুযোগ এসেছিল, তড়িৎ যখন হাত পেতে ব'সেছিল সেই দান পাবার প্রতীক্ষায়, তখন রবীন দেয় নি তা'—হাত গুটিয়ে ব'সেছিল। মনে প'ড়লো তড়িতের কথা—সেই চিঠি পেয়ে তড়িৎ সাত দিন কেঁদেছিল।

তড়িৎ আপনাকে যতই তিরস্কার করুক, বঞ্চিত তাকে তড়িৎ করে নি, রবীনই তড়িৎকে বঞ্চিত ক'রেছে সারা জীবনের সার্থকতায়। দিতে যা' পারতো সে তড়িৎকে, তা' সে দেয় নি—তাই আজ তড়িতের এই শেষ দান হাত পেতে নিতে লজ্জায় তার মাথা কাটা গেল।

সে সুকেশকে চিঠি লিখলে—

"আপনার চিঠি পেলাম। তড়িৎ আমাকে যা' দিয়ে গেছে তাতে তার বিয়োগ-ব্যথাটাই আরও নিবিড় ক'রে দিয়েছে।

"কোনও দিন কিছু দিই নি তাকে আমি--আপনি দিয়েছেন তাকে জীবন-ভরা ভালবাসা, সেবা, সুখ, ঐশ্বর্য্য। তার উপর এবং তার সর্ব্বস্বের উপর পূর্ণ অধিকার আপনার—আমার কোনও অধিকারই নেই।

"তড়িৎ আমাকে যা' দিয়ে গেছে তা' হাত পেতে নিতে আমার কুণ্ঠায়, লজ্জায় বুক ভ'রে যাচ্ছে। এ যে আমার শাস্তি। এই শাস্তি থেকে আমি আপনার কাছে মুক্তি ভিক্ষা ক'রছি। আপনি ও-সব রেখে দেবেন, না হয় যাতে লোকের মঙ্গল হয় সেই কাজে তড়িতের নামে ও-সব দেবেন। আমাকে আর ও-সব পাঠিয়ে ব্যথা দেবেন না।"

এ চিঠি সুকেশের কাছে পৌছবার আগেই দশখানা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্যাকিং-কেস বোঝাই হ'য়ে তড়িতের বইগুলো আর কয়েকটা আলমারী ষ্টীমার-ঘাটে এসে পৌছল।

রবীন ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে মাল খালাস ক'রে নিয়ে এলো তার কুঁড়ে ঘরে। তড়িৎ লিখেছিল 'বই ক'খানা', রবীন দেখলে যে, ইকনমিক্স ও সোসিয়লজির একটা সম্পূর্ণ লাইব্রেরী। সারা জীবনের প্রচুর উপার্জ্জন থেকে তড়িৎ এগুলো কিনেছে।

বইগুলো আলমারীতে সাজিয়ে-গুছিয়ে তুলতে গিয়ে রবীন মাঝে মাঝে সেগুলো দেখতে লাগলো। দেখতে পেলো তার ভিতর জায়গায় জায়গায় তড়িতের নিজের হাতের লেখা নোট র'য়েছে। সেই ছোট ছোট মুক্তোর মত লেখার দিকে সে চেয়ে রইলো অনেকক্ষণ ঝাপসা চোখে।

আর সে দেখতে পেলো কতকগুলো খাতা—তড়িতের নোট-বই। সুন্দর পরিচ্ছন্ন ভাবে মুক্তার হরফে লেখায় বোঝাই। সে সব প'ড়তে প'ড়তে কত কথাই তার মনে হ'ল।

অনেক দিন তার কেটে গেল তড়িতের বইগুলো গুছিয়ে আলমারীতে সাজাতে। যখন সাজান হ'য়ে গেল তখন দেখা গেল যে, তার ছোট ঘরখানায় তড়িতের আর তার নিজের বইগুলোয় মিলে এতটা জায়গা জুড়েছে যে, তার পা ফেলবার জায়গা নেই।

তড়িতের বইগুলা নাড়াচাড়া ক'রতে সে একটা অদ্ভুত আনন্দ উপভোগ ক'রছিল। সে যেন এর ভিতর দিয়ে তড়িতের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগ-প্রতিষ্ঠা ক'রে ফেলেছিল। তার সঙ্গে মুখোমুখি হ'য়ে ব'সে ক'লকাতার বাসায় সে যেমন এই সব বিষয়ের আলোচনা ক'রতো, তার মনে হ'ল যেন ঠিক তেমনি সে এখানে তড়িতের সঙ্গে আলোচনা ক'রছে। ভারী শান্তি, ভারী তৃপ্তি পেতো সে এতে।

তড়িতের নোটগুলো প'ড়তে প'ড়তে তার মনে হ'ল যে, তার ভিতর সে অনেক নূতন কথা লিখেছে—তার স্বাধীন চিন্তার ফল অনেক লিখে রেখে গেছে। ভারী ইচ্ছা হ'ল তার সেই সব নোটগুলো জড়ো ক'রে সেগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে একখানা বই লিখে তড়িতের স্মৃতি স্থায়ী ক'রবার জন্যে।

প'ড়ে রইলো তার নিজের সঙ্কলিত গ্রন্থ—সে এই কাজ ক'রবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগলো।

কিন্তু তা ক'রতে গেলে সবার আগে বইগুলো রাখবার একটা সুব্যবস্থা করা দরকার। তার এই জীর্ণ ঘরে এমনি ঠাসাঠাসি ক'রে এগুলো রাখলে এদের অসম্মান করা হবে। তাই সে স্থির ক'রলে একটা পাকা বাড়ী ক'রে এই দিযে তড়িতের নামে একটা সাধারণ পাঠাগার স্থাপন ক'রবে।

* * * *

ভাবতে ভাবতে সে গেল যোগেশের কাছে।

যোগেশকে সে সব কথা খুলে ব'ললে, সুকেশের চিঠি দেখালে। তার পর সে ব'ললে, যোগেশ যদি একটা জমী দেয় আর কিছু অর্থ-সাহায্য করে তবে পাঠাগারটা বেশ ভাল ক'রে করা যায়।

সুকেশের চিঠি দেখে যোগেশের মনের ভিতরটা কেমন চিড়্‌চিড়্‌ ক'রে উঠলো। তড়িৎ উইল ক'রে রবীন মাষ্টারকে কিছু দেয় নি, রবীন মাষ্টারের এ-সবে কোনও আইন-সঙ্গত অধিকার নেই, তবু সুকেশ স্ত্রীর ইচ্ছা পূর্ণ ক'রবার জন্যে এ-সব দিয়েছে রবীনকে। আর যোগেশ —তার বাপ রবীনকে যে আইন-সঙ্গত অধিকার দিয়ে গেছেন তা' থেকে তাকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছে। ভাবতে তার নিজেকে ভারী ছোট মনে হ'ল।

একবার তার মনে হ'ল সব কথা রবীন মাষ্টারকে ব'লে তার পায়ে জড়িয়ে ধ'রে তাকে এক্‌জিকিউটারী ছেড়ে দিতে বলে।

কিন্তু সাহস হ'ল না।

অথচ রবীন মাষ্টার যখন তার কাছে সাহায্যের জন্য এলেন, তখন তার ন্যায্য পাওনা টাকা থেকে তাকে বঞ্চিত ক'রতেও তার ভারী কুণ্ঠা বোধ হ'ল।

তিন-চার দিন ভেবে ভেবে যোগেশ শেষে রবীন মাষ্টারকে ব'ললে, "দেখুন, বাবা দেবোত্তর থেকে বছরে কিছু টাকা লোকহিতের জন্য খরচ ক'রতে ব'লে গেছেন। তার থেকে হয়তো বছরে তিন-চারশো টাকা আমি দিতে পারি।"

এইটুকু দিয়ে সে তার বিবেককে কোনও মতে ঠাণ্ডা ক'রে রাখলে।

এতেই রবীন মাষ্টার ভারী খুসী হ'য়ে গেল। সে ব'ললে, "হ্যাঁ ঠিক, জানি আমি, তোমার বাবা আমাকে বলেছিলেন। বেশ ওতেই হবে।"

চ'মকে উঠলো যোগেশ। তার মনে হ'ল তা' হ'লে উইলের সবটাই হয়তো জানে রবীন মাষ্টার। তার প্রাণটা আরও আঁৎকে উঠলো।

১৫

হেড্ মাষ্টার ব'ললেন, "আচ্ছা খেয়াল মাথায় উঠতে পারে পাগলের। এই অজ-পাড়াগাঁ, একটা কথা ব'লবার লোক পাওয়াই দায়, বই প'ড়তে জানেই বা কে? এখানে ক'রতে ব'সেছে এক প্রকাণ্ড লাইব্রেরী!"

সেকেণ্ড মাষ্টার ব'ললেন, "আচ্ছা, ব'লতে পারেন, বই প'ড়ে লোকে কি সুখ পায়? পেটের দায়ে বি-এ পাশ ক'রতে অনেকগুলো বই প'ড়তে হয়েছে, আর এখন পেটের দায়ে পড়ি, যা' পড়াতে হয়। যা' প'ড়েছি, তারই মজুরী পোষায় না—আবার নূতন বই প'ড়বো! আর ঐ রবীন মাষ্টার দিন-রাত পোকার মত বই নিয়ে ব'সে পড়ে—যেন কত রস তাতে! হাঁা, বুঝতাম হ'ত যদি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস—বাপ। যে সব বই পড়ে, তার নাম মনে হ'লে ভিমি ধরে।"

হেসে হেড মাষ্টার ব'ললেন, "ও একরকম পাগলামি, ভায়া, পাগলামি—এই বই-ক্ষেপামি। পাগল না হ'লে ঐ পারে। দেখতে পাও না, খেলতে যদি যাবে, রবীন মাষ্টার খেলবে কি? দাবা। যদি একটা খেলা, তবে Logarithm কষা মন্দ কিসে? আর খেলতে দেখেছো—একেবারে গোঁজ হ'য়ে ছকের উপর প'ড়ে থাকে, যেন রাজ্য-পাট তার নির্ভর ক'রছে ওর উপর।"

সুধাংশু ছোকরা বয়সে এঁদের ঢের ছোট, কিন্তু তাস খেলে এঁদের সঙ্গে—যেহেতু সে কোনও দিন এই স্কুলে এঁদের কাছে পড়ে নি। এখন সে গ্রামে এসে ব'সেছে, তার প্রধান পেশা হ'চ্ছে সখের থিয়েটার।

বছরের অর্দ্ধেক দিন কাটে তার আজ এখানে কাল সেখানে ক'রে. সারা জেলায় ঘুরে থিয়েটার ক'রে।

সে ব'ললে, "মাইরি! রবীন মাষ্টার লাইব্রেরীর ঘরখানা বেঁধেছে খাসা। প্রকাণ্ড একটা 'হল'—ওতে থিয়েটার হয় চমৎকার! বাড়ীটা হ'লে ভাবছি, ওখানে একটা নতুন বই প্লে ক'রবো।"

সেকেণ্ড মাষ্টার ব'ললেন, "ব'য়ে গেছে ওব দিতে! ব'লতে গেলে লাগাবে এমন তাড়া যে, পালাতে পথ পাবে না। যে ভাবে ক্ষেপে র'য়েছে পাগল।"

হেড মাষ্টার ব'ললেন, "বাস্তবিক. এই টাকা পাবার পব ওর মেজাজ হ'য়েছে দেখেছ? যেন লাট! সেই রবীন মাষ্টার, যাকে গাল দিয়ে ভূত ঝেড়ে দিয়েছি, কথাটি বলে নি, এখন তার সঙ্গে কথা বলে কার সাধ্য? একটা কথা ব'ললে দশটা কথা শুনিয়ে দেয়—আর কি চটাং চটাং কথা। ইচ্ছে হয় অনেক সময়, দি ক'ষে দু'ঘা লাগিয়ে।"

সেকেণ্ড মাষ্টার ব'ললেন, "এ শুধু টাকা পেয়ে হয় নি ম'শায়। ওকে মাথায় চড়িয়ে দিয়েছে ওই যোগেশ। ও যে হঠাৎ রবীন মাষ্টারের ভিতব কি গুণই দেখেছে, আধমাইল দূরে রবীন মাষ্টারকে দেখলে ছুটে গিয়ে তার পায়ের ধূলো নেয়!"

হেড মাষ্টার ব'ললেন, "তা' ব'লেছ ঠিক ভায়া। কি হ'য়েছে বলতো? আগে তো যোগেশ এমন ধারা ছিল না। আমার কথায় উঠতো ব'সতো, যা' বোঝাতাম তাই বুঝতো। ওর বাপ মারা যাবার পর থেকেই কি যে হ'য়ে গেছে ওর, তার ঠিকানা নেই।"

সুধাংশু ব'ললে, "আমি জানি। ভুবনবাবু যখন মারা যাচ্ছেন, তখন রবীন মাষ্টার ওকে গাল দিয়ে ব'লেছিল, 'তুমি কিচ্ছু চিকিৎসা ক'রছো না ওঁর!' তার পর সিভিল সার্জ্জন এসে ব'ললেন, 'ভুল

চিকিৎসার ফলেই ভুবনবাবুর ব্যারামটা বেগতিক হ'য়ে গেছে।' তখন থেকে তার মনটা এমনি হ'য়ে গেল।"

সেকেণ্ড মাষ্টার ব'ললেন, "না হে না, যোগেশ অত কাঁচা ছেলে নয় যে, এতেই বিগড়ে যাবে। আসল কথাটা আমি আঁচ ক'রেছি। ওর জমীর উপর রবীন মাষ্টার ক'রেছে ঐ বাড়ী। দান-পত্র কিছুই হয় নি। হ'যে গেলে, ঐ বাড়ীখানা গেঁড়া দেবার মতলব।"

হেড মাষ্টার ব'ললেন, "ঠিক ব'লেছো ভায়া। এই কথাই ঠিক। নইলে যোগেশ, যাকে দিয়ে এতদিন ঝুলোঝুলি ক'রে আমি স্কুলবাড়ীর একটা ট্রাষ্টডীড করাতে পারলাম না, সে অমনি চাইতেই কস্ ক'রে লাই-ব্রেরীর জন্যে জমী দিযে ফেল্‌লে! আবার না কি টাকা'ও দেবে ব'লেছে—এ হযই না।"

হেড মাষ্টার ছিলেন সেই সুপরিচিত শ্রেণীর লোক, যাঁরা কাউকে হঠাৎ একটা ভাল কাজ ক'রতে দেখলে মনে একটা দারুণ অস্বস্তি বোধ করেন, আর সেই ভাল কাজটার ভিতর একটা বদ্ মতলব আবিষ্কার ক'রতে পারলে সুস্থ বোধ করেন। এ ক্ষেত্রে বদ মতলবের সন্দেহটা বেঠিক নয়, কিন্তু তার স্বরূপ নির্ণয় হ'ল ভুল।

সেকেণ্ড মাষ্টার ব'ললেন, "হ্যাঁ, ভাল কথা, ট্রাষ্টডীডের কতদূর হ'ল? ইউনিভারসিটি থেকে যে তাড়া দিচ্ছে—না হ'লে হয়তো নেবে অ্যাফি-লিয়েশান কেড়ে।"

হেড মাষ্টার ব'ললেন, "আমি তো ব'লেছি যোগেশকে সব কথা, সে মুখে তো বলে, আজ হ'চ্ছে কা'ল হ'চ্ছে, কিন্তু টালবাহানা ক'রে কেবলি সময় নিচ্ছে। বলে, উকীলবাবুরা কি সব বাগড়া দিচ্ছেন। এই উকীল জাতটা! ওঁরা নির্ব্বংশ না হ'লে কোন্‌ও কিছু যদি হয়। যোগেশ সেদিন সব ঠিক ক'রে গেল তার উকীলের কাছে। তিনি শুনেই ঘাড়

নাড়তে লাগলেন—ব'ললেন, 'নাবালক আছে, জন্মের সার্টিফিকেট চাই' —এমনি সব বাজে কথা, কেবল বাগড়া দেবার ফন্দি।"

সেকেণ্ড মাষ্টার ব'ললেন, "কিন্তু যেমন ক'রেই হোক, ক'রে নিন ওটা। নইলে, যোগেশের যা' মতিগতি দেখছি, কোন্‌দিন ব'লবে, 'নিকালো'—এই ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় ক'দিন আর থাকা যায়! ও একবার হুমকি ছাড়লেই তো চাকরিটির দফা-রফা!"

সেই সময় যোগেশকে আসতে দেখে তাঁরা থেমে গেলেন।

যোগেশ এসে একখানা দলিল বের ক'রে হেডমাষ্টারের হাতে দিয়ে ব'ললে, "এই নিন আপনার ট্রাষ্টডীড ম'শায়। এটা পাকা হ'ল কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে—তা' হোক্, কিন্তু ইউনিভার্সিটিকে দেখাবার মত যথেষ্ট!"

হেড মাষ্টার উল্লসিত চিত্তে দলিল খানা হাতে নিয়ে ব'ললেন, "বেশ বাবা, বেশ, বেশ! একটা দুর্ভাবনা গেল। ইউনিভারসিটি যে তাড়া দিচ্ছিল!"—ব'লতে ব'লতে দলিলখানা খুলে তিনি প'ড়তে লাগলেন। প'ড়তে প'ড়তে তাঁর হাসি মিলিয়ে গেল—মুখটি চুণ হ'য়ে গেল।

ট্রাষ্টডীড ক'রেছে যোগেশ ঠিক, কিন্তু ভয়ানক ব্যাপার! সে লিখেছে "এই স্কুলের একমাত্র প্রতিষ্ঠাতা রবীন মাষ্টার তাঁহার জীবিত কাল পর্য্যন্ত থাকিবেন একমাত্র ট্রাষ্টী!" আর, আরও সর্ব্বনাশ—সেই ট্রাষ্টীকে দেওয়া হ'য়েছে অসামান্য ক্ষমতা! দলিলে লেখা আছে—"যদি কোনও দিন কোনও কারণে এ স্কুল না থাকে, অথবা যদি ট্রাষ্টী মহাশয়ের বিবেচনায় স্কুলের কার্য্য রীতিমত ভাবে না চলিতে থাকে, তবে তিনি স্কুলের জমী, বাড়ী খাস দখলে লইয়া অন্য কোনও স্কুল বা যে কোনও সাধারণ হিতকর প্রতিষ্ঠান সেখানে স্থাপন করিতে পারিবেন।"

মুখ চুণ ক'রে হেডমাষ্টার ব'ললেন, "এটা কি ক'রলে?"

যোগেশ ব'ললে, "সাত দফার কথা ব'লছেন ? উকীলবাবু ব'ললেন, ও রকম একটা দফা থাকা দরকার, কেন না, তাঁরা ব'ললেন যে, কাল যদি আপনারা স্কুল উঠিয়ে দিয়ে মুদীখানার দোকান কিম্বা থিয়েটারের ঘর করেন, তবে কি হবে ? তাই ওঁরা ওটা লিখতে ব'ললেন।"

থিয়েটাবের কথা শুনে সুধাংশু উৎকর্ণ হ'য়ে উঠেছিল। সে ব'ললে, "কেন যোগেশদা', থিয়েটারটা স্কুলেব চেয়ে কম ঠাওরালে ? লোক-শিক্ষা, আর্টের শিক্ষা, জীবনের শিক্ষা থিয়েটারে যতটা হয়, স্কুলে তা' হয় না।"

যোগেশ হেসে ব'ললে, "আমি ভাই অতশত বুঝি নে, তাঁরা যা' ব'ললেন, তাই ব'ললাম।"

শুষ্কমুখে হেড মাষ্টার ব'ললেন, "কিন্তু শুধু তো তাই নয়, 'যদি ট্রাষ্টী মহাশয়ের বিবেচনায় স্কুলের কার্য্য রীতিমত ভাবে না চলিতে থাকে'— এ কথাটা যে বড় মারাত্মক ! আর সে ট্রাষ্টী ম'শায় হ'লেন রবীন মাষ্টার ! জান তো, কিছুতেই তাঁর মন ওঠে না।"

"সে কি ক'রবো ? উকীলবাবুরাই এটা ক'রে দিলেন, আর তাঁরা ব'লে দিলেন যে, এ বদলাবার আমার অধিকার নেই।"—ব'লে যোগেশ ব'ললে, "এখন বাড়ী যাই। সদর থেকে সোজা এসেছি আপনার এখানে।"

তারপর সে তাড়াতাড়ি চ'লে গেল।

এর পর হেড মাষ্টার ও সেকেণ্ড মাষ্টার পরস্পর পরস্পরের মুখপানে চাইতে লাগলেন।

হেড মাষ্টার ব'ললেন, "ওহে ভায়া, ত্রিশঙ্কুও যে এর চেয়ে ভাল ছিল। চাইলে বৃষ্টি, এলো বন্যা। এখন উপায় ?"

সেকেণ্ড মাষ্টার ব'ললেন, "ছিঁড়ে ফেলে দিন না কাগজখানা।"

"আরে, রেজেষ্টারী দলিল, ছিঁড়লে কি হবে?"

অনেকক্ষণ গবেষণার পর হেড মাষ্টার ব'ললেন, "আর একবার রবীন মাষ্টারকে তোয়াজ ক'রে দেখি, তার কাছ থেকে ট্রাষ্টীগিরি অস্বীকার ক'রে একটা চিঠি আদায় করা যায় কি না।"

সেকেণ্ড মাষ্টার ব'ললেন, "তাতে লাভ হবে কি? সে যদি না হয়, তবে কে হবে?"

"যোগেশ।"

"হ'য়েছে! তার যে রকম মতিগতি দেখছি, সে তো তার পর-দিনই ব'লবে 'নিকালো'—স্কুলের কাজ রীতিমত চ'লছে না।"

"তাই তো? এ কি হ'ল বল তো? রবীনের দেখছি একাদশ বৃহস্পতি। ওদিকে সে পেলে একটা মেয়ে মানুষের কাছ থেকে অতগুলো টাকা, আর একগাদা বই! আবার এদিকে স্কুলে সে হ'য়ে ব'সলো সর্ব্বময় কর্ত্তা!"

"দেখুন অত ভাববেন না। পাগল মানুষ—একাদশ বৃহস্পতি হ'লেও তার কিছু হবে না। এই দেখুন না, পেলে এতগুলো টাকা, এতগুলো দামী বই! আপনি আমি হ'লে বইগুলো বেচে কোম্পানীর কাগজ ক'রে খাতিরজমা হ'য়ে ব'সতাম। ও—দিলে সব টাকা উড়িয়ে একখানা বাড়ী ক'রে। এও তেমনি হবে। কাগজখানা চাপা দিয়ে রাখুন না ক'টা দিন!"

হেড মাষ্টার ভাবলেন, সেই যুক্তিই ঠিক। এখন দলিলটা চাপা দিয়ে রবীন মাষ্টারকে শুধু তোয়াজের উপর রাখলেই সে কিছু টের পাবে না, যেমন চ'লছে তেমনি চ'লবে। যোগেশ ঠিক যে যুক্তির ফলে রবীন মাষ্টারকে তোয়াজ ক'রতে আরম্ভ ক'রেছিল, তেমনি অবস্থায় প'ড়ে এঁরা দু'জনও সেই পথই অবলম্বন ক'রলেন।

কিন্তু কাজটা হেড মাষ্টার যত সহজ মনে ক'রেছিলেন, তত সহজ মোটেই হ'ল না।

এর পর যখন রবীন মাষ্টারের সঙ্গে দেখা হ'ল, তখন হেড মাষ্টার তাকে দূর থেকে নমস্কার ক'রতে ক'রতে তার কাছে গিয়ে একগাল হেসে ব'ললেন, "রবীনবাবু, ভাল আছেন তো ?"

এতটা হৃদ্যতায় রবীন মাষ্টার একটু চমকে গিয়ে দাঁড়াল। তার-পর মনে হ'ল নমস্কার ক'রবার কথা। নমস্কার ক'রে সে অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলো হেড মাষ্টারের মুখের দিকে।

হেড মাষ্টার ব'ললেন, "আর কত দেরী লাইব্রেরীর বাড়ী হ'তে ?"

রবীন মাষ্টার তেমনি ক'রেই চেয়ে ব'ললে, "ছাদ পিটোনো হ'চ্ছে।"

"মস্ত কাজ ক'রলেন আপনি—ঠিক আপনারই যোগ্য। এমন একটা লাইব্রেরী অনেক বড় জায়গায়ও নেই। পণ্ডিত আপনি, আপনারই যোগ্য এ কাজ।"

রবীন মাষ্টার খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে শেষে ব'ললে, "লিখে নিয়ে আসুন ম'শায়।"

অবাক হ'য়ে হেড মাষ্টার ভাবলেন, বলে কি এ? একেবারে উন্মাদ পাগল হ'য়ে গেল না কি? এই সম্ভাবনার কল্পনায় তাঁর মনটা বেশ আশান্বিত হ'য়ে উঠল।

হেড মাষ্টার ব'ললেন, "লিখবো কি ম'শায়? আপনি বলেন কি ?"

রবীন মাষ্টার ব'ললে, "উঁহু, আর আপনার মুখের কথায় ভুলছি নে। এবার থেকে যা' ব'লবার থাকে লিখে দেবেন, তবে জবাব পাবেন। সেই অ্যাসিষ্টাণ্ট হেড মাষ্টারীর কথা মনে আছে তো ?"

বেহায়ার শিরোমণি হেড মাষ্টার, নইলে এতদিন রবীন মাষ্টারকে যা' নয় তাই ক'রে আর ফস্ ক'রে এতটা খোসামুদী ক'রতে যেতেই তাঁর বাধতো। বেহায়া, তাই এতেও না ভ'ড়কে তিনি ব'ললেন "দেখুন রবীনবাবু, আপনি মহানুভব লোক। একজন যদি একটা অপরাধ ক'রেই থাকে, তবে সেটা মনে রাখা আপনার মত লোকের উচিত নয়।"

"কিন্তু লিখে আসুন গে।"—বলে রবীন মাষ্টার হন্ হন্ ক'রে চ'লে গেল।

হেড মাষ্টার বুঝলেন—কঠিন ঠাঁই। সে রবীন মাষ্টার আর নেই। আর হয়তো বা ট্রাষ্ট-ডীডের খবরটা যোগেশ তাকে আগেই ব'লেছে। তিনি প্রমাদ গণলেন। রবীন মাষ্টার ট্রাষ্টী হ'লে তাঁর পাততাড়ি গুটোতে হবে ব'লেই মনে হ'ল।

বাড়ী গিয়ে খবরের কাগজের কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দেখতে লাগলেন। বিশ বছরের পুরোনো সার্টিফিকেটগুলো খুঁজে বের ক'রলেন—অন্য কাজের দরখাস্ত এখন থেকেই সুরু করা ভাল।

রবীন মাষ্টারকে তোয়াজ করার চেষ্টাটাও চ'লতে লাগলো রীতিমত।

১৬

একজন মুসলমান মৌলবী এসে মুসলমান প্রজাদের মাঝে বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি ক'রলে। আজ এখানে, কাল সেখানে ঘুরে সে সভা করে, 'ওয়াজ' করে,—দলে দলে চাষীর দল ছুটতে লাগলো তার সভায়।

ধান-পাটের দর কম্‌তে কম্‌তে এত ক'মে গেল যে, চাষীদের বেঁচে থাকা দায় হ'ল! মজুরি খেটে যারা দিন চালায়, তাদের মজুরি আট আনা থেকে দু' আনায় নেমে এলো, তবুও কাজ মেলে না তাদের।

অথচ মহাজন ঠিক তাঁর টাকার অঙ্কের উপর সুদ ক'ষে বকেয়া লিখতে লাগলেন খাতায়। জমীদারের জমাওয়াশিলে বাকী খাজনা লেখা হ'তে লাগলো সাবেক হিসাবে, এক পাই এদিক ওদিক হ'ল না। আদায় কারও কিছু বড় হয় না, কেন না আদায় দেবার টাকা নেই চাষীদের—কিন্তু কাগজে-কলমে খাজনা, সুদ এবং সুদের সুদ বেড়েই চ'লল।

মাঝে মাঝে এক-আধটা নালিশ হয়, আর এক-একজন প্রজা উৎখাত হয় তার বাড়ী ও জমী থেকে।

দেখে দেখে চাষীর দল বড় চঞ্চল হ'য়ে উঠলো।

মৌলবী সাহেব এসে তাদের বোঝালেন, ফসলের দাম যখন ক'মে গেছে, তখন জমীদার-মহাজন দাবী ক'রতে পারে না তাদের সাবেক টাকা। চাষীরা যদি দল বেঁধে বলে, পাবে না তোমরা খাজনা, পাবে না তোমাদের কর্জ্জ টাকা, সাধ্য কি জমীদার-মহাজনেরা সে টাকা আদায় করেন?

পর-পর কয়েক বছরে একেবারে উৎসন্ন যাবার মত হ'য়ে চাষীরা ক্ষেপে উঠেছিল, তারা ঘাড় নেড়ে সায় দিলে, ব'ললে—"ঠিক! দেবো না আমরা। ভগবানের জমীন চাষ করি আমরা—তার জন্যে খাজনা দেব কাকে?—তাদের শিক্ষাদাতা যা' ব'ললেন, তারা তার এক কাঠি উপরে গেল।"

তারপর খবর এলো যে, ছোকরা চাষীদের মধ্যে জটলা হ'চ্ছে, তারা মহাজনের বাড়ী চড়াও ক'রে সব তমসুক লুটে নেবে।

জমীদার-মহাজনেরা এবং হিন্দুরা সবাই চঞ্চল হ'য়ে উঠলো।

আগের বছর যখন পাটের দরে মন্দা এসেছিল, তখন দলে দলে চাষীরা এসেছিল রবীন মাষ্টারের কাছে উপদেশ নিতে। কিন্তু বুনানীর সময় পাটের দর বেড়ে যেতেই তারা আর এগোল না। তারপর পাট যখন উঠলো, চাষীর বেচবার সময় হ'ল, সেই সময় আবার যখন দর আগের চেয়ে অনেক নীচে নেমে গেল, তখন চাষীরা মাথা চাপড়ে ব'লতে লাগলো, "হায় রে, রবীন মাষ্টারের কথা শুনলাম না কেন?" আবার তার কাছে তারা আসতে আরম্ভ ক'রলো।

রবীন মাষ্টার তখন লাইব্রেরী নিয়ে মহা ব্যস্ত। বাড়ী তৈরী হ'চ্ছে, তারই তদারক সে করে। বইগুলোর একটা ক্যাটালগ তৈরী করে, এতগুলো বই পেয়ে সে হাবাতের মত ব'সে পড়ে, তড়িতের নোটগুলো সংগ্রহ ক'রে তাই থেকে তার বই তৈরী ক'রবার জন্যে সে খাটে। এ সবের মাঝখানে নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ নেই তার।

তা' ছাড়া ভারী বিরক্ত হ'য়ে গিয়েছিল সে চাষীদের উপর, কারণ তারা বার বার তাকে জ্বালাতন ক'রে শেষ পর্য্যন্ত কিছুই ক'রলে না।

কিন্তু যখন দেখলে যে, চাষীদের বিপদ ভারী, আর শুধু চাষীদের নয়, সঙ্গে সঙ্গে জমীদার, মহাজন, ব্যবসায়ী—সবাই ম'রতে ব'সেছে, তখন সে তাদের নিয়ে বৈঠক ক'রে ব'সে সব কথা শুনলে, হিসেব ক'রলে। অনেক ভেবেচিন্তে সে একটা স্কীম তৈরী ক'রলে।

তার স্কীমের ভিতর আগের মত যৌথ-আবাদের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু এবারে সে আরও গভীরভাবে আলোচনা ক'রে দেখতে পেলো যে, শুধু তাতেই হবে না, দেনা ও খাজনার বোঝা না ক'মাতে পারলে কিছুই হবে না। একেবারে সেগুলো অস্বীকার ক'রলে পর

চাষী বাঁচতে পারে, কিন্তু বাকী সবাই ম'রবে। তা' ছাড়া, অস্বীকার ক'রলেই বা মানছে কে? আইন ক'রে সেগুলো বন্ধ না ক'রলে তারা আদালতে গিয়ে আদায় ক'রবেই।

তাই তার নূতন স্কীমে সে এই অবস্থা ক'রলে যে, জমীদার মহাজন, চাষী, মধ্যস্বত্ববান—সবাইকে নিয়ে একটা সোসাইটি হবে। জমীদার-মহাজন চাষীদের মতই লাভের অংশ ডিভিডেণ্ড স্বরূপ পাবেন—যাঁর যত টাকা প্রজার কাছে পাওনা আছে, তার অর্দ্ধেক টাকার শেয়ার প্রত্যেককে দেওয়া হবে।

এমনি ক'রে একটা স্কীম ক'রে সে প্রজাদের বোঝালে, তারা এবার সহজেই তার প্রস্তাবে সম্মত হ'ল। তারপর সে গেল মহাজনদের কাছে, জমীদারদের কাছে। তাঁরা তাকে পাগল ব'লে চিরদিন যেমন উড়িয়ে দেয়, তেমনি উড়িয়ে দিলেন।

রবীন মাষ্টারের হাতে বাজে সময় নেই, কাজেই এঁদের কাছে তাড়া খেয়ে বিরক্ত হ'য়ে সে চাষীদের ব'ললে, "না বাপু, আমি পারলাম না কিছু ক'রতে।"

এ সব চিন্তা ছেড়ে দিয়ে সে লেগে গেল লাইব্রেরীর কাজে—লেখাপড়ায়।

তারপরে এলেন এই মৌলবী।

জমীদার, মহাজন—সবাই সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠলেন। জেলায়, মহকুমায় দরখাস্তের পর দরখাস্ত প'ড়তে লাগলো। পুলিশ আসতে লাগলো গ্রামে। সমস্ত গ্রামে একটা থম্-থমে ভাব দেখা গেল। সবাই ভাবতে লাগলো, না জানি কখন কি হয়?

এখন জমীদার-মহাজন সবাই ভাবতে লাগলো, রবীন মাষ্টার চাষীদের বুদ্ধিদাতা, তাকে ধ'রলে একটা শান্তি-স্থাপনের উপায় হ'তে পারে।

তড়িতের বইয়ের মধ্যে ছিল একখানা রাশিয়ার পঞ্চসনা প্ল্যানের বিস্তারিত বিবরণ। এই বিষয়টার সম্বন্ধে রবীন মাষ্টারের শোনা ছিল অনেক কিছু, কিন্তু এমন একখানা বিস্তীর্ণ বর্ণনার বই সে পায় নি এতদিন। কয়েকদিন হ'ল খুব আগ্রহ ক'রে সে এই বইখানা প'ড়ছিল। প'ড়তে প'ড়তে যেমন হ'ল তার বিস্ময়, তেমনি হ'ল কৌতূহল। আর সেই সব কথা প'ড়তে প'ড়তে কত নূতন কল্পনাই না জেগে উঠলো মনে, তার গ্রামের আর বাঙ্গলা দেশের আধিক উন্নতি সাধন ক'রবার জন্যে। মনে মনে সে তার নিজের স্কীম ঢেলে সাজতে লাগলো।

যখন সে ডুবে র'য়েছে এই বইয়ের ভিতর, তখন এলেন যোগেশ, সতীশ চৌধুরী, বিপিন পোদ্দার এবং আরও কয়েকজন। কাজে এই বাধা পেয়ে পিত্ত জ্ব'লে গেল তার।

মৌলবী ও চাষীদের কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে সত্য, মিথ্যা, জনশ্রুতি ও কল্পনা এঁদের যত যা' ছিল সব ব'লে এঁরা ব'ললেন, "দেখুন মাষ্টার ম'শায়, আপনি ওদের ডেকে বুঝিয়ে বলুন, এমনি অত্যাচার ক'রলে—"

রবীন মাষ্টার বাধা দিয়ে ব'ললে, "এজন্য আমার কাছে আপনারা মিছামিছি এসেছেন। আমি জমীদার নই, মহাজন নই যে, আমার চাষীদের উপর জোর খাটবে—জজ নই ম্যাজিষ্ট্রেট নই যে, তাদের শাসন ক'রবো! আমি একটা বোকাসোকা পাগল মানুষ, বই নিয়ে থাকি আর বেয়াড়া সব কথা বলি। আমি ওদের থামাব কি ক'রে?"

যোগেশ ব'ললে, "কিন্তু ওরা আপনার বাধ্য, আপনার কথা শোনে।"

রবীন ব'ললে, "বাজে কথা। কবে কোন্ কথাটা শুনেছে তারা?

তারাও শোনে নি, তোমরাও শোন নি। কেন শুনবে? হ্যাঁ, হ'ত, যদি আমি তাদের কোনও উপকার কোনও দিন ক'রতাম, তবে শুনতো। কিন্তু করি নি তো কিছু। ভেবেছি শুধু, করি নি কিছুই। ওরা চাষা-ভুষো মানুষ, কথার চেয়ে কাজ বেশী বোঝে।"

সতীশ চৌধুরী ব'ললেন, "এ আপনার অন্যায় কথা মাষ্টার ম'শায়! আপনার কথা ওরা খুব মানে। ব'লতে গেলে, আপনিই তো ওদের শিখিয়েছেন যে, জমীদার-মহাজন যে টাকা নেয়, সেটা অন্যায়।"

"কই না, আমার তো মনে পড়ে না যে, সে কথা তাদের ব'লেছি। আর যদি ব'লেই থাকি, তবে সত্যি কথাই ব'লেছি। কেন না, এটা তো সহজ, সাদা কথা, যে মাটি অমনি জন্মায়—জমীদার তাকে তৈরী করে না, সেই মাটিতে কাজ ক'রে চাষী যে ধন উৎপন্ন করে, তাতে ভাগ বসাবার আপনারা কে?—সমাজের একটা প্রাচীন সংস্কার ছাড়া আপনাদের অধিকার সম্বন্ধে ব'লবার তো কোন কথাই নেই। সুতরাং এ কথা যদি ব'লে থাকি, তবে আমি তাদের সত্যি কথাই ব'লেছি। সত্যি কথা যে বলে, তার কথা শুনে বিশ্বাস সবাই করে—তার জন্যে তাকে মানবার দরকার করে না।"

বিপিন পোদ্দার ব'ললেন, "অন্যায়টা কিসে হ'ল শুনি। আমি দিলাম তার বিপদের সময় টাকা, এখন সেই টাকাটা ফেরত চাই, আর এতদিন যে টাকাটা ব্যবহার ক'রলে, তার সুদ চাই।"

হেসে রবীন মাষ্টার ব'ললে, "অন্যায়টা এখানে নয় পোদ্দার ম'শায়, আরও অনেকটা দূরে। এ টাকাটা আপনার হ'ল আর চাষীর হ'ল না কেন? সেই কথাটা তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারা যায় যে, এই ধরুন, আপনাদের বা আমাদের হাতে যে টাকাটা জমেছে, এর সবটাই

অন্যায়ের সঞ্চয়, পরকে খাটিয়ে তার অর্জ্জন থেকে অন্যায় ক'রে ভাগ নিয়ে এটা সঞ্চয় করা হয়েছে। অন্যায় যোগেশেরও নয়, আপনারও নয় অন্যায় পুরোনো সমাজ-ব্যবস্থার !"

বিপিন পোদ্দার আবার তর্ক ক'রতে যায় দেখে রবীন ব'ললে "যা'ক, ও নিয়ে তর্ক ক'রে কি হবে? ও তর্ক একদিনে সমাধা হবার নয় !"—ব'লে এক আলমারি বই দেখিয়ে ব'ললে, "এই সমস্যা নিয়ে এতগুলি বই লেখা হ'য়েছে, সুতরাং আজই এখানে আমরা সেটা সমাধান ক'রতে পারবো, তার কোনও আশা নেই।"

সতীশ চৌধুরী ব'ললেন, "তা ঠিক। এখন কথাটা এই যে, উপস্থিত সমস্যার মীমাংসাটা কি ক'রে হয়। চাষীদের যে কষ্ট হ'য়েছে তা' আমরা যে না দেখছি, তা' নয়, আর আমরা সবাই অল্পবিস্তর চেষ্টা ক'রছি কেবল তাদের দুঃখ দূর ক'রবার জন্যেই। তারা যদি কিছু চায়, ন্যায্য প্রস্তাব যদি কিছু করে, তবে সে-কথা বলুক, ন্যায্য হ'লে আমরা অবিশ্যি মেনে নেব। আপনি তাদের এই কথাটা বুঝিয়ে বলুন না দয়া ক'রে !"

রবীন ব'ললে, "কি হবে ব'লে? তারা যাকে ন্যায্য মনে ক'রে আপনারা তাকে ন্যায্য ব'লে মানবেন না। কোন্‌টা ন্যায় কোন্‌টা অন্যায়, সেটা আমরা যে বিচার করি নিজ নিজ স্বার্থের চোখে চেয়ে। এই ধরুন, তারা যদি বলে পোদ্দার ম'শায়কে, 'আপনার কাছে এক-শো টাকা ধার নিয়েছিলাম, যখন পাটের মণ ছিল দশ টাকা। আপনি আজ দশ মণ পাট আর তার উপর দশ মণে বছরে এক মণ সুদ নিয়ে খত ফেরৎ দিন।' দেবেন উনি?"

বিপিন পোদ্দার ব'ললেন, "তা' কেমন ক'রে হয়? আমি যে টাকা দিয়েছি তা' যে গদী থেকে এনে দিয়েছি, তারা তো দশ মণ পাটে ত্রিশ টাকা নিয়ে আমায় ছেড়ে দেবে না?"

"তবেই তো! ন্যায্য কথা আপনি যে কারণেই হোক মানতে পারেন না।"

সতীশ চৌধুরী ব'ললেন, "যাগ গে, যাক। এক কাজ করুন, আপনি ওদের বলুন, নগদ টাকা দেয় তো আমরা খাজনার স্থদ ছেড়ে দিচ্ছি, লগ্নি টাকার অর্দ্ধেক স্থদ ছেড়ে দিচ্ছি।"

"বেশ তো, সে কথা আপনারাই ব'লে দেখুন।"

"আমাদের কথা ওরা এখন শুনবেই না।"

"তাই বিপদে প'ড়ে আমার কাছে এসেছেন আপনাদের আব্দার তাদের বোঝাতে! কিন্তু আমি কেন আপনাদের হ'য়ে তাদের কাছে কথা কইতে যাব? এই সে দিন আমি যে প্রস্তাব আপনাদের কাছে ক'রেছিলাম, তা' আপনারা কাণেও তুললেন না। সে প্রস্তাবে যদি রাজী হ'তেন, তবে আজকের এ সমস্যা উঠতোই না। গ্রামের জমীদার-মহাজন চাষী-মজুর—সবাই উঠে পড়ে লেগে যেতো গ্রামের উন্নতির জন্যে। আর সেই কাজ যদি আমি ক'রতে পারতাম, তবে আজ আমি বড়মুখ ক'রে তাদের গিয়ে বোঝাতে পারতাম যে, আমি তাদের বন্ধু—আপনারা তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। আজ শুধু হাতে গিয়ে কি দিয়ে তাদের সবাইকে বোঝাব যে, আপনারা তাদের রক্ত-চোষা শত্রু ন'ন!"

যোগেশ ব'ললে, "আমাদের অপরাধ হয়েছে আপনার কথা না শোনা। এখন আমরা মেনে নিচ্ছি আপনার কথা। একবার অপরাধ ক'রেছি ব'লেই কি আপনি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে রক্ষা ক'রবেন না! আপনি তো চিরদিন সকলের অপরাধ ক্ষমা ক'রেই এসেছেন।"

রবীন হেসে ব'ললে, "ভুল ক'রেছি। আর ক'রবো না। মাপ ক'রবেন আপনারা, আমি কিছু পারবো না ক'রতে। আমি ঠিক ছাই ফেলবার ভাঙ্গা কুলো নই।"

খুব চ'টে তারা সবাই চ'লে গেল। যাবার সময় রাস্তায় বিপিন পোদ্দার ব'ললেন, "আমি আগেই ব'লেছি, ওকে দিয়ে হবে না। আপনারা ভাবেন ও পাগল ?—মিচ্‌কে শয়তান। ওই তো ক্ষেপিয়েছে ওদের। ভাল চান, পুলিশ দিয়ে আগে ওকে সরান।"

১৭

মৌলবী সাহেবের বক্তৃতা শুনে চাষীদের মধ্যে যারা একটু উগ্র মেজাজের, তারা ভাবতে লাগলো তাদের লাঠির কথা, যারা মাঝারি তারা, ভাবলে ধর্ম্ম-ঘটের কথা, আর ঠাণ্ডা মুস্থির যারা—তারাই বেশীর ভাগ—তারা ভাবলে কথাটা তো ঠিক, কিন্তু করা যায় কি ?

এই শেষ শ্রেণীর কতকগুলি লোকের মনে প'ড়লো যে, মৌলবী সাহেব যে কথাগুলি ব'ললেন, অনেক আগে এর অনেক কথা তারা শুনেছিল রবীন মাষ্টারের কাছে। তারা ভাবলে যে, কর্ত্তব্য স্থির ক'রবার আগে একবার রবীন মাষ্টার কি বলে, সে কথাটাও শোনা যাক।

তাদের কয়েকজন এলো রবীন মাষ্টারের কাছে। কথাটা তার কাছে তুলতেই রবীন মাষ্টার ব'ললে, "ভাই সব, আমার কাছে ও কথা তোলা মিথ্যে, আমি কিছুই ক'রতে পারবো না তোমাদের। চেষ্টা তো ক'রেছি অনেক, কিন্তু আমি অক্ষম, আমি কিছু ক'রতে পারবো না।"

অছিম মণ্ডল ব'ললে, "কিন্তু মৌলবী সাহেব যা' বলেন, সে কথাটা আপনি কেমন বোঝেন ? আমরা সবাই যদি জোট করি, দেব না খাজনা, দেব না মহাজনের টাকা।"

রবীন মাষ্টার ব'ললে, "একখানা গ্রাম বা দশখানা গ্রামের লোক মিলে জোট ক'রলে কিছুই হবে না। হ্যাঁ, সমস্ত দেশের চাষী যদি জোট ক'রতে পারে,—কিন্তু সে মস্ত বড কথা। এক জায়গায় লোকে ধর্ম্ম-ঘট ক'রলে হবে শুধু হাঙ্গামা, ধর-পাকড, আইন-আদালত, ফলে শেষে কিছুই দাঁড়াবে না।"

কথাটা অনেকক্ষণ তাদের বুঝিয়ে ব'ললে, তারা বুঝলো যে এ 'ওয়াজিব কথা'।

"তা' ছাডা একটা কথা ভেবে দেখ মিঞাবা। এত কাল তো তোমরা খাজনা দিয়ে আসছো, মহাজনের টাকা দিয়ে আসছো, বরাবরই তোমরা ব'লতে পারতে 'দেব না'। তখন বল নি, এখন ব'লছো কেন? তখন তোমাদের গায় লাগতো না, এখন লাগছে—কেমন? গায় লাগছে, কেন না ধান-পাটের সে দাম নেই। দাম যে নেই কেন, সেটা ভেবেছ কি? তোমাদের আজকের যে দুর্দ্দশা, সেটা জমিদারও করে নি, সুদখোর-মহাজনও করে নি। তারা তো দাম কমায নি ধান-পাটের। এদের উপর তোমরা ক্ষেপে উঠেছ, কেন না এরা তোমার দু টাকা দশ টাকা শুষে নিচ্ছে। কিন্তু যারা জোট ক'রে তোমার ফসলের দাম কমিয়ে তোমাদের সম্পদ লুটে নিচ্ছে হাজারে হাজারে, তাদের কি ক'রছো?"

অছিম মণ্ডল ব'ললে, "তারা যদি না নেয় বেশী দামে মাল, তবে আমরা কি ক'রবো?"

"কেন সব জিনিষের দাম ক'মেছে জান তোমরা? কে কমিয়েছে দাম?"

তারা ব'ললে যে, জানে না। রবীন মাষ্টার তখন তাদের বুঝিয়ে ব'ললে যে, জিনিষের দাম কমার একটা কারণ টাকার মূল্য-বৃদ্ধি

সরকার টাকার পরিমাণ কমিয়ে তার দাম অযথা বেশী ক'রে রেখেছেন, তাই একদিকে সব জিনিষের দাম ক'মে গিয়েছে, আবার আর একদিকে দেনার টাকা খাজনার টাকা ব'লে দিতে হ'চ্ছে বাস্তবিক আগের চেয়ে ঢের বেশী। আর একটা কারণ হ'চ্ছে এই যে, বড় বড় মালদার মহাজনেরা, বিশেষতঃ যারা পাটের কারবারী, তাদের ভিতর একটা জোট আছে, আর চাষীরা জোট বাঁধতে পারে না। তাই মহাজনের পছন্দমত তারা জিনিষের দাম বেঁধে দেয়। তৃতীয় কারণ হ'ল এই যে, পৃথিবীতে একটা সঙ্কট এসে প'ড়েছে, যাতে সব জিনিষের চাহিদা ক'মে গেছে। আগেকার চাহিদা অনুসারে ফসল বেড়ে চ'ললে তার দর ক'মবেই।

রবীন ব'ললে যে, তাদের দারিদ্র্যের এই তিনটে হেতুর সঙ্গে দল বেঁধে ল'ড়তে হবে, তবে এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে। টাকার দাম বাড়ান-কমান গ্রাম-বাসীর সাধ্য নয়, তবু সারা দেশময় যদি এই নিয়ে আন্দোলন হয়, তবে হয়তো কাজ হ'তে পারে। আর দু'টো কারণের সঙ্গে ল'ড়তে গেলে তাদের নিজেদের জোট বাঁধতে হবে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কো-অপারেটিভ সোসাইটি ক'রে ফসল বেচা-কেনা ক'রতে হবে, আর চাহিদার হিসেব ক'রে সুনিয়ন্ত্রিত প্রণালীতে গ্রামে গ্রামে যৌথ-চাষ ক'রতে হবে, ঠিক সেই পরিমাণে সেই ফসলের যাতে দাম পাওয়া যায়।

এই সব কথা বুঝিয়ে সে ব'ললে, "তোমাদের এখনকার বড় শত্রু জমীদার-মহাজন নয়, তার চেয়ে বড় শক্তি। তার সঙ্গে ল'ড়ে পাল্লা দিয়ে জমীদার, মহাজন, চাষী—সবাই মিলে যদি একটা ব্যবস্থা ক'রতে পারে তবেই বাঁচবে। নইলে এই সঙ্কটের সময় জমীদার, মহাজন আর চাষীতে লাঠালাঠি ক'রে এখন সেই আসল সংগ্রামে কেবল শক্তি ক্ষয় হবে—কিছুই হবে না, ম'রবে সবাই।"

খুব জোরে ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিতে দিতে তারা উঠে গেল।

তাদের নিজেদের বৈঠকে তারা নিজেদের আর্থিক দুর্গতির আলোচনা ক'রলে আর অপরকে বোঝালে। উগ্রেরা মোটেই বুঝলো না, মাঝারীরা ব'ললে যে, রবীন মাষ্টারের সব কথা মেনে নিলেও তার উপদেশ অনুসারে কেউ যখন কাজ ক'রবে না, তখন ও নিয়ে আলোচনা মিথ্যে।

অবস্থা সঙ্গীন হ'য়েই রইলো।

কিন্তু রবীন মাষ্টারের তাতে কোনও উদ্বেগ হ'ল না। সে প'ড়তে লাগলো, লিখতে লাগলো আর লাইব্রেরীর বাড়ী পরিদর্শন ক'রতে লাগলো—যেন গ্রামে কোথাও কিছুই হয় নি।

মহকুমা থেকে সব-ডিভিশন্যাল অফিসার এলেন, এক ছোকরা বাঙ্গালী সিভিলিয়ান। তিনি জমিদার-মহাজনদের কাছে সব কথা শুনলেন, প্রজা-মাতব্বরদের কাছে সব কথা শুনলেন। তিনি শুনতে পেলেন সবার মুখেই রবীন মাষ্টারের কথা, সবাই অল্প-বিস্তর বোঝালে তাঁকে যে, রবীন মাষ্টার ইচ্ছা ক'রলেই একটা আপোষ ক'রে দিতে পারে, কিন্তু ক'রবে না; শুনলেন যে, রবীন মাষ্টারই চাষীদের মাথায় এই সব খেয়াল গোড়ার ঢুকিয়েছে।

হাকিমের ধারণা হ'ল রবীন মাষ্টারই প্রজাদের ক্ষেপিয়েছে এবং ক্ষেপাচ্ছে। তাকে শাসন ক'রলেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

শাসন ক'রবার জন্যে তিনি রবীন মাষ্টারকে ডেকে পাঠালেন। তার সঙ্গে আলাপ ক'রে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন। যা' তিনি ভেবেছিলেন, তা' সে মোটেই নয়।

সব কথা শুনে হাকিম ব'ললেন, "আপনি আপনার প্ল্যান ঠিক ক'রে আমাকে দিন, আমি সবাইকে তাতে রাজী ক'রতে পারি কি না দেখি।"

অনেক দিন পরে আবার রবীন মাষ্টারের মনে আশা উজ্জ্বল হ'য়ে

উঠলো। পরম উৎসাহে সে তার নূতন স্কীম লিখতে ব'সলো। রাশিয়ার পঞ্চসনা প্ল্যানের বইখানা প'ড়ে তার মনে যে সব আইডিয়া এসেছিল, সব ঢুকিয়ে দিয়ে তার প্ল্যানের সংস্কার ক'রতে লাগল। এত দিনে বুঝি তার স্বপ্ন সফল হবে, জীবন সার্থক হবে, এই কথা ভেবে সে আনন্দে বিভোর হ'য়ে গেল।

* * * * *

সারাদিন খেটে খেটে বৈকাল বেলায় তার ক্লান্তি বোধ হ'ল। সে অন্যমনস্ক ভাবে ভাবতে ভাবতে বিকেলের দিকে চ'লে গেল জমিদার বাড়ীতে।

সেখানে গিয়ে সে সোজা ঢুকলো গিয়ে ভুবনবাবুর সেই ব'সবার ঘরে। কুলজীর উপর দাবা নেই দেখে একটু বিস্মিত হ'য়ে পিছনে চেয়ে দেখলে ভুবনবাবু যেখানে ব'সতেন সেখানে ব'সে আছে যোগেশ।

"ও—ভুল হ'যে গেছে।"—ব'লে সে এসে যোগেশের কাছে ব'সলে।

ভুবনবাবু যে অনেক দিন হ'ল মারা গেছেন, এ কথাটা বিস্মৃত হওয়ায় সে ভারী আত্মগ্লানি বোধ ক'রছিল।

যোগেশ ভারী দুশ্চিন্তায় বিব্রত হ'য়ে ব'সে ছিল। সে কোনও কথা ব'ললে না।

রবীন মাষ্টার অনেকক্ষণ ব'সে থেকে ব'ললে, "যোগেশ, একটা কথা তোমায় না ব'লে পারছি নে। আমি যে মনে মনে তোমায় কত সাধুবাদ করি তা' ব'লে সারতে পারি নে। তোমার চরিত্রের মত চরিত্র বড় তো দেখতে পাই নে।"

যোগেশ খোসামুদি খেতে অভ্যস্ত। সে এতে বেশী বিচলিত হ'ল না। একটু হেসে সে এ প্রশংসা মাথা পেতে নিলে।

রবীন মাষ্টার মৃদুস্বরে ব'ললে, "আমি ব'লছি তোমার বাবার উইলের কথা। তিনি তোমায় তাতে অৰ্দ্ধেক সম্পত্তি দিয়ে গেছেন, কিন্তু ভাইদের প্রতি স্নেহবশে তুমি সে সুবিধা ত্যাগ ক'রছো—এ দেখে আমি তোমাকে কি মহৎ যে মনে করছি, তা' ব'লতে পারি নে।"

চড়াৎ ক'রে উঠলো যোগেশের অন্তর এ কথায়! রবীন মাষ্টার সব জানে তা' হ'লে! তার এত লুকোচুরী সবই মিথ্যে! যা' হোক, ভাগ্য তার যে, রবীন মাষ্টার তার এ লুকোচুরীর ভুল অর্থ ক'রেছে!

কিন্তু আশ্চর্য্য হ'ল সে এই ভেবে যে, রবীন মাষ্টার সব জেনে-শুনে উইলের অধিকার নেবার জন্যে একদিনের তরে চেষ্টা করে নি!

হায় রে! ওকে লোকে ভাবে পাগল!

যোগেশের মাথা নত হ'য়ে পড়লো ভক্তি-তে। সে গদগদ কণ্ঠে ব'ললে, "আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার এ প্রশংসার যোগ্য যেন হ'তে পারি।"

'হো-হো' ক'রে হেসে রবীন ব'ললে, "সে হবে, তুমি হবে। আমার কোনও সন্দেহ নেই।"

ডাকঘর থেকে যোগেশের লোক গিয়ে চিঠি নিয়ে এসেছিল। রবীন মাষ্টারের একখানা চিঠিও সে এনেছিল, সেটা তাকে দিলে।

চিঠির শিরোনামা দেখে রবীন উত্তেজিত হ'য়ে চিঠি খুলতে লাগলো। অনেক দিন পরে ব্ল্যাক সাহেবের চিঠি পেয়ে ভারী উল্লসিত হ'য়ে উঠলো সে।

ব্ল্যাক সাহেব লিখেছেন ক'লকাতা থেকে—

"এতদিন পরে আমি আপনাকে অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষিত সুসংবাদ দিচ্ছি। এখানে আপনার ঠিক মনের মতন একটা চাকরির জোগাড় ক'রেছি। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে ২০০, টাকা মাইনের একজন

কর্ম্মচারী নিযুক্ত হবেন জেনে, আমি আপনার জন্যে সে চাকরি অনেক চেষ্টা ক'রে শেষে ঠিক ক'রেছি। তিন মাসের জন্যে শিক্ষানবিসি ক'রতে হবে, সে ক'মাস পাবেন ১০০্ টাকা ক'রে। তারপর দু'শো টাকা হবে। আশা করি আপনি এ সংবাদে সুখী হবেন। এই সঙ্গে আপনার নিয়োগপত্র পাঠালাম।"

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলো রবীন মাষ্টার। আনন্দে তার দৃষ্টি অন্ধ হ'য়ে এলো—হাত থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলো। নিয়োগপত্র খানা সে খুলে দেখলে—তারপর যোগেশকে প'ড়ে শুনিয়ে সে ব'ললে, "যোগেশ, যোগেশ, দেখ, দেখ, কি সৌভাগ্য আমার।"

যোগেশও চিঠিখানা প'ড়ে ভারী সুখী হ'ল।

আনন্দে নাচতে নাচতে রবীন মাষ্টার বাড়ী চ'ললো। এতদিনে তার জীবন-ভরা সাধনা সব দিক দিয়েই সার্থক হ'তে চ'লেছে। ২০০্ টাকা মাইনের চাকরি।—ক'লকাতায়।!—ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে।!!—সেই মহামূল্য পুস্তক-সম্ভারের মাঝখানে! কত সুযোগ সে পাবে প'ড়বার—কি আনন্দে কাটবে তার জীবন পণ্ডিতদের সঙ্গে কথা ক'য়ে। শুধু তাই নয়, গ্রামের এবং দেশের আর্থিক উন্নতির জন্যে তার এতদিনকার চিন্তা, অধ্যয়ন ও সাধনা—সেও আজ সফল হ'তে ব'সেছে, স্বয় সব-ডিভিশন্যাল অফিসার তার ভার নিতে চেয়েছেন।

এতখানি সফলতা জীবনে সে কোনও দিন আশা ক'রতে ভরসা করে নি।

চ'লতে চ'লতে তার মনে হ'ল—হায় রে, এমন দিনে তড়িৎ নেই! তড়িৎ যদি থাকতো কি আনন্দ হ'ত তার! তড়িৎ নেই—তার দরদী সমজদার বান্ধব কেউ নেই আজ, যাকে এ আনন্দের ভাগ

দিয়ে সে সুখী হ'তে পারবে! আর কে বুঝবে এ সৌভাগ্য কত কতখানি? নিস্তারিণী? সে দেখবে শুধু ঐ দু'শো টাকা—আর কিছুই বুঝবে না।

হাহাকার ক'রে উঠলো তার প্রাণ আজ তড়িতের জন্য নূতন ক'রে। মনে হ'ল, এ পৃথিবী আজ বড় শূন্য, শুধু তড়িৎ নেই ব'লে।

পথে যেতে প'ড়লো তড়িতের স্মৃতি-মন্দির—তার সঙ্কল্পিত লাইব্রেরীর ঘর।

তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। শুক্লা-অষ্টমীর চাঁদের জ্যোস্না ঝিক্‌মিক্ ক'রেছে সেই বাড়ীর ভারার বাঁশের উপর প'ড়ে। সেই ঝিক্‌মিক্ আলোর সঙ্কেতে সেই বাড়ী যেন ইসারা ক'রে ডাকলে রবীনকে।

গেল রবীন সেই লাইব্রেরীর বাড়ীর কাছে। ভারার সঙ্গে যে বাঁশের সিঁড়ি ছিল, তাই বেয়ে উঠে গেল সে ছাদে—ছাদ পেটা আজ শেষ ক'রে মিস্ত্রী-মজুরেরা বাড়ী চ'লে গেছে।

সেই ছাদের উপর ঘুরে ঘুরে রবীন কেবলি ভাবতে লাগলো তড়িতের কথা। আজ তার মনে হ'চ্ছিল যে, তড়িৎ যেন তার হৃদয়ের আধখানা ছিঁড়ে নিয়ে চ'লে গেছে। তাকে ছেড়ে আজ জীবনের সায়াহ্নে তার এই চিরাগত সৌভাগ্য হ'য়ে গেছে অর্থ-হীন, প্রাণ-হীন। হায়! কেন গেল তড়িৎ?

পর হ'য়ে গিয়েছিল সে রবীনেরই নিজের দোষে। কিন্তু হোক পর, তাতে কোনও ক্ষতি হ'ত না, যদি বেঁচে থাকতো সে আজ তার এই সৌভাগ্যের, আনন্দের ভাগ নিতে। মনে মনে সে কল্পনা ক'রলো, সে যেন চোখে দেখতেই পেলে—অপূর্ব্ব আনন্দ-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠছে তড়িতের চিত্ত তার এ সৌভাগ্যোদয়ে। হায়! কেন গেল তড়িৎ?

ভাবতে ভাবতে সে কেবলি ঘুরছিল সেই ছাদের উপর। ঘুরতে ম্লান জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলোয় ভ্রান্ত হ'য়ে সে ভুল ক'রে ফেললে—সিঁড়ির জন্য যেখানে ছাদের ভিতর ছিল একটা ফাঁক তার ভিতর।

হুড়মুড় ক'রে প'ড়লো সে নীচের ইটের স্তূপের উপর।

পরের দিন দেখতে পেলো সবাই তার প্রাণ-হীন দেহ।

ভুলই সে ক'রে গেছে চিরদিন। সেই ভুলের জীবনের সমাপ্তি হ'ল তার পদক্ষেপের এই শেষ ভুলে

সমাপ্ত